ইয়াকভ পেরেলমান
অঙ্কের খেলা

ইয়াকভ
পেরেলমান
অঙ্কের
খেলা

Я. ПЕРЕЛЬМАН

ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

ইয়াকভ পেরেলমান
অঙ্কের খেলা
অঙ্কের কাহিনী ও ধাঁধা
মস্কো·প্রগতি

সূচী

ভূমিকা

এই বইখানি পড়ে আনন্দ পেতে হলে কিছুটা গণিতের জ্ঞান থাকা চাই—অঙ্কের নিয়মাবলী ও প্রাথমিক জ্যামিতির কিছুটা জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট। অবশ্য কিছু ধাঁধা আছে যেগুলোর জন্য সহজ সমীকরণের জ্ঞানও কিছুটা দরকার।

বইয়েই দেখা যাবে যে ধাঁধাগুলো নানা ধরনের। বুদ্ধির অঙ্ক ও অঙ্কের চালাকি থেকে আরম্ভ করে গুনতি ও মাপের বাস্তব কৌশল পর্যন্ত সবরকমের বিষয়ই এতে আছে।

১

খাবার টেবিলে বুদ্ধির খেলা

বৃষ্টি পড়ছে। বিশ্রাম ভবনে দুপুরবেলায় সবেমাত্র খেতে বসেছি আমরা। এমন সময় আমাদের ভেতর একজন জানতে চাইল যে তার ভোরবেলার ঘটনাটা আমরা সবাই শুনতে চাই কিনা।

আমরা তো সব্বাই রাজী হলাম। সে শুরু করল।

১. জংলা জমির কাঠবিড়ালী

''একটা কাঠবিড়ালীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ভারি মজার ব্যাপার ঘটেছে। জঙ্গলের সেই গোলাকার ফাঁকা জায়গাটা তো চেন তোমরা সবাই — মাঝখানে যার একটামাত্র বার্চ গাছ? এই গাছটাতেই একটা কাঠবিড়ালী লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল আমার কাছ থেকে। সবেমাত্র একটা ঝোপ থেকে বেরিয়েছি, দেখি গাছের গুঁড়িটার পেছন থেকে ওর নাক আর চকচকে দুটো ছোট চোখ উঁকি মারছে। ক্ষুদে প্রাণীটাকে দেখতে ইচ্ছে হল। তাই গোল জমিটার কিনারা বরাবর চক্কর দিতে লাগলাম। যাতে ভয় না পেয়ে যায়, তাই খেয়াল করে একটু দূরে দূরেই থাকতে হল। পুরো চারবার ঘুরে এলাম, কিন্তু ক্ষুদে শয়তানটা সন্দেহমাখা দৃষ্টি নিয়ে দূরে গাছের পেছনদিকে হটে যেতে লাগল। অনেক চেষ্টাচরিত্তির করেও ওর পিঠটা দেখতে পেলাম না।''

''কিন্তু তুমিই তো বললে এইমাত্র যে গাছটাকে চারবার চক্কর দিয়েছ,'' প্রশ্ন করল শ্রোতাদের একজন।

''গাছের চারপাশে ঠিকই, কিন্তু কাঠবিড়ালীকে ঘিরে তো নয়!''

''কিন্তু কাঠবিড়ালীটা তো গাছের উপরই ছিল, তাই না?''

''তাতে কি?''

''তার মানেই হল তুমি কাঠবিড়ালীটাকেও ঘুরে এসেছ।''

''বা রে! ওর পিঠটাই দেখতে পেলাম না, আর তুমি বলছ ওর চারপাশে ঘুরে এলাম?''

''ঘুরে আসার সঙ্গে পিঠের আবার কি সম্পর্ক? গোল জমিটার মাঝখানের গাছটায় ছিল কাঠবিড়ালী। সেই গাছটাকে বেড় দিয়ে এলে তুমি। তার মানেই হল কাঠবিড়ালীর চারপাশে তুমি ঘুরে এলে।''

''আরে না, তা নয়। ধর, তোমার চারপাশে ঘুরছি আর তুমিও এমনভাবে ঘুরছ যাতে তোমার মুখটাই দেখতে পাচ্ছি কেবল। তার মানে তোমাকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করা হল বলতে চাও?''

''নিশ্চয়ই, তা ছাড়া আর কি?''

''তার মানে, তোমার পেছনদিকে কোন সময়ই পেঁছতে পারলাম না বা তোমার পিঠটাও দেখতে পেলাম না, তবু তোমাকে ঘুরে আসা হয়ে গেল?''

"পিঠ-টিঠ ভুলে যাও! আমার চারধারে ঘুরে এলে — এটাই বড় কথা। পিঠের জন্য কি ঠেকে থাকছে?''

''থামো বাবা, প্রদক্ষিণ করা কাকে বলে বল তো? এটাকে আমি যেভাবে বুঝি, তা হল — কোন জিনিসের চারপাশে এমনভাবে ঘুরে আসা যাতে সে জিনিসটাকে সব দিক থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক বলি নি, প্রফেসর?'' আমাদের খাবার টেবিলে একজন বৃদ্ধের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটি করল সে।

অধ্যাপক উত্তর দিলেন, ''তোমাদের সমস্তটা আলোচনা আসলে একটিমাত্র শব্দকে নিয়ে। 'প্রদক্ষিণ' শব্দের সংজ্ঞা সম্পর্কে প্রথমে একমত হতে হবে তোমাদের। 'কোন কিছুর চারপাশে প্রদক্ষিণ করা' বলতে কি বোঝ তোমরা? কথাটা থেকে দু'ধরনের অর্থ বোঝা যায়। প্রথমটা হল, একটা বৃত্তের মাঝখানে থাকা কোন জিনিসকে ঘুরে আসা। দ্বিতীয়টা হল, জিনিসটার চারপাশে এমনভাবে ঘোরা যাতে তার সব দিকটাই দেখতে পাওয়া যায়। যদি প্রথম অর্থটাই ধরতে চাও, তাহলে কাঠবিড়ালীকে চারবার ঘোরা হয়েছে তোমার। যদি দ্বিতীয় অর্থটাকে মেনে নাও, তাহলে কাঠবিড়ালীর চারপাশে মোটেই ঘোরা হয় নি। তোমরা দু'জনে যদি একই ভাষায় কথা বল, আর শব্দগুলিকে একইভাবে মানে করে নাও তাহলে সত্যিই বিতর্কের আর কোন প্রয়োজন থাকে না।''

''আচ্ছা, মেনে নিলাম কথাটার দুটো অর্থই হয়। কিন্তু এর ভেতর সঠিক কোনটা?''

''এভাবে প্রশ্ন করাটা তো ঠিক হল না তোমার! যেকোনটাকেই মেনে নিতে পার তোমরা। কথাটা হল, দুটোর ভেতর সাধারণত কোন অর্থটাকে মেনে নিই আমরা? আমার মতে প্রথমটা। কেন তা বলছি। তোমরা জান সূর্য নিজের চারপাশে পুরো পাক খেয়ে আসে ২৫ দিনের একটু বেশী সময়ে...''

''সূর্যও ঘোরে নাকি?''

''নিশ্চয়ই, ঠিক পৃথিবীর মতোই ঘোরে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে কর, এতে সূর্যের ২৫ দিনের বদলে লাগছে ৩৬৫ ১/৪ দিন, অর্থাৎ

পুরো এক বছর। ঘটনাটা যদি এমন দাঁড়ায়, তাহলে পৃথিবী থেকে সূর্যের একটা দিক, অর্থাৎ 'মুখটাই' কেবল দেখা যাবে। তবু কেউ কি জোর করে বলতে পারত যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে না?''

''ঠিক, এতক্ষণে বুঝলাম আমি কাঠবিড়ালীর চারপাশেই ঘুরে এসেছি তাহলে।''

আমাদের একজন সঙ্গী চেঁচিয়ে উঠল, ''ভাই, আমার একটা কথা আছে। বৃষ্টি পড়ছে, কেউই বাইরে বের হচ্ছি না। তাহলে, সবাই মিলে ধাঁধার খেলা চালান যাক। কাঠবিড়ালীর ধাঁধাটা দিয়ে বেশ শুরু করা গেছে। এসো, আমরা সবাই কিছু বুদ্ধির খেলা বের করি। প্রফেসর হবেন আমাদের প্রধান বিচারক।''

''বীজগণিত বা জ্যামিতির ব্যাপার-ট্যাপার থাকলে আমি কেটে পড়ছি,'' বলল একটি তরুণী।

''আমিও!'' তার সঙ্গে সুর মেলাল আর একজন।

''না, সব্বাইকেই খেলতে হবে! অবশ্য কথা দিচ্ছি খুব সোজা আর সাধারণ নিয়মগুলি ছাড়া বীজগণিত বা জ্যামিতির ভেতর যাব না আমরা। আপত্তি আছে কারও?''

''না-না,'' সবাই চেঁচিয়ে উঠলো একসঙ্গে, ''তাহলে শুরু করা যাক!''

২. স্কুলের চক্র

একজন তরুণ পাইওনিয়র শুরু করল, ''আমাদের স্কুলে পড়াশুনোর বাইরে পাঁচটা চক্র আছে। এগুলি হল — ফিটারের কাজ শেখার, কাঠের কাজ শেখার, ফোটোগ্রাফি শেখার, দাবাখেলা শেখার আর সমবেত সঙ্গীত শেখার চক্র। ফিটারের কাজ শেখার চক্রের অধিবেশন হয় একদিন অন্তর, কাঠের কাজ শেখার চক্রের প্রতি তৃতীয় দিনে, ফোটোগ্রাফি শেখার চক্রের প্রতি চতুর্থ দিনে, দাবা খেলোয়াড়দের প্রতি পঞ্চম দিনে আর সমবেত সঙ্গীত চক্রের প্রতি ষষ্ঠ দিনে। ১ জানুয়ারিতে প্রতিটি চক্রের প্রথম অধিবেশন হল। তারপর থেকে নিয়মমতো প্রত্যেকের বৈঠক হতে থাকল। প্রশ্ন হল, প্রথম তিন মাসে মোট কতবার সব চক্রই একই দিনে সভা করেছিল (১ জানুয়ারি বাদ দিয়ে)?''

''বছরটা কি লিপ্ইয়ার (অধিবর্ষ)?''

''উঁহুঁ।''

''তাহলে প্রথম তিন মাসে মোট ৯০ দিনই ছিল?''

''ঠিক ধরেছ।''

অধ্যাপক কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, "আরও একটা প্রশ্ন জুড়ে দিচ্ছি এর সঙ্গে। সেটা হল: প্রথম তিন মাসে মোট কতদিন কোন দলেরই বৈঠক হয় নি?''

''তাহলে নিশ্চয়ই একটা ফাঁকি আছে এর ভেতরে? পাঁচটি চক্রের সবারই বৈঠক হবে এমন আর কোনো সন্ধ্যেবেলা আসবে না, বা একেবারেই কোনো বৈঠক হবে না এমন সন্ধ্যেবেলাও পাওয়া যাবে না। এ তো পরিষ্কার!''

''কেন?'' জিজ্ঞেস করলেন অধ্যাপক।

''তা জানি না, তবে একটা ফাঁকির গন্ধ পাচ্ছি যেন!''

''এটা কোন যুক্তি নয়। সন্ধ্যেবেলা দেখা যাবে আপনার পাওয়া গন্ধটা ঠিক কিনা। এবার আপনার পালা!''

এ খেলার কথাটা যে তুলেছিল সে বলল, ''জবাব এখন বলা হবে না। বেশ কিছু সময় নিয়ে ভাবব আমরা। রাতে খাবার সময় সব উত্তর জানা যাবে।''

৩. কে বেশী গুনেছিল?

''দু'জন লোক, একজন দাঁড়িয়েছিল তার বাড়ির দরজায়, অন্যজন পায়চারী করছিল সামনের রাস্তায়। তারা দু'জনেই পুরো একঘণ্টা ধরে রাস্তার লোকদের গুনতি করেছিল। বল তো, কে বেশী গুনেছিল?''

খাবার টেবিলের শেষ দিক থেকে উত্তর দিল একজন, ''যে পায়চারী করছিল সে। এ তো খুবই সোজা।''

অধ্যাপক বললেন, ''রাতে খাবার সময় উত্তরটা শুনব আমরা। পরের ধাঁধাটা বল এবার।''

৪. নাতি ও ঠাকুর্দা

''১৯৩২ সালে আমার বয়স ছিল আমার জন্মসালের শেষ দু'সংখ্যার সমান। এই অদ্ভুত ঘটনাটা ঠাকুর্দাকে শোনাতে তিনি আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে বললেন — তাঁর নিজের বয়সেরও নাকি ঐ একই হিসাব দাঁড়াচ্ছে। আমি ভেবে দেখলুম তা অসম্ভব...''

''একেবারে অসম্ভব,'' কার যেন গলা শোনা গেল।

''বিশ্বাস কর, এটা খুবই সম্ভব আর ঠাকুর্দা তা প্রমাণও করেছিলেন। তাহলে বল তো ১৯৩২ সালে আমাদের কার বয়স কত ছিল?''

৫. ট্রেনের টিকিট

এরপর শুরু করল একটি মেয়ে, ''আমার কাজ রেলের টিকিট বিক্রি করা। সবাই ভাবে, কাজটা বুঝি খুবই সোজা। একটা ছোট্ট স্টেশনেও যে কতগুলি টিকিট বিক্রি করতে হয়, বোধহয় সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই তাদের। আমাদের লাইনে আছে ২৫টা স্টেশন। আর আপ-ডাউন মিলিয়ে প্রতিটি জায়গার জন্য আছে আলাদা টিকিট। বলতে পার আমাদের লাইনের স্টেশনগুলোর জন্য কত ধরনের টিকিট আছে?''

একজন বিমানচালকের দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক বললেন:

''এরপর তোমার পালা।''

৬. হেলিকপ্টারের পাল্লা

''লেনিনগ্রাদ থেকে একটা হেলিকপ্টার রওনা হল উত্তরদিকে। ৫০০ কিলোমিটার যাবার পর তা পূর্বদিকে ঘুরে উড়ে গেল আরও ৫০০ কিলোমিটার। তারপর গতি পরিবর্তন করল দক্ষিণদিকে, এগিয়ে গেল ৫০০ কিলোমিটার। শেষে ৫০০ কিলোমিটার পশ্চিম গিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। প্রশ্নটা হল, হেলিকপ্টারটা নামল কোথায়? লেনিনগ্রাদের পশ্চিমে, পূর্বে, উত্তরে, না দক্ষিণে?''

একজন বলে উঠল, ''এ তো সোজা, ৫০০ পা সামনে, ৫০০ পা ডানে, পেছনদিকে ৫০০, তারপর বাঁদিকে আবার ৫০০। তার মানেই যেখান থেকে রওনা হয়েছিলে সেখানেই এসে পৌঁছলে!''

''খুব সোজা বুঝি! তাহলে আপনার মতে, কোথায় নামল হেলিকপ্টারটা?''

''ঠিক লেনিনগ্রাদেই, তা ছাড়া আবার কোথায়?''

''উঁহুঁ, হ-ল না!''

''তাহলে, বুঝতে পারছি না!''

''ধাঁধাটায় কোথাও চালাকি আছে একটা,'' বলল আর একজন, ''ওটা লেনিনগ্রাদে নামে নি বুঝি?''

''আর একবার বলবে, ধাঁধাটা?''

বিমানচালক ছেলেটি বলল আর একবার। শুনে তো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো সবাই।

''ঠিক আছে, জবাব ভেবে বের করতে অনেকটা সময় পাওয়া যাবে। পরের ধাঁধাটা শোনা যাক তাহলে,'' বললেন অধ্যাপক।

৭. ছায়া

পরের ছেলেটি বলতে লাগল, ''আমার ধাঁধাটাও একটা হেলিকপ্টার নিয়ে। বল তো কোনটা বেশী লম্বা, একটা হেলিকপ্টার, না তার ঠিক ছায়াটা?''

''শুধু এই?''

''শুধুমাত্র এই।''
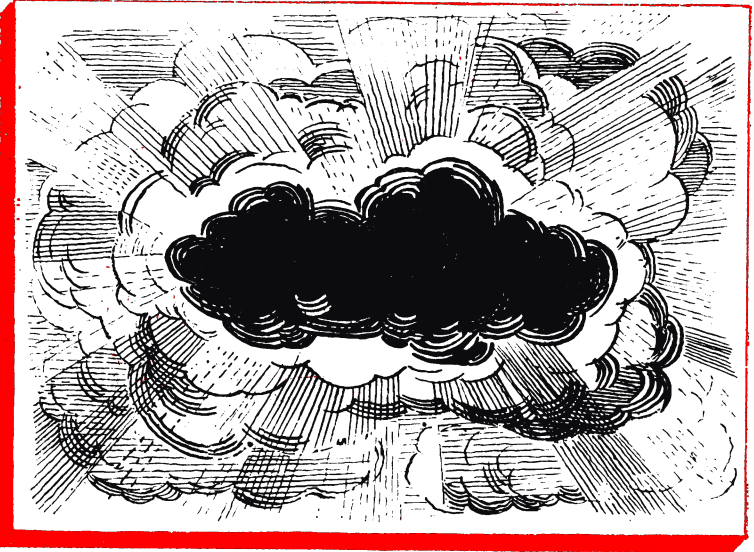
১ নং ছবি। মেঘের আড়াল থেকে ছড়িয়ে পড়া সূর্যের কিরণ।

''হেলিকপ্টার থেকে তার ছায়াটাই সাধারণত লম্বা! সূর্যের আলো তো পাখার মতোই ছড়িয়ে পড়ে, তাই না?'' সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল একজন।

''আমি কিন্তু তা বলব না,'' বলে উঠল আর একজন, ''সূর্যরশ্মি হল সমান্তরাল, তার মানেই হেলিকপ্টার আর তার ছায়া সমান মাপেরই হবে।''

''কি যে বল! মেঘের পেছন থেকে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়তে দেখেছ কখনো? তাহলে, দেখেছ বোধহয় কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে তারা। মেঘের ছায়াটা যেমন মেঘ থেকে বড় হয়, হেলিকপ্টারের ছায়াটাও তেমনি হেলিকপ্টারটা থেকে বেশ বড় হবে।''

''তাহলে নাবিক, জ্যোতির্বিৎ, এদের মতো লোকেরা সূর্যরশ্মিকে সমান্তরাল বলে কেন?''

অধ্যাপক আর একজনকে তাঁর ধাঁধাটা বলতে বলে তর্কটা থামিয়ে দিলেন।

৮. দেশলাই কাঠির ধাঁধা

একটি ছেলে দেশলাইয়ের বাক্সটা টেবিলের ওপর খালি করে কাঠিগুলোকে ভাগ করল তিনটি ভাগে।

ঠাট্টা করে প্রশ্ন করল একজন, ''অগ্নিকান্ড-টান্ড ঘটাতে যাচ্ছো না তো ভাই?''

''না-না, এগুলো সব মগজ ঘামানোর জন্যে। এই হল, তিনটে ভাগ। ভাগগুলো সমান নয়। সবশুদ্ধ কাঠি আছে ৪৮ টা। প্রতি ভাগে কটা আছে তা অবশ্য বলব না আমি। এবার সব নজর দাও ভালো করে। দ্বিতীয় ভাগে যতটা কাঠি আছে প্রথম ভাগ থেকে ততটা নিয়ে রাখলাম দ্বিতীয় ভাগে। তারপর তৃতীয় ভাগে যতটা আছে ততটা কাঠি দ্বিতীয় ভাগ থেকে নিয়ে রাখলাম তৃতীয় ভাগে। সবশেষে প্রথম ভাগে যে কয়টা কাঠি পড়েছিল তৃতীয় ভাগ থেকে সে কয়টা নিয়ে চালান করে দিলাম প্রথম ভাগে। এইসব কান্ড করলে পর তিনটে ভাগেই কাঠির সংখ্যা হবে সমান সমান। তাহলে বল তো, প্রথমে প্রতি ভাগে কটা করে কাঠি ছিল?''

৯. 'অদ্ভুত' এক গাছের গুঁড়ি

পরের ছেলেটি শুরু করল, ''এই ধাঁধাটা গাঁয়ের এক অঙ্কের পন্ডিত করতে দিয়েছিলেন আমাকে।''

আসলে এটা একটা মজার গল্প। একদিন এক কৃষকের সঙ্গে এক বুড়োর দেখা হল বনের ভেতর। কথাবার্তা শুরু হতে বুড়ো বলল:

''এই বনে একটা অদ্ভুত ছোট্ট গাছের গুঁড়ি আছে। দরকারমতো এটি মানুষকে সাহায্য করে।''

''তাই নাকি? কি করে? অসুখ-বিসুখ সারায় বুঝি?''

''না, ঠিক তা নয়। এটি মানুষের টাকা দ্বিগুণ করে দেয়। টাকার থলিটা শেকড়ের ভেতর রেখে একশো পর্যন্ত গুনে যাও, তারপরেই দেখতে পাবে টাকাটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এক অদ্ভুত গুঁড়ি হে!''

কৃষক তো উৎসাহের চোটে বলে উঠল, ''পরীক্ষা করে দেখতে পারি না?''

''কেন পারবে না, কিছু দক্ষিণা দিতে হবে অবশ্য।''

''কাকে দিতে হবে, টাকাটা কত?''

''যে তোমাকে গুঁড়িটা দেখাবে, সে তো আমি। কত দিতে হবে সে অবশ্য আলাদা কথা।''

দুজনে তো দরাদরি শুরু করল তখন। কৃষকের বেশী টাকা নেই শুনে, বুড়ো যতবার টাকা দ্বিগুণ হবে প্রতিবারে ১ রুবল ২০ কোপেক করে নিতে রাজী হল।

দুজনে তখন ঢুকল গভীর জঙ্গলে। বুড়ো অনেক খুঁজে পেতে কৃষককে নিয়ে এল ঝোপের ভেতর এক শেওলাধরা ফারগাছের গুঁড়ির সামনে। তারপর কৃষকের থলিটা নিয়ে গুঁজে দিল শেকড়গুলির ভেতর। তারপর তারা একশো পর্যন্ত গুনল। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজবার পর থলিটা বের করে কৃষককে ফিরিয়ে দিল বুড়ো।

কৃষক তো খুললে থলিটা। কি অবাক কান্ড, টাকাগুলো সত্যিই দ্বিগুণ হয়ে গেছে! কথামতো ১ রুবল আর ২০ কোপেক গুনে বের করে নিয়ে, সে বুড়োকে আবার রাখতে বলল ওটা।

আবার তারা একশো পর্যন্ত গুনল। আবার সেই বুড়ো খুঁজে বার করল থলিটা। আবারও ঘটল সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা, টাকাগুলো সব দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আবার সেই চুক্তিমতো বুড়োকে সে দিল ১ রুবল আর ২০ কোপেক।

তারপর তৃতীয়বার তারা থলিটাকে লুকিয়ে রাখল। এবারও টাকাটা দ্বিগুণ হল। কিন্তু বুড়োকে তার ১ রুবল ২০ কোপেক দেবার পর এবার আর কিছুই থাকল না থলিতে। এভাবে সব টাকা হারাল গরিব লোকটা। দ্বিগুণ করে নেবার মতো আর টাকা যখন রইল না, মাথা হেঁট করে চলে গেল সে।

রহস্যটা অবশ্য বুঝতে পারছ সবাই। বুড়ো তো আর থলিটা খুঁজে বের করতে শুধু শুধু দেরি করে নি। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করব আর একটা প্রশ্ন। বল তো কৃষকের কাছে প্রথমে কত ছিল?''

১০. ডিসেম্বরের ধাঁধা

পরের জন শুরু করল, ''শোনো ভাই তোমরা। আমি অংকটংক জানি না। আমি হচ্ছি ভাষাতত্ত্বের লোক। আমার কাছে অঙ্কের ধাঁধা শুনতে চেও না কিন্তু। আমি জিজ্ঞেস করব আর এক ধরনের প্রশ্ন। আমার কাজকর্মের সঙ্গেই তার সম্পর্ক। এটা হল ক্যালেন্ডারের ব্যাপার।''

''বল, বল।''

''ডিসেম্বর হল বছরের বারো নম্বরের মাস। ঐ নামটার আসল অর্থ কি জানো? কথাটা আসছে গ্রীক 'ডেকা' শব্দ থেকে, যার অর্থ হল দশ। যেমন 'ডেকালিটার' শব্দের অর্থ দশ লিটার, 'ডিকেড' মানে হল দশ বছর, এইরকম। তাহলে ডিসেম্বরেরও হওয়া উচিত দশ নম্বরের মাস। কিন্তু তা তো নয়। কেন, তা বলতে পার বুঝিয়ে?''

১১. অঙ্কের খেলা

''আমি তোমাদের দেখাব একটা অঙ্কের ম্যাজিক, তোমাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে এটা। তোমাদের মধ্যে একজন — আচ্ছা প্রফেসর, আপনিই একটা তিন-সংখ্যাওয়ালা অংক লিখুন না। কী লিখলেন তা কিন্তু বলবেন না আমাকে।''

''অংকটার ভেতর শূন্য দেওয়া চলবে তো?''

''কোন আপত্তি নেই। তিন-সংখ্যার যেকোন অংক লিখতে পারেন।''

''বেশ, এই লিখলাম। এরপর কী করতে হবে?''

''ঐ সংখ্যাকেই আবার আপনার সংখ্যাটার পাশে বসান। তাহলে এবার একটা ছয়-সংখ্যার অংক পেলেন।''

''ঠিক।''

''এবার কাগজটা আপনার পাশের ছেলেটিকে দিয়ে দিন। তাহলে ওটা আমার কাছ থেকে আরও দূরে চলে গেল। এবার ওকে ছয়-সংখ্যার অংকটাকে সাত দিয়ে ভাগ করতে বলুন।''

''খুব তো বলছেন; যদি ভাগ না করা যায়?''

''যাবে, যাবে, ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন?''

''সংখ্যাটা না জেনেই এত নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলছেন কী করে?''

''ভাগটা তো করে ফেল, তারপর কথা বল।''

''ঠিক বলেছ, ভাগ মিলে গেছে।''

‘‘এখন অঙ্কের ফলটা পাশের ছেলেটিকে পেঁাছে দাও। আমাকে বোলো না কিন্তু। ও এটাকে ভাগ করুক ১১ দিয়ে।’’

‘‘ভাবছ, এবারও আগের মতোই হবে?’’

‘‘আরে, অঙ্কটা তো কর। দেখো কোন ভাগশেষই থাকবে না।’’

‘‘এবারও ঠিকই বলেছ। এরপর?’’

‘‘উত্তরটাকে আবার চালান করে দাও, এবার এটাকে ভাগ করা হোক... ধর ১৩ দিয়ে।’’

‘‘তোমার পছন্দটা ভাল হল না। খুব কম সংখ্যাই আছে যাকে ১৩ দিয়ে ভাগ করা চলে। না, কপাল ভাল তোমার, এটা তো মিলে গেছে!’’

‘‘এখন কাগজটা দাও আমাকে; হ্যাঁ, ভাঁজ করেই দাও যাতে দেখতে না পাই আমি।’’

কাগজটাকে না খুলেই ছেলেটি এটা দিল অধ্যাপকের হাতে।

‘‘এই তো আপনার সেই সংখ্যাটা, ঠিক বলি নি!’’

‘‘একেবারে ঠিক,’’ আশ্চর্য হয়ে গেলেন অধ্যাপক, ‘‘এই সংখ্যাটাই তো লিখেছিলাম আমি... সব্বাইয়ের পালাই শেষ হয়েছে তো, আর বৃষ্টিটাও থেমেছে। চল তবে বেরিয়ে পড়া যাক। রাত্রিবেলাতেই খাবার পর সব উত্তর জানা যাবে। তোমাদের সকলের উত্তর লেখা কাগজের টুকরোগুলো আমাকে জমা দিতে পার।’’

১—১১ নম্বর ধাঁধার উত্তর

১. কাঠবিড়ালীর ধাঁধাটা আগেই সমাধান হয়েছে, সুতরাং পরের প্রশ্নগুলোর জবাব দিচ্ছি।

২. প্রথম প্রশ্নটার উত্তর খুব সহজেই দেওয়া যায়: প্রথম তিন মাসে পাঁচটি চক্র মোট কতবার একই দিনে বৈঠক করেছিল (১ জানুয়ারি বাদে) এটা বের করা যেতে পারে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬-এর ল.সা.গু বার করলে। এটা তো কঠিন কিছু নয়। ল.সা.গু হল ৬০। তাহলে পাঁচটি চক্রেরই আবার একসঙ্গে বৈঠক হবে ৬১তম দিনে — ফিটারের কাজ শেখার চক্রের অধিবেশন হল তিরিশের দ্বিগুণ দিনের ব্যবধানে, কাঠের কাজ শেখার চক্রের বৈঠক বসল ২০টা তিন-দিনের ব্যবধানে, ফোটোগ্রাফি শেখার চক্রের ১৫টা চার-দিন অন্তর, দাবা খেলোয়াড়রা ১২টা পাঁচ-দিন পরপর আর সমবেত

সঙ্গীত শেখার চক্রের প্রতি ছ'-দিনের দিন ১০ বার। তার মানে হল, কেবল ৬০ দিনের মাথায় তারা সবাই একই দিনে বসতে পারছে। আর, প্রথম তিন মাসে আছে ৯০ দিন, তাহলে তারা সবাই প্রথমবার ছাড়া আর একবারই মাত্র একসঙ্গে মিলতে পারছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা এর চেয়ে একটু বেশী কঠিন: প্রথম তিন মাসে মোট কতদিন কোনো দলেরই কোনও বৈঠক হয় নি? এটা বের করতে হলে ১ থেকে ৯০ পর্যন্ত সবকটি সংখ্যা লিখতে হবে, তা থেকে ফিটারের কাজ শেখার চক্রের অধিবেশনের দিনগুলো কেটে বাদ দাও, যেমন ১, ৩, ৫, ৭, ৯... এইরকম। তারপর বাদ দাও কাঠের কাজ শেখার চক্রের বৈঠকের দিনগুলি: যেমন ৪, ১০ ইত্যাদি। ফোটোগ্রাফি শেখার চক্র, দাবা খেলোয়াড়, সমবেত সঙ্গীত শেখার চক্রের মেলবার দিনগুলিও যখন বাদ দেওয়া হয়ে যাবে, তখন বাকি দিনগুলোই হবে সেই দিন যাতে কোনো দলেরই বৈঠক হবে না।

এটা করলেই দেখতে পাবে জানুয়ারিতে আট দিন, যেমন ২, ৮, ১২, ১৪, ১৮, ২০, ২৪ আর ৩০, ফেব্রুয়ারিতে সাত দিন আর মার্চে নয় দিন, মোট হবে ২৪ দিন।

৩. তারা দু'জনেই সমান সংখ্যার পথিকদের গুনতি করেছিল। দরজায় যে দাঁড়িয়েছিল সে গুনেছিল যারা আসা-যাওয়া করছিল তাদের। যে পায়চারী করছিল সে রাস্তা দিয়ে যাদের আসতে দেখেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল যাদের যেতে দেখেছিল তাদের দ্বিগুণ।

৪. প্রথমে মনে হতে পারে যে ধাঁধাটা বলতে হয়ত ভুল হয়েছে — নাতি আর ঠাকুর্দা দু'জনের বয়সই সমান! শিগগিরই দেখতে পাবে কিচ্ছু ভুল নেই ধাঁধাটায়।

এটা তো পরিষ্কার যে নাতির জন্ম হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। তাই, তার জন্মসালের প্রথম দুটো সংখ্যা হল ১৯ (শতকের ঘরের সংখ্যা)। অন্য দুটো সংখ্যাকে দ্বিগুণ করলে হয় ৩২। তাহলে সংখ্যাটা হল ১৬। নাতির জন্ম হয়েছিল ১৯১৬ সালে আর ১৯৩২ সালে তার বয়স হল ১৬ বছর।

তাহলে ঠাকুর্দা নিশ্চয়ই জন্মেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে। সেইজন্য তাঁর জন্মসালের প্রথম দুটো সংখ্যা হল ১৮। বাকি সংখ্যা দুটোকে দ্বিগুণ করলে হবে ১৩২-এর সমান। তাহলে আমাদের সংখ্যাটা হল ১৩২-এর অর্ধেক, অর্থাৎ ৬৬।

ঠাকুর্দা জন্মেছিলেন ১৮৬৬ সালে, আর ১৯৩২ সালে তাঁর বয়স দাঁড়াল ৬৬ বছর।

তাহলেই ১৯৩২ সালে নাতি আর ঠাকুর্দা দুজনের বয়সই তাদের জন্মসালের শেষ দুটো সংখ্যার সমান ছিল।

৫. ২৫টা স্টেশনের প্রতিটা থেকেই যাত্রীরা বাকি ২৪টা স্টেশনের যেকোনটার টিকিট কিনতে পারে। তাহলে যত বিভিন্ন ধরনের টিকিট দরকার হয় তাদের সংখ্যা হল ২৫ × ২৪ = ৬০০।

আর যাত্রীরা যদি ফিরতি টিকিটও কাটে (অর্থাৎ দু'দিকেরই) তাহলে টিকিটের ধরনের সংখ্যা হবে ২ × ৬০০, অর্থাৎ ১২০০।

৬. কিচ্ছু গোলমেলে কথা নেই এ ধাঁধাটায়। হেলিকপ্টারটা তো আর একটা বর্গক্ষেত্রের সীমানা ধরে উড়ে যায় নি! এটা খেয়াল করতে হবে যে পৃথিবীটা হল গোল আর দ্রাঘিমা রেখাগুলো সব মেরুতে গিয়ে একসঙ্গে মিশে যায় (২ নং ছবি)। তাহলে লেনিনগ্রাদের অক্ষাংশের ৫০০ কিলোমিটার উত্তরের অক্ষাংশ বরাবর পূর্বদিকে যাবার সময় হেলিকপ্টারটাকে যত পথ পার হতে হয়েছে তা লেনিনগ্রাদের অক্ষাংশ ধরে ফিরে আসবার পথের চেয়ে কম। ফলে লেনিনগ্রাদের পূর্বদিকেই হেলিকপ্টারের পাল্লা শেষ হয়েছিল।

২ নং ছবি

কথা হচ্ছে, কত কিলোমিটার দূরে? সে তো হিসেব কষেই বের করা যায়। ২ নং ছবিতে হেলিকপ্টারের পথটা **ক খ গ ঘ ঙ** দিয়ে দেখানো হয়েছে। **উ** হল উত্তর মেরু, এখানে **ক খ** আর **ঘ গ** দ্রাঘিমা এসে মিশছে। হেলিকপ্টারটা প্রথমে গিয়েছিল ৫০০ কিলোমিটার উত্তরে তার মানে **ক উ** দ্রাঘিমা ধরে এগিয়েছিল। এখন দ্রাঘিমার

ওপরে প্রতি ডিগ্রিতে হয় ১১১ কিলোমিটার; তাহলে ৫০০ কিলোমিটার লম্বা বৃত্তচাপে হবে ৫০০ : ১১১ ≈ ৪°৩০′। লেনিনগ্রাদ হল ৬০ অক্ষাংশে। তাহলে **খ**-র অক্ষাংশ দাঁড়াচ্ছে ৬০°+৪°৩০′=৬৪°৩০′। হেলিকপ্টারটা এরপর উড়ে গিয়েছিল পূর্বদিকে, তার মানে **খ গ** অক্ষাংশ ধরে ৫০০ কিলোমিটার এগিয়েছিল। এই অক্ষাংশে (৬৪°৩০′) প্রতি ডিগ্রির (দ্রাঘিমার) দূরত্ব হিসেব করে বের করা যায় (তৈরি করা ছক থেকেও পাওয়া যেতে পারে) — এটা হল ৪৮ কিলোমিটারের সমান। এখন পূর্বদিকে হেলিকপ্টারটাকে মোট কত ডিগ্রি পথ পেরোতে হয়েছিল তার হিসেবটা সোজা হয়ে যাচ্ছে — ৫০০ : ৪৮ ≈ ১০°২৪′। এরপর হেলিকপ্টারটা এগোলে দক্ষিণে, অর্থাৎ **গ ঘ** দ্রাঘিমা ধরে। এভাবে ৫০০ কিলোমিটার পার হবার পর এসে পেঁছিল লেনিনগ্রাদের অক্ষাংশে — আর সেখান থেকেই আবার তার গতি হল পশ্চিমদিকে **ঘ ক** বরাবর। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এখানে ৫০০ কিলোমিটার পথ **ক** আর **ঘ**-র দূরত্বের চেয়ে ছোট। এখন **ক ঘ** আর **খ গ** দু'জায়গাতেই ডিগ্রির (দ্রাঘিমার) পরিমাণ সমান, অর্থাৎ ১০°২৪′। ৬০° অক্ষাংশে ১° (দ্রাঘিমার) দৈর্ঘ্য হল প্রায় ৫৫·৫ কিলোমিটার। তাহলে **ক** থেকে **ঘ**-র দূরত্ব হল ৫৫·৫×১০°২৪′≈৫৭৭ কিলোমিটারের সমান। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে হেলিকপ্টারটা লেনিনগ্রাদের কাছাকাছিও নামতে পারে নি, নেমেছিল ৭৭ কিলোমিটার দূরে (পূর্বে), অর্থাৎ লাদোগা হ্রদের ওপর।

৭. এই ধাঁধাটা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের গল্পের সবাই অনেক ভুল করেছিল। সূর্যের রশ্মি পাখার মতোই ছড়িয়ে পড়ে — কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। দূরত্বের তুলনায় পৃথিবী সূর্য থেকে এত ছোট যে সূর্যের রশ্মি পৃথিবীর যেখানেই পড়ুক না কেন একটার সঙ্গে আর একটা যে একটু কোনাকুনিভাবে আছে তা প্রায় ধরাই যায় না। সত্যি বলতে কি রশ্মিগুলিকে একরকম সমান্তরালই বলা চলে। আমরা অবশ্য অনেক সময় রশ্মিকে পাখার মতোই ছড়িয়ে পড়তে দেখি (যেমন, সূর্য যখন কোন মেঘের আড়ালে থাকে, ১ নং ছবি)। এগুলো অবশ্য পরিপ্রেক্ষণের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।
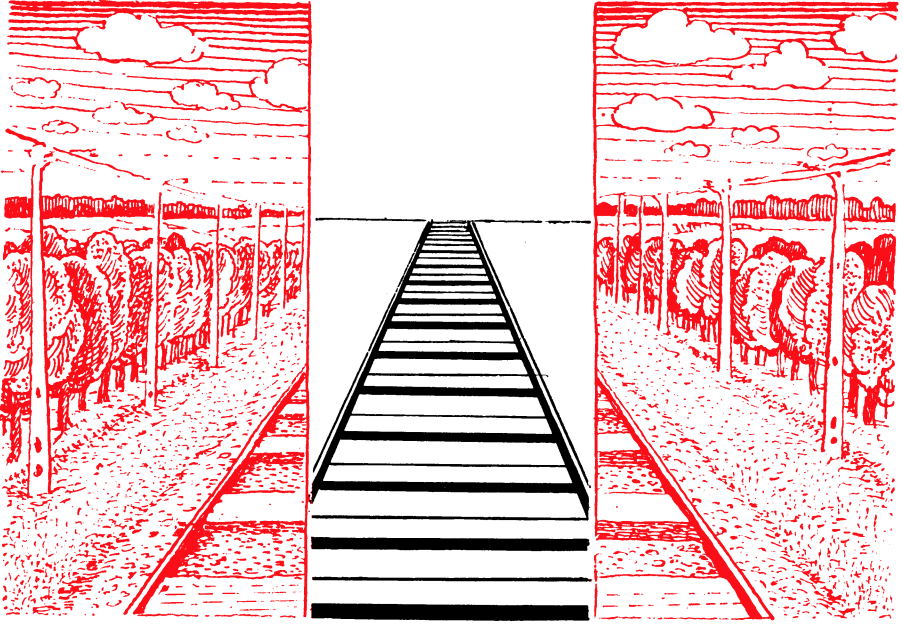
৩ নং ছবি

কোনও বিন্দু থেকে দুটো সমান্তরাল রেখাকে বাড়িয়ে গেলে মনে হবে যেন অনেক দূরের একটা বিন্দুতে মিশে যাচ্ছে তারা, যেমন রেলওয়ের লাইন (৩ নং ছবি), বা দু'ধারে গাছের সারি দেওয়া লম্বা পথ।

কিন্তু সূর্যের কিরণ মাটিতে সমান্তরাল হয়ে পড়ে মানেই এ নয় যে হেলিকপ্টারের নিখুঁত ছায়াটাও হেলিকপ্টারটার সমানই লম্বা হবে। ৪ নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে হেলিকপ্টারের নিখুঁত ছায়াটা শূন্যের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ওপরে পেঁছবার পথে ছোট হয়ে আসে। ফলে হেলিকপ্টারের যে ছায়াটা পড়ে তা তার নিজের চাইতে ছোট—**গ ঘ** যেমন **ক খ**-র চাইতে ছোট হয়েছে।

দৈর্ঘ্যের এই তফাতটা কিন্তু হিসেব করে বের করে ফেলা যায়। অবশ্য তা করতে হলে হেলিকপ্টারটা কত উঁচুতে উড়ছে সেটা জানতে হবে। ধরে নেওয়া যাক ওটা উড়ছে ১০০ মিটার ওপরে। এখন **ক গ**
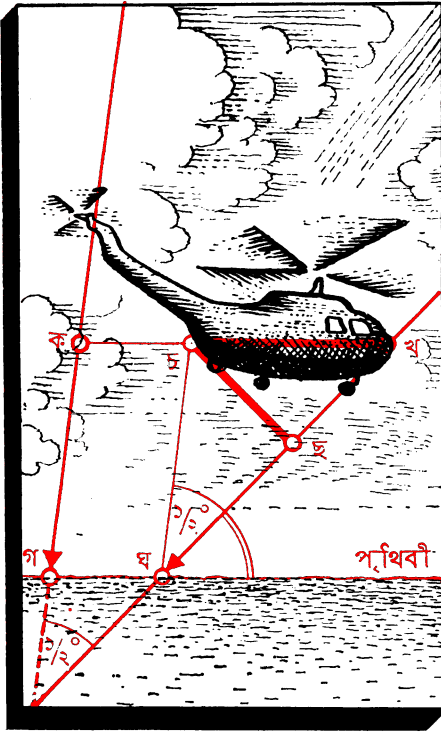
৪ নং ছবি

আর **খ ঘ** রেখার ভেতরে যে কোণটা তৈরি হয়েছে সেটা পৃথিবী থেকে যতটা কোণের ভেতর সূর্যকে দেখা যায় তারই **সমান**। আমরা জানি সেটা হল ১/২°-র **সমান**। আবার এটাও জানা আছে যে, যে জিনিসটাকে ১/২° কোণের ভেতরে দেখা যায়, যে দেখছে তার থেকে সেটার দূরত্ব হয় সেই জিনিসটার ব্যাসের ১১৫ গুণ। তাহলে, **চ ছ** অংশটা (যা পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে ১/২° কোণে দেখা যায়) হল **ক গ**-র ১/১১৫ অংশ। **ক** থেকে সোজাসুজি পৃথিবীর দূরত্ব যতটা (লম্ব দূরত্ব) **ক গ** রেখা তার চেয়ে লম্বায় বড়। এখন, সূর্যের কিরণ পৃথিবীর মাটিতে যদি ৪৫° কোনাকুনিভাবে পড়ে, তাহলে **ক গ** (হেলিকপ্টারের উচ্চতা ১০০ মিটার, তা তো দেওয়াই আছে) হল প্রায় ১৪০ মিটার লম্বা। কাজেকাজেই **চ ছ** অংশটা হল ১৪০ : ১১৫ = ১ · ২ মিটারের সমান।

তাহলেই, হেলিকপ্টার আর ছায়ার ভেতরে তফাতটা — অর্থাৎ **চ খ** **চ ছ**-এর চাইতে বড় (ঠিক ঠিক বলতে গেলে ১·৪ গুণ) কারণ **চ খ ঘ** কোণ প্রায় ৪৫°-র সমান। এইভাবে **চ খ** হল ১·২×১·৪-এর সমান, অর্থাৎ প্রায় ১·৭ **মিটার**।

এ সমস্ত হিসেব কিন্তু পরিষ্কার, কালো আর ছায়ার নিখুঁত বেলায়ই খাটবে; অস্পষ্ট, ঝাপসা প্রচ্ছায়ার বেলায় খাটবে না।

এই হিসেবের ফাঁকে কিন্তু আরও একটা জিনিস পাওয়া গেল: হেলিকপ্টারের বদলে যদি ১·৭ মিটার ব্যাসওয়ালা একটা বেলুন থাকত, তাহলে নিখুঁত কোন ছায়া পাওয়া যেত না। আমরা শুধু একটা ঝাপসা প্রচ্ছায়া দেখতে পেতাম।

৮. এ ধাঁধাটার সমাধান করতে হলে উল্টো দিক থেকে শুরু করতে হবে। দেশলাই কাঠিগুলিকে শেষবারের মতো চালান করে দেবার পর সবকটা ভাগেই কাঠির সংখ্যা সমান সমান হয়েছিল—এইখান থেকেই আমাদের হিসেব শুরু করতে হবে। এখন এই সাজানোর সময় দেশলাই কাঠির মোট সংখ্যা (৪৮) তো আর পরিবর্তন হয় নি তাই প্রতিভাগে মোট ১৬টা করেই কাঠি ছিল।

তাহলে, সবশেষে আমরা যা পেয়েছিলাম, তা হল:

প্রথম ভাগ	দ্বিতীয় ভাগ	তৃতীয় ভাগ
১৬	১৬	১৬

ঠিক এর আগেই প্রথম ভাগের সঙ্গে আমরা সমান সংখ্যার কাঠি যোগ করেছিলাম। তার মানেই হল প্রথম ভাগে কাঠি এনে নিখুঁত দেবার পর সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়েছে। তাহলে শেষবারের মতো সাজিয়ে রাখার আগে প্রথম ভাগে ছিল মাত্র ৮টা কাঠি। আর তৃতীয় ভাগে, যেখান থেকে এই ৮টা কাঠি নিয়েছিলাম সেখানে ছিল: ১৬ + ৮ = ২৪।

এখন তাহলে ভাগগুলোর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে:

প্রথম ভাগ	দ্বিতীয় ভাগ	তৃতীয় ভাগ
৮	১৬	২৪

এরপর আবার আমরা জানি যে তৃতীয় ভাগে যত কাঠি ছিল দ্বিতীয় ভাগ থেকে সেই সংখ্যার কাঠি নিয়েছিলাম আমরা। তার মানে হল আগের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে ২৪ হয়েছে। তাহলে প্রথম বার সাজানোর পর আমাদের ভাগগুলোতে কতগুলি করে কাঠি ছিল, তা পাওয়া যাচ্ছে:

প্রথম ভাগ	দ্বিতীয় ভাগ	তৃতীয় ভাগ
৮	১৬ + ১২ = ২৮	১২

এখন তো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, প্রথম বার সাজানোর আগে (অর্থাৎ প্রথম থাক থেকে দ্বিতীয় থাকের সমান সংখ্যার কাঠি নিয়ে তাতে যোগ করার আগে) প্রতি থাকে দেশলাই কাঠির যে সংখ্যাটা ছিল, তা হল:

প্রথম ভাগ	দ্বিতীয় ভাগ	তৃতীয় ভাগ
২২	১৪	১২

৯. এ ধাঁধাটাকেও উল্টো দিক থেকে সমাধান করা সহজ হবে। ব্যাপার হল, যখন টাকাটাকে তৃতীয় বারের মতো দ্বিগুণ করা হল, তখন থলেটায় ছিল ১ রুবল ২০ কোপেক (শেষবারে এই টাকাটা পেয়েছিল বুড়ো)। এর আগে তাহলে থলেটায় কত ছিল? ছিল ৬০ কোপেক। এই টাকাটাই তাহলে বুড়োকে দ্বিতীয় বারের রুবল আর ২০ কোপেক মিটিয়ে দেবার পর ছিল কৃষকের কাছে। তাহলে টাকাটা দেবার আগে ছিল: ১·২০+ ০·৬০=১·৮০।

আবার: ১ রুবল ৮০ কোপেক দাঁড়িয়েছিল টাকাটাকে দ্বিতীয় বার দ্বিগুণ করার পর। তার আগে ছিল ৯০ কোপেক মাত্র। তার মানে বুড়োকে প্রথম বারের রুবল আর ২০ কোপেক মিটিয়ে দেবার পর এই টাকাটাই অবশিষ্ট ছিল। তাহলে, প্রথম বারে টাকা দেবার আগে থলেটায় ছিল ০·৯০ + ১·২০ = ২·১০। আর এটা হল প্রথম বারে দ্বিগুণ করার পর। সবচেয়ে প্রথমে তাহলে ছিল এরও অর্ধেক অথবা ১ রুবল ৫ কোপেক। এই টাকাটা নিয়েই কৃষক তাড়াতাড়ি বড় লোক হবার নিষ্ফল কারবারে নেমেছিল।

উত্তরটাকে একটু মিলিয়ে দেখা যাক:

থলের ভেতর যে টাকাটা ছিল:

প্রথম বার দ্বিগুণ করার পর	১·০৫ × ২ = ২·১০
প্রথম বার টাকা মেটাবার পর	২·১০ — ১·২০ = ০·৯০
দ্বিতীয় বার দ্বিগুণ করার পর	০·৯০ × ২ = ১·৮০
দ্বিতীয় বার টাকা মেটাবার পর	১·৮০ — ১·২০ = ০·৬০
তৃতীয় বার দ্বিগুণ করার পর	০·৬০ × ২ = ১·২০
তৃতীয় বার টাকা মেটাবার পর	১·২০ — ১·২০ = ০

১০. আমাদের ক্যালেন্ডার এসেছে পুরনো রোমানদের কাছ থেকে। তাঁরা জুলিয়াস সিজারের আগে পর্যন্ত বছর শুরু করতেন মার্চ মাস থেকে। তখন ডিসেম্বর ছিল দশম মাস। যখন নববর্ষ ১ জানুয়ারি থেকে শুরু করা হল মাসের নামগুলোকে কিন্তু আর পরিবর্তন করা হল না। এই জন্যই কোন মাসের সংখ্যা আর তাদের নামের অর্থে অমিল রয়ে গেছে।

মাস	অর্থ	অবস্থান
সেপ্টেম্বর	সেপ্টেম = সাত	৯ম
অক্টোবর	অক্টো = আট	১০ম
নভেম্বর	নভেম = নয়	১১শ
ডিসেম্বর	ডেকা = দশ	১২শ

১১. প্রথম সংখ্যাটা থেকে কী দাঁড়াল দেখা যাক। শুরুতে সংখ্যাটার পাশে ঠিক ঐ সংখ্যাটাই লেখা হল। তার মানেই হল সংখ্যাটাকে ১০০০ দিয়ে গুণ করে তার সঙ্গে প্রথম সংখ্যাটা যোগ করলে যা হয় তাই, যেমন:

$$৮,৭২,৮৭২ = ৮,৭২,০০০ + ৮৭২$$

তাহলে এটা পরিষ্কার হল যে আমরা আসলে প্রথম সংখ্যাটাকে ১০০১ দিয়ে গুণ করেছি। তারপর এটাকে পরপর ৭, ১১ আর ১৩ দিয়ে ভাগ করেছি, অথবা ৭ × ১১ × ১৩, অর্থাৎ ১০০১ দিয়ে ভাগ করেছি — তাই না?

তাহলে, আমরা প্রথমে সংখ্যাটাকে ১০০১ দিয়ে গুণ করেছি, পরে সেটাকে ১০০১ দিয়ে ভাগ করেছি। জলবৎ তরলং নয় কি?

* * *

ছুটির দিনের ধাঁধার পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে, তোমাদের আরও তিনটে অঙ্কের খেলা বলে দিচ্ছি। এগুলো তোমাদের বন্ধুদের দিতে পার। এর ভেতর দুটোতে তোমাদের মনে মনে সংখ্যা বের করতে হবে, আর তৃতীয়টাতে কটা জিনিসের মালিক কে, বের করতে হবে।

এই ধাঁধাগুলো বহুদিনের পুরনো বোধ হয়, তোমরা বেশ জানও এগুলো। কিন্তু এই ধাঁধাগুলোর ভিত্তি সবাই জানে কিনা, তা ঠিক বলতে পারি না। আর অঙ্কের খেলায় তার তত্ত্বের ভিত্তিটা না জানলে, তা সমাধান করা সম্ভব হবে না তোমাদের পক্ষে। প্রথম দুটোর ব্যাখ্যা বুঝতে হলে বীজগণিতে একেবারে প্রথম দিকের একটু জ্ঞান দরকার হবে।

১২. হারানো সংখ্যা

তোমার বন্ধুদের কয়েকটা অংকওয়ালা একটা সংখ্যা লিখতে বল। কিন্তু শেষের অংক শূন্য হলে চলবে না। ধর সংখ্যাটা হল ৮৪৭। তাকে সংখ্যার তিনটে অংককে পাশাপাশি যোগ করে, যোগফল সংখ্যাটা থেকে বিয়োগ দিতে বল। তাহলে ফলটা দাঁড়াবে:

$$৮৪৭ - ১৯ = ৮২৮$$

এই সংখ্যা থেকে যেকোন একটি বাদ দিয়ে বাকি দুটো তাকে বলতে বল। এখন যদিও তোমার আসল অংকটা বা সংখ্যাটার কিছুই জানা নেই তবু তাকে অংকটা বলে দিতে পারবে।

এটা কি করে ব্যাখ্যা করা যায় বল তো?

ব্যাপারটা খুবই সহজ। তোমাকে যেটা করতে হবে তা হল: তোমার জানা দুটো অংকের সঙ্গে এমন একটা অংক যোগ করতে হবে, যার সবচেয়ে কাছের সংখ্যাটা ৯ দিয়ে ভাগ দিলে মিলে যায়। উদাহরণ দিচ্ছি: যদি ৮২৮-এর ভেতর সে প্রথম অংক (৮) বাদ দিয়ে, অন্য দুটো অংক (২ আর ৮) তোমাকে বলে, তাহলে তুমি সে দুটোকে যোগ করে পেলে ১০। ১০-এর পর সবচেয়ে প্রথমে যে সংখ্যাটা ৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় তা হল ১৮। তাহলে সেই হারানো সংখ্যাটা হল ৮।

সেটা আবার কি করে হয়? সংখ্যাটা যাই হোক না কেন, তা থেকে অংকগুলোর যোগফল বিয়োগ করলে ফলটা সবসময়ই ৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে। আচ্ছা, শতকের ঘরের অংকটাকে ধরি **প**, দশকের ঘরে ধরলাম **ফ**, আর **ব** ধরলাম এককের কোঠায়। তাহলে এগুলো দিয়ে পুরো সংখ্যাটা হল:

$$১০০\textbf{প} + ১০\textbf{ফ} + \textbf{ব}$$

এই সংখ্যা থেকে অংকগুলোর মোট যোগফল **প** + **ফ** + **ব** বিয়োগ দিলে আমরা পাচ্ছি:

$$১০০\textbf{প} + ১০\textbf{ফ} + \textbf{ব} - (\textbf{প} + \textbf{ফ} + \textbf{ব}) = ৯৯\textbf{প} + ৯\textbf{ফ} = ৯(\textbf{১১প} + \textbf{ফ})$$

কিন্তু ৯(**১১প+ফ**)-কে ৯ দিয়ে ভাগ করলে নিশ্চয়ই মিলে যাবে। তাহলে, কোনো সংখ্যা থেকে তার অংকগুলোর যোগফল বিয়োগ করলে ফলটা সবসময়ই ৯ দিয়ে বিভাজ্য হবে।

এমন হতে পারে, যে দুটো অঙ্ক বলে দেবে তাদের যোগফলই ৯ দিয়ে ভাগ যায় (যেমন ৪ আর ৫)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে অঙ্কটা তোমার বন্ধু বাদ দিয়েছে তা হয় ০ অথবা ৯। সেসব জায়গায় তোমাকে বলতে হবে যে, লুপ্ত সংখ্যাটা হল ০ অথবা ৯।

এই খেলাটাই অন্য আর একভাবে খেলা চলে: আসল সংখ্যা থেকে অঙ্কগুলোর যোগফল বিয়োগ দেওয়ার বদলে তোমার বন্ধুকে ঐ অঙ্কগুলোকেই ইচ্ছেমতো অন্যভাবে সাজিয়ে বিয়োগ দিতে বল। একটা উদাহরণ ধরা যাক। যদি সে সংখ্যাটা লেখে ৮২৪৭, তাহলে ২৭৪৮ বিয়োগ করতে পারে (নতুন করে সাজিয়ে সংখ্যাটা যদি প্রথম সংখ্যাটা থেকে বড় হয়ে যায় তবে প্রথমটাকেই বিয়োগ দাও)। বাকিটা আগের মতোই করতে হবে: ৮২৪৭ – ২৭৪৮ = ৫৪৯৯। এ থেকে বাদ দেওয়া অঙ্কটা যদি হয় ৪, তবে অন্য অঙ্ক তিনটে জেনে নিয়ে যোগ দিলে পাওয়া যাবে ২৩। এর সবচেয়ে কাছাকাছি যে সংখ্যাটা ৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় তা হল ২৭। তাহলে লুপ্ত অঙ্কটা হল ২৭ – ২৩ = ৪।

১৩. কার কাছে আছে?

এই বুদ্ধির খেলায় পকেটে রাখা চলে এমন তিনটে জিনিস দরকার। একটা পেন্সিল, একটা চাবি, আর একটা কলম-কাটা ছুরিতেই তা বেশ চলতে পারে। এসব বাদে, একটা প্লেটে ২৪টা বাদাম টেবিলের ওপর রেখে দাও। দাবা বা পাশার ঘুঁটি অথবা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়েও কাজটি বেশ চলতে পারে।

এই সমস্ত যোগাড়যন্তর শেষ করে, তোমার তিন বন্ধুর প্রত্যেককে বল ঐ তিনটে জিনিস থেকে একটা করে নিয়ে পকেটে রাখতে। একজন নেবে পেন্সিল, দ্বিতীয় জন চাবিটা আর তৃতীয় জন কলম-কাটা ছুরি। ওরা এসব করার সময় তুমি কিন্তু সেখানে থাকবে না। তারপর ঘরে ফিরে এসে তুমি ঠিকঠিক বুঝে ফেল কোনটা কার কাছে আছে।

এই বুঝে ফেলার নিয়মটা বলি এবার: তুমি ফিরে আসবার পর (অর্থাৎ সকলে যখন জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলেছে) ওদের কাছে কিছু বাদাম রাখতে দাও — প্রথম বন্ধুকে দাও একটা, দ্বিতীয় জনকে দুটো আর তৃতীয়কে তিনটে। তারপর ওদের এইভাবে আরও কিছু বাদাম নিতে বলে আবার সে ঘর ছেড়ে চলে যাও — যে পেন্সিল নিয়েছে তাকে নিতে হবে সে যতটা পেয়েছিল ঠিক ততটা, যে চাবি নিয়েছে সে নেবে তাকে যতটা

বাদাম দেওয়া হয়েছিল তার দ্বিগুণ, আর যে কলম-কাটা ছুরি নিয়েছিল তাকে নিতে হবে সে যতটা পেয়েছিল তার চারগুণ।

বাকিগুলো প্লেটেই থাকবে।

ঐভাবে নেওয়া হয়ে গেলে ওরা ভেতরে ডাকবে তোমাকে। তুমিও ভেতরে ঢুকে, প্লেটটার দিকে একবার তাকিয়েই কোন বন্ধুর পকেটে কি রয়েছে বলে দেবে।

এটা আরও তাজ্জব খেলা, কারণ খেলাটা তুমি দেখাচ্ছ একেবারে একা, এমনকি কোন সহকারীও নেই, যে চুপে চুপে ইশারা করতে পারে তোমাকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি এ ধাঁধাটায় কোন কায়দা-টায়দা নেই, সমস্তটাই হল হিসেবের ব্যাপার। প্লেটটায় কটা বাদাম আছে এটা দেখলেই বুঝে নিতে হবে তোমাকে, কে কোনটা নিয়েছে। সাধারণত একটা থেকে সাতটা পর্যন্ত বাদাম পড়ে থাকে, এর বেশী বড় একটা থাকে না — আর এ কটা তো একনজরেই গুণে ফেলতে পারবে। তাহলে কার কাছে কী আছে সেটা কিভাবে জানা যাবে?

ব্যাপারটা খুবই সোজা। তিনটে জিনিসকে যত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখা যায়, তার প্রত্যেকটাতেই প্লেটের ওপর ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার বাদাম পড়ে থাকে। ব্যাপারটা কিভাবে হয় দেখাচ্ছি।

তোমার তিনজন বন্ধুর নাম ধর দামু, দেবু আর ফেলু অথবা ছোট্ট করে বলা যায়, 'দা', 'দে' আর 'ফে'। তিনটে জিনিসকে নাম দেওয়া হল এভাবে: পেন্সিলটা 'পে', চাবিটা 'চা' আর ছুরিটা 'ছু'। তিনটে জিনিস তিন বন্ধুর ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া যায় মোটমাট ছয়ভাবে:

দা	দে	ফে
পে	চা	ছু
পে	ছু	চা
চা	পে	ছু
চা	ছু	পে
ছু	পে	চা
ছু	চা	পে

ওপরের ছকে মোট যে কয়টা ভাগ হওয়া সম্ভব তা দেখানো হয়েছে — এছাড়া আর কোনভাবেই ভাগ হওয়া সম্ভব নয়।

এবার তাহলে দেখা যাক, এক এক ধরনে ভাগ করলে প্রতিবারে **কটা** করে বাদাম পড়ে থাকে।

দেখতে পাচ্ছ, সব বারেই আলাদা আলাদা সংখ্যক বাদাম পড়ে থাকছে। তাহলে, কত বাকি আছে দেখেই তুমি সহজে ঠিক করতে পারবে কার পকেটে কি আছে। তৃতীয় বারে আবার ঘর থেকে বের হবে, তোমার নোটবইটা দেখবে:

দা দে ফে	যে কটা বাদাম তারা নিয়েছে	মোট	কটা বাকি থাকে
পে চা ছু	১ + ১ = ২; ২ + ৪ = ৬; ৩ + ১২ = ১৫	২৩	১
পে ছু চা	১ + ১ = ২; ২ + ৮ = ১০; ৩ + ৬ = ৯	২১	৩
চা পে ছু	১ + ২ = ৩; ২ + ২ = ৪; ৩ + ১২ = ১৫	২২	২
চা ছু পে	১ + ২ = ৩; ২ + ৮ = ১০; ৩ + ৩ = ৬	১৯	৫
ছু পে চা	১ + ৪ = ৫; ২ + ২ = ৪; ৩ + ৬ = ৯	১৮	৬
ছু চা পে	১ + ৪ = ৫; ২ + ৪ = ৬; ৩ + ৩ = ৬	১৭	৭

এর ভেতরে ওপরের ছকটা তুমি আগেই লিখে রেখেছ (সত্যি কথা বলতে কি, কেবল প্রথম আর শেষ সারিটাই তোমার দরকার হবে)। ছকটা মুখস্থ করে রাখা কঠিন। কিন্তু সত্যি বলতে কি তার কোনও দরকারই নেই। ছকটাই জানিয়ে দেবে কোথায় কোন জিনিসটা আছে। উদাহরণ ধরা যাক, যদি প্লেটটায় পাঁচটা বাদাম পড়ে থাকে, তাহলে জিনিসগুলো ছড়িয়ে আছে — 'চা' 'ছু' 'পে' এইভাবে। তার মানে দামুর কাছে চাবি, দেবুর আছে ছুরি, আর ফেলু নিয়েছে পেন্সিল।

যদি ঠিকঠিক দেখাতে চাও, তাহলে তিন বন্ধুর কাকে কটা বাদাম দিয়েছিল তা মনে রাখতেই হবে (এটা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল বর্ণমালার অক্ষর অনুসারে দিয়ে যাওয়া, আর এখানে তাই-ই করেছি আমরা)।

২

খেলা ও অঙ্ক

ডোমিনো
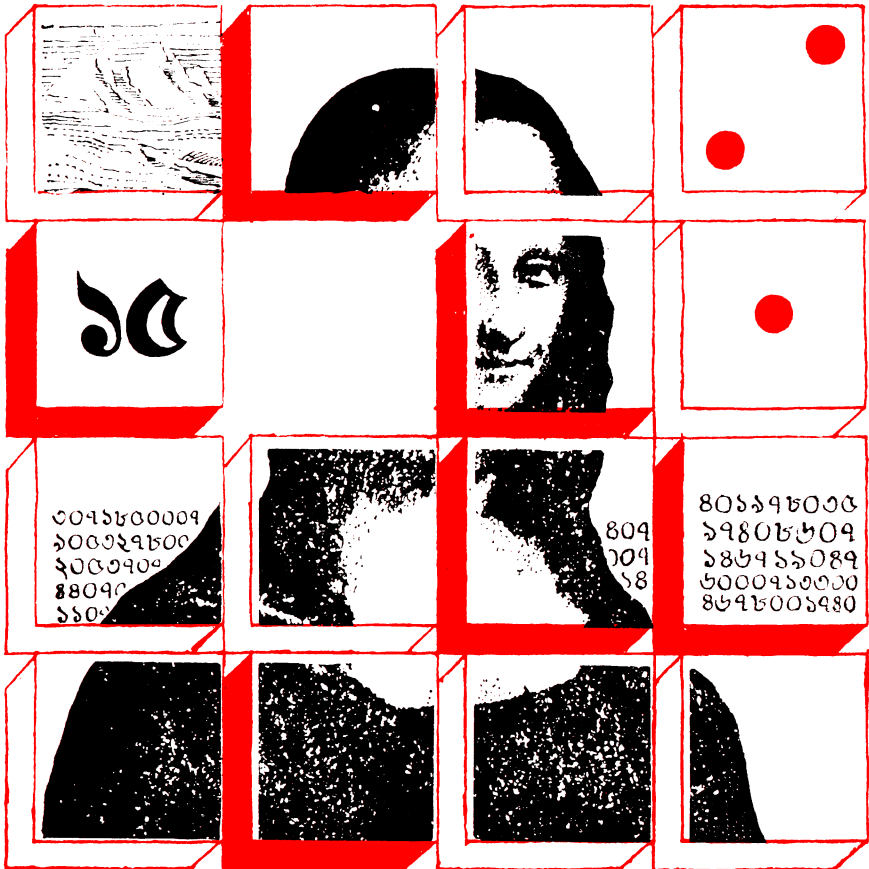
১৪. ২৮ ঘুঁটির সারি

ডোমিনো খেলার সব নিয়মকানুন মেনে, ২৮টা ঘুঁটিকে টানা সারিতে সাজাতে পার?

১৫. এক সারির দুই মাথা

ডোমিনোর ২৮ ঘুঁটির সারি শুরু হচ্ছে পাঁচ ফোঁটার ঘুঁটি দিয়ে। তাহলে শেষ হবে কত ফোঁটা ঘুঁটিতে?

১৬. মজার খেলা ডোমিনো

তোমার বন্ধু ডোমিনোর একটা ঘুঁটি নিয়ে নিল; বাকি থাকল ২৭টা। এই ২৭টা দিয়েই সে তোমাকে একটা সারি সাজাতে বলল। ও তো বেশ জোর দিয়েই বলে গেল যে, যে ঘুঁটিটাই নেওয়া যাক না কেন সারি ঠিকই সাজানো যাবে। তারপর সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

তুমি ঘুঁটিগুলোকে সারিতে সাজিয়ে দেখলে যে তোমার বন্ধু ঠিকই বলেছে। আরও অবাক কাণ্ড: তোমার বন্ধু সারিটা না দেখেই ওর দুই মাথার ঘুঁটিতে কটা করে ফোঁটা আছে বলে দিল।

কিভাবে জানল বল তো? আর ২৭ ঘুঁটিতেও যে সারি তৈরি করা চলবে তাতেই বা সে এত নিঃসন্দেহ হল কি করে?

১৭. একটি কাঠামো

৫ নং ছবিতে ডোমিনো ঘুঁটি দিয়ে তৈরি একটা চৌকো কাঠামো আছে। খেলার নিয়মকানুন সবই মানা হয়েছে এতে। কাঠামোর চারটে বাহু লম্বায় সমান; ফোঁটাগুলোর মোট সংখ্যা কিন্তু সমান নয়। বাঁদিকের বাহুতে আর মাথার দিকে মোট ৪৪টা করে ফোঁটা আছে। বাকি দুটোতে আছে ৫৯ আর ৩২।
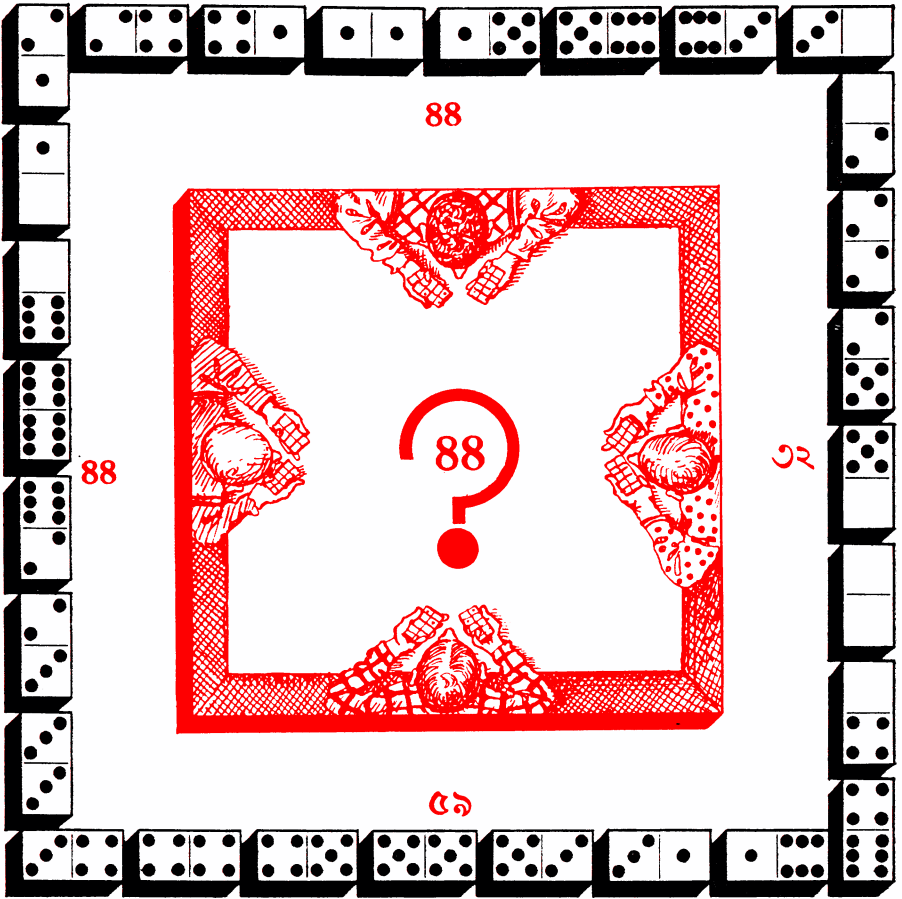
৫ নং ছবি। ডোমিনো কাঠামো।

এমন কোন সমান বাহ্ওয়ালা চৌকো কাঠামো তৈরি করতে পার, যাতে প্রতি বাহ্তেই ৪৪টা করে ফোঁটা থাকবে?

১৮. সাতটা বর্গক্ষেত্র

৪টা ডোমিনো ঘ্ঁটি দিয়ে এমন একটা বর্গ তৈরি করা যায়, যাতে চারপাশেই ফোঁটাগ্লোর সংখ্যা সমান হয়। (৬ নং ছবিতে এমনই একটা

৬ নং ছবি। ডোমিনো বর্গক্ষেত্র।

বর্গ দেখানো হয়েছে: তার প্রতি বাহুতে ১১ ফোঁটা আছে।)

২৮টা ডোমিনো ঘুঁটির সেট থেকে এইরকম সাতটা বর্গ তৈরি করতে পার? সাতটা বর্গের সব বাহুগুলোতেই যে সমান সংখ্যার ফোঁটা রাখতে হবে তার কোনও মানে নেই, প্রত্যেক বর্গের নিজেদের বাহুর ভেতর সমান ফোঁটা থাকলেই চলবে।

১৯. যাদু-বর্গক্ষেত্র

৭ নং ছবিতে ১৮টা ডোমিনো ঘুঁটির একটা বর্গক্ষেত্র আছে। এর সবচেয়ে মজা হল উপর নীচে, পাশাপাশি বা কোনাকুনি, এর সব দিকের বাহুতেই ফোঁটা আছে ১৩টা। অনাদিকাল থেকে এই বর্গগুলোকে বলা হয় 'যাদু-বর্গক্ষেত্র'।

১৮টা ঘুঁটি দিয়ে আরও কয়েকটা যাদু-বর্গক্ষেত্র তৈরি কর তো, অবশ্য ফোঁটার সংখ্যাগুলো আলাদা হবে। বাহুগুলিতে ফোঁটার যোগফল কমপক্ষে হতে পারে ১৩, আর সবচেয়ে বেশী হতে পারে ২৩।

২০. ছোট থেকে বড় করে ডোমিনো ঘুঁটি সাজানো

৮ নং ছবিতে খেলার নিয়মকানুন মেনে ছয়টা ডোমিনো ঘুঁটি সাজানো
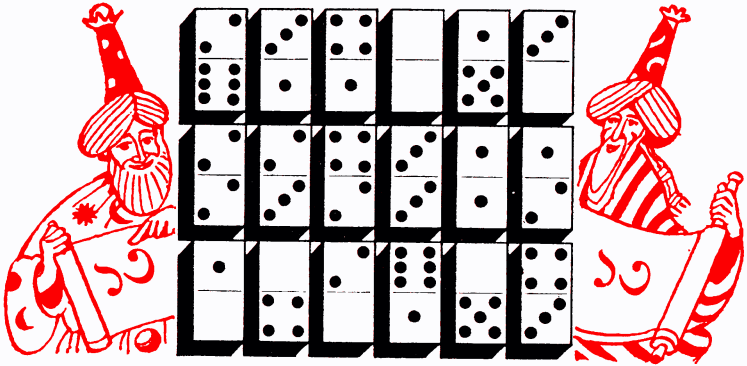
৭ নং ছবি। যাদু-বর্গক্ষেত্র।

আছে। প্রতি ঘংটিতে ফোঁটার সংখ্যা এক এক করে বেড়ে গেছে। যেমন, প্রথমটায় আছে চারটে, দ্বিতীয়টায় পাঁচটা, তৃতীয়টায় ছয়টা, চতুর্থতে সাতটা, পঞ্চমটায় আটটা আর ষষ্ঠটায় আছে নয়টা।

এভাবে সমান সমান সংখ্যায় পরপর বেড়ে গেলে অথবা কমে গেলে সেই সংখ্যার সারিকে বলা হয় 'পাটিগণিতের প্রগতি'। এখানে, প্রত্যেক সংখ্যা তার আগের সংখ্যা থেকে এক বেশী, কিন্তু এই 'তফাতটা' অন্যরকমও হতে পারে।

তোমাদের ছ'টা ঘংটি দিয়ে আরও কয়েকটা এইরকম সারি বানাতে হবে।

৮ নং ছবি। ছোট থেকে বড় করে ডোমিনো ঘংটি সাজানো।

পনেরোর ধাঁধা

১ থেকে ১৫ পর্যন্ত ঘংটি সাজানো বিখ্যাত এক চ্যাপ্টা চৌকো বাক্সের গল্প খুবই চমৎকার লাগবে তোমাদের, যদিও খুব কম খেলোয়াড়ই জানে এটা। জার্মানির গণিতজ্ঞ আর কুশলী ছক খেলোয়াড় (ড্রাফট্ খেলোয়াড়) ডব্লিউ. আহ্রেনস এ সম্পর্কে লিখেছিলেন:

''১৮৭০-এর দশকের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্রে এক নতুন ধরনের খেলা চালু হল, তার নাম 'পনেরোর ধাঁধা'। এর জনপ্রিয়তা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে যে অল্পদিনেই সমাজের পক্ষে এটা একটা সত্যিকারের দুর্ঘটনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

''বাতিকটা ইউরোপেও পেঁৗছে গেল। মানুষ সব জায়গাতেই ধাঁধাগুলো সমাধানের চেষ্টা করতে লাগল। এমনকি যাত্রী-গাড়িতে বসে কেউ কেউ চেষ্টা করছে এমনও দেখা যেতে লাগল। অফিসের কর্মীরা, দোকানের বিক্রেতারা ধাঁধা সমাধান করার চেষ্টায় এতই ডুবে থাকতে লাগল যে তাদের মালিকরা আর উপায় না দেখে কাজের সময় এই খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল। ফিকিরবাজ লোকেরা এই উন্মত্ততার সুযোগ নিয়ে বিরাট বিরাট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ফেলল।

৯ নং ছবি। পনেরোর ধাঁধা।

"ধাঁধাটা জার্মানির রাইখ্‌স্টাগে পর্যন্ত এসে ঢুকল। বিখ্যাত ভৌগোলিক আর গণিতজ্ঞ সিগমন্ড গুন্‌থার এই সময় ছিলেন রাইখ্‌স্টাগের ডেপুটি। তাঁর পাকাচুল সহকর্মীদের তিনি এই সময় ছোট চৌকো বাক্সগুলোর ওপর চিন্তামগ্ন হয়ে ঝুঁকে বসে থাকতে দেখেছিলেন বলে স্মরণ করেন।

"প্যারিসে এই খেলাটা হত বুলভারের ওপর খোলা জায়গায়। খেলাটা রাজধানী থেকে মফস্বলে ছড়িয়ে পড়ল খুব অল্প সময়ে। এই পাগলামিটাকে একজন ফরাসী লেখক বর্ণনা করেছিলেন এভাবে: 'গ্রামগুলোতে এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে এই খেলা মাকড়শার মতো জাল বিস্তার করে নি।'

"১৮৮০ সালে বাতিকটা চরমে পেঁৗছল। কিন্তু গণিতজ্ঞগণ অল্প সময়েই এই অত্যাচার ঠাণ্ডা করে দিলেন। তাঁরা প্রমাণ করলেন, যত ধাঁধা দেওয়া হয়ে থাকে তার অর্ধেকমাত্র সমাধান করা যেতে পারে। বাকিগুলোর সমাধানের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

''হাজার চেষ্টা করেও কতকগুলো ধাঁধা কিছুতেই কেন সমাধান করা যায় না বা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপকরা সমাধানের জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করতে কেন ভয় পায় না — গাণিতিকরা তা একেবারে পরিষ্কার করে দিলেন। আর এ ব্যাপারে এই ধাঁধাটাকে যিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেই স্যামুয়েল (স্যাম) লয়েড সব্বাইকে ছাড়িয়ে গেলেন। নিউ ইয়র্কের এক খবরের কাগজের মালিককে তিনি এই ঘোষণা করতে বললেন যে, পনেরো প্রহেলিকার একটি বিশেষ ধাঁধাকে যে সমাধান করতে পারবে তাকে ১০০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। কাগজের প্রকাশক একটু ইতস্তত করলে লয়েড বললেন, টাকাটা তিনি নিজেই দেবেন। লয়েড বিখ্যাত ছিলেন তাঁর হেঁয়ালী আর মাথাঘামানো কূটপ্রশ্নের জন্য। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর এই হেঁয়ালীটাকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেটেন্ট করতে পারলেন না। আইন অনুসারে, এজাতীয় কোন কিছুর জন্য পেটেন্ট পেতে
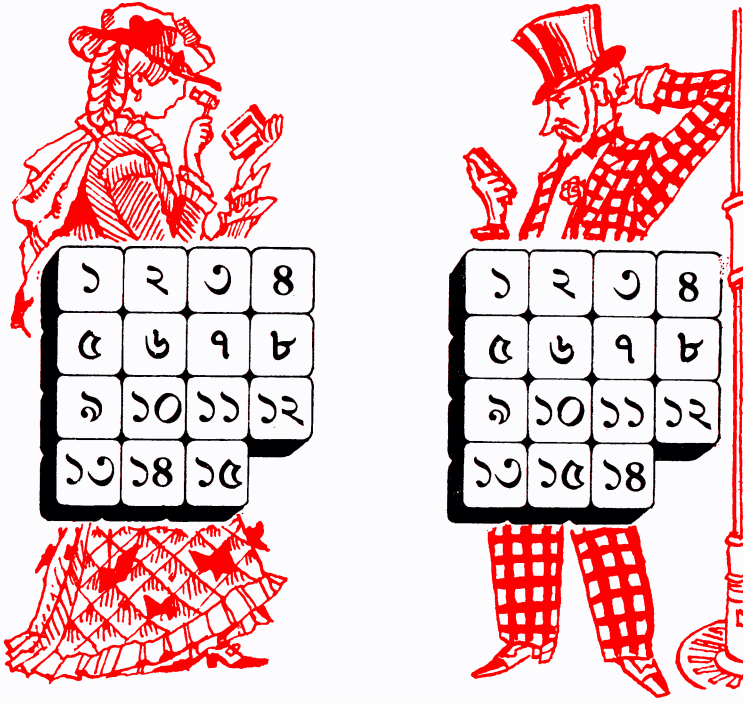
১০ নং ছবি। ঘ‍ুঁটির স্বাভাবিক অবস্থান (প্রথম অবস্থা)।
১১ নং ছবি। সমাধানাতীত অবস্থান (দ্বিতীয় অবস্থা)।

হলে একটা সমাধানের নিদর্শন দাখিল করতে হত। পেটেন্ট অফিসে তাঁকে প্রশ্ন করা হল, ধাঁধাটা সমাধান করা চলে কিনা? লয়েডকে তখন স্বীকার করতে হল যে অঙ্কের দিক থেকে সেটা সম্ভব নয়। পেটেন্ট অফিসের কর্মচারীরা তখন বললেন, সমাধানের নিদর্শন পাওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন কোন পেটেন্টও হতে পারে না। লয়েড অবশ্য ব্যাপারটাকে সেখানেই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কার যে কি অস্বাভাবিক সাফল্য আনতে পারে তা আগে থেকে জানতে পারলে তিনি যে আরও বেশী নাছোড়বান্দা হয়ে ধরতেন, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।''

এখানে এই ধাঁধাটা সম্পর্কে কতকগ‍ুলো বিষয় বলা হচ্ছে — আবিষ্কারক নিজেই বলেছিলেন এগ‍ুলো:

''ধাঁধা সম্পর্কে যারা উৎসাহী তাদের হয়ত বেশ মনে আছে ১৮৭০

সালে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে কতকগুলো চলনশীল ঘুঁটিওয়ালা বাক্স দিয়ে আমি তাদের মাথা কেমন ঘুলিয়ে দিয়েছিলাম। এর নাম হয়েছিল 'পনেরোর ধাঁধা' (১০ নং ছবি)। ঘুঁটিগুলোর ভেতর কেবল ১৪ আর ১৫ এই দুটো বাদে বাকি তেরোটা ঠিকঠিক সাজানো ছিল (১১ নং ছবি)। কাজটা ছিল প্রতিবারে একটা করে ঘুঁটি সরিয়ে ১৪ ও ১৫-কে ঠিক পরপর সাজাতে হবে।

''প্রথম সঠিক সমাধানের জন্য যে ১০০০ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, কেউই তা পেল না, যদিও সবাই অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে যেতে লাগল। এ সম্বন্ধে মজার মজার গল্প আছে: ব্যবসায়ীরা সমাধান করতে বসে এত মগ্ন হয়ে যেত যে তাদের দোকান খুলতে ভুলে যেত, সম্মানিত অফিসাররা ধাঁধাটা কোন উপায়ে সমাধানের চেষ্টায় কাটাত রাতের পর রাত। সবাই ভাবত, সমাধান একটা আছেই। তাই তারা এতে লেগেই থাকত। নাবিকদের জাহাজ আটকে যেত চড়ায়, ইঞ্জিনের ড্রাইভাররা স্টেশনে গাড়ি থামাতে ভুলে যেত, আর চাষীরা লাঙলটাঙল উঠিয়ে বসে থাকত।''

* * *

এই ধাঁধার মূল জিনিসটার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেব। সবশুদ্ধ ব্যাপারটা ভয়ানক জটিল, বীজগণিতের সূক্ষ্ম জিনিসগুলোর সঙ্গে এর সম্পর্ক। এ সম্পর্কে আহ্‌রেনস লিখেছিলেন:

''কাজটা হল, খালি জায়গাটা ব্যবহার করে ঘুঁটিগুলো এমনভাবে সরাতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত ১৫টা ঘুঁটিকেই ঠিক পরপর সাজানো যায়, অর্থাৎ ১ম ঘুঁটিকে রাখতে হবে উপরে বাঁদিকের কোণে, ২য় ঘুঁটিকে এর ঠিক ডানদিকে, তারপর ৩য় ঘুঁটি, ৪র্থ ঘুঁটি ওপরের ডানদিকের কোণে। ঠিক এভাবেই ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম ঘুঁটিকে সাজাতে হবে পরের সারিতে— এভাবে চলবে (১০ নং ছবি)।

''ধরে নাও যে ঘুঁটিগুলো সব এলোমেলো করে সাজানো আছে। ১ম ঘুঁটিকে কয়েক বার চাল দিয়ে তার নিজের জায়গায় এনে ফেলা সবসময়েই সম্ভব।

''এখন ১ম ঘুঁটিকে না ছুঁয়ে ২য় ঘুঁটিকে তার পরের খোপে এনে রাখাও তেমনভাবেই সম্ভব। তারপর ১ম ও ২য় ঘুঁটিকে না ছুঁয়ে ৩য় ও ৪র্থ ঘুঁটিকেও তাদের জায়গায় আনা চলবে। যদি এমন হয় যে তারা ওপর নীচে লম্বা শেষ দুটো সারিতে না থাকে তাহলেও তাদের সে

জায়গায় সহজেই নিয়ে এসে ইচ্ছেমতো সাজানো যায়। উপরের সারিতে ১ম, ২য়, ৩য় আর ৪র্থ ঘুঁটি এখন ঠিক জায়গা মতন আছে। এরপরের চালগুলোতে এই চারটে ঘুঁটিকে আমরা একেবারে আলাদা রেখে দেব। ঠিক একই ভাবে আমরা ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম আর ৮ম-এর ঘুঁটিটাকে সাজাতে চেষ্টা করলে দেখব তাও সম্ভব। এরপর আবার দুটো সারিতে ৯ম ও ১৩শ ঘুঁটিদুটোকে ঠিক জায়গায় বসানো দরকার হবে। একবার ঠিক করে সাজানো হয়ে গেলে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১৩শ ঘুঁটিকে আর নড়ানো হবে না। এখন তাহলে থাকল ছয়টা খোপ — এর ভেতরে একটা খালি, আর বাকিগুলোতে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৪শ আর ১৫শ ঘুঁটি। ১০ম, ১১শ, ১২শ ঘুঁটিকে বারবার চাল দিয়ে ঠিকমতো সাজানো সবসময়ই চলতে পারে। এটা করা হয়ে গেলে, ১৪শ আর ১৫শ ঘুঁটিদুটো নিচের সারিতে, হয় সঠিক জায়গায় আর না হলে অন্য জায়গায় থাকবে (১১ নং ছবি)। তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে যে, এভাবে আমরা এইরকম একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছি:

''ঘুঁটিগুলিকে যেকোনভাবে সাজানো অবস্থা থেকে আমরা হয় ১০ নং ছবির মতন (১ম অবস্থা) বা ১১ নং ছবির মতন (২য় অবস্থা) অবস্থায় আনতে পারি।

''কোন একটা বিশেষ ধরনের সাজানোকে যদি আমরা ছোট্ট করে নাম দিই 'স' আর এটাকে ১ম অবস্থায় এনে সাজানো যায়, তাহলে বেশ বোঝাই যাচ্ছে যে ওটাকে আমরা উল্টেও সাজাতে পারব; অর্থাৎ ১ম অবস্থা থেকে উল্টে 'স' ধরনে সাজাতে পারব। কেননা, সব চালই আবার ফেরানো যায়। উদাহরণ দিচ্ছি: ১ম অবস্থায় ১২ নং ঘুঁটিকে যদি আমরা খালি খোপে চালান করতে পারি তাহলে তাকে সেখান থেকে আগের জায়গায়ও আনতে পারি।

''তাহলে আমরা দু'ধরনের সাজানো সারি পেলাম: প্রথমটায় ঘুঁটিগুলোকে আমরা নিয়মিতভাবে সাজাতে পারি (১ম অবস্থা), আর দ্বিতীয়টায় আমরা ঘুঁটিগুলোকে সাজাতে পারি ২য় অবস্থায়। আবার উল্টে গিয়ে, নিয়মিত সারি থেকে আমরা প্রথম ধরনের বিন্যাসের যেকোন একটা ধাপে যেতে পারি, আর দ্বিতীয় অবস্থা থেকে দ্বিতীয় ধরনের বিন্যাসের যেকোন একটা ধাপে পৌঁছতে পারি। তাহলে শেষটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, কোন এক ধরনের বিন্যাসের এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে চলে যাওয়া যায়।

''১ম অবস্থা থেকে কি ২য় অবস্থায় যাওয়া সম্ভব? (খুঁটিনাটির ভেতর না গিয়ে) এটা সত্যিই প্রমাণ করা যায় যে অনবরত চাল দিলেও তা সম্ভব নয়। তাহলে, ঘুঁটিগুলির এই বিরাট সংখ্যার বিন্যাসকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়: প্রথম ভাগ হল যাতে ঘুঁটিগুলোকে স্বাভাবিক নিয়মে সাজানো যায়, অর্থাৎ সমাধানের যোগ্য; আর দ্বিতীয় ভাগে ঘুঁটিগুলোকে কখনই স্বাভাবিক নিয়মে সাজানো চলে না, অর্থাৎ সমাধানাতীত। এই দ্বিতীয় ভাগের বিন্যাসগুলি সমাধান করার জন্যই বিরাট বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করা হত।

''ঘুঁটিগুলোর কোন এক ধরনের অবস্থান কোন বিন্যাসের ভেতর পড়ে, তা বলার কি কোন উপায় আছে? আছে, তারই একটা উদাহরণ দেওয়া হল (১২ নং ছবি)।

''১২ নং ছবির ঘুঁটিগুলোর অবস্থান পরীক্ষা করা যাক।

''প্রথম সারির ঘুঁটিগুলো ঠিকই আছে, দ্বিতীয় সারিও ঠিক আছে, কেবল ৯ম ঘুঁটি বাদে। ঘুঁটিটা আসলে ৮-এর জায়গাটা দখল করে আছে। তাহলে ৯ম ঘুঁটি রয়েছে ৮ম ঘুঁটির আগে। স্বাভাবিক নিয়মের এই ব্যতিক্রমকে বলা হয় 'অনিয়ম'। ৯ম ঘুঁটি সম্পর্কে আমরা বলব, এখানে একটা 'অনিয়ম'। আরও পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ১৪শ ঘুঁটি তার নিজের জায়গা থেকে তিন ধাপ আগে এসে গেছে, তার মানে ওটি ১১শ, ১২শ ও ১৩শ ঘুঁটির আগেই জায়গা নিয়েছে। এখানে আমরা তিনটে 'অনিয়ম' পাচ্ছি (১৪, ১২-র আগে; ১৪, ১৩-র আগে; ১৪, ১১-র আগে)। সবশুদ্ধ হল ১ + ৩ = ৪টে 'অনিয়ম'। আবার ১২শ ঘুঁটি এসেছে ১১শ ঘুঁটির আগে, যেমন ১৩শ ঘুঁটি এসেছে ১১শ ঘুঁটির আগে। এখানে আমরা পেলাম আরও দুটো 'অনিয়ম'। সবশুদ্ধ 'অনিয়ম' হল ৬টা। প্রথমে নীচের ডানদিকের খোপটা বেশ খেয়াল করে খালি করে নেবে, তাহলে এভাবে প্রত্যেক বিন্যাসে 'অনিয়মের' সংখ্যা বের করা যায়। 'অনিয়মের' মোট সংখ্যা যদি জোড় সংখ্যা হয় — যেমন এখানে হয়েছে, তাহলে ঘুঁটিগুলোকে নিয়মিতভাবে সাজানো চলবে, অর্থাৎ সে ধাঁধাটা সমাধানযোগ্য। অন্যদিকে, 'অনিয়মের' সংখ্যা যদি বিজোড় হয়, তাহলে ঐ বিন্যাসটা পড়ছে দ্বিতীয় ভাগের ভেতরে, অর্থাৎ ধাঁধাটা সমাধানের অযোগ্য (শূন্য 'অনিয়মকে' জোড় হিসেবে ধরা হয়)।

''এই ধাঁধার গাণিতিক ব্যাখ্যা সমাধান-বাতিকটাকে একেবারে মারণ-চোট হানল। গণিতে এই খেলার একটা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব তৈরি হয়েছে, সন্দেহের
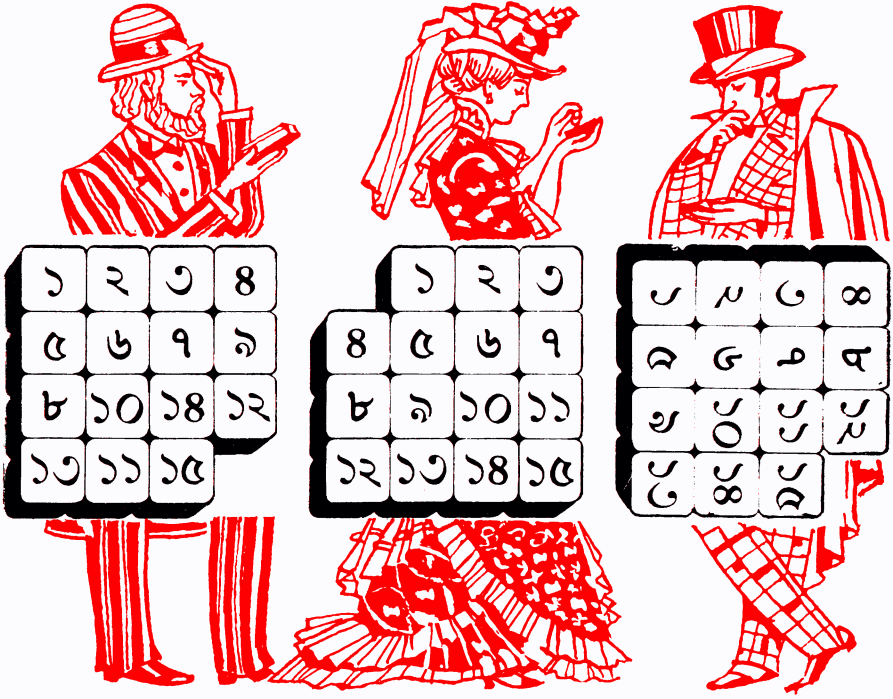
১২ নং ছবি। ঘুঁটিগুলো সঠিকভাবে সাজানো নেই।
১৩ নং ছবি। লয়েডের প্রথম ধাঁধা।
১৪ নং ছবি। লয়েডের দ্বিতীয় ধাঁধা।

কোন স্থান আর নেই তার ভেতর। অন্যান্য খেলার মতো এ খেলার সমাধান আন্দাজ বা উপস্থিত বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না। এর সমাধান নির্ভর করে একেবারে গণিতের হিসেবের উপর। এ দিয়ে ফলটা আগে থেকেই একেবারে ঠিকঠিক বের করে ফেলা যায়।''

এবারে এইরকম কয়েকটা ধাঁধা নিয়ে দেখা যাক। নীচে, সমাধান-করা-চলে এমন তিনটে ধাঁধা দেওয়া হল — উদ্ভাবক নিজেই এগুলোকে তৈরি করেছিলেন।

২১. লয়েডের প্রথম ধাঁধা

১১ নং ছবিতে উপরে বাঁদিকের খোপটা খালি রেখে ঘুঁটিগুলোকে স্বাভাবিক নিয়মে সাজাতে হবে (১৩ নং ছবিতে যেমন দেওয়া আছে)।

২২. লয়েডের দ্বিতীয় ধাঁধা

১১ নং ছবিটা নিয়ে তাকে একটা কিনারার উপর শোয়াও (অর্থাৎ চারভাগের একভাগ ঘোরাও) তারপর ঘুঁটি চেলে ১৪ নং ছবির মতন অবস্থায় নিয়ে এস।

২৩. লয়েডের তৃতীয় ধাঁধা

খেলার নিয়মমতো ঘুঁটি চেলে ১১ নং ছবিটাকে 'যাদু বর্গক্ষেত্রে' পরিণত কর, অর্থাৎ ঘুঁটিগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যে, সর্বদিক দিয়েই যোগফল হবে ৩০।

১৪—২৩ নম্বর ধাঁধার উত্তর

১৪. ধাঁধাটাকে একটু সহজ করে নেওয়ার জন্য সাতটা ডবল ঘুঁটিকে আলাদা করে রাখা যাক: ০—০, ১—১, ২—২ ইত্যাদি। ২১টা ঘুঁটি থাকবে, তার ভেতরে প্রত্যেক সংখ্যা আসছে ছয়বার করে। উদাহরণ দিচ্ছি, এই ৬ ঘুঁটিগুলোতে চারটে করে ফোঁটা (প্রতি ঘুঁটির অর্ধেকটায়) থাকবে:

৪—০, ৪—১, ৪—২, ৪—৩, ৪—৫, ৪—৬

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক সংখ্যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে জোড়া জোড়া দফায়। এটা তাহলে পরিষ্কার যে এই ঘুঁটিগুলোকে পরপর সাজানো যেতে পারে। এটা করা হয়ে গেলে, অর্থাৎ ২১টা ঘুঁটি একটা টানা মালার মতো করে সাজানো হয়ে গেলে, আগের সাতটা ডবল ঘুঁটিকে একই সংখ্যার ফোঁটায় শেষ হয়েছে এমন ঘুঁটিগুলোর ভেতর ঢুকিয়ে দেব। যেমন, এটা হবে দুটো ০, দুটো ১, দুটো ২ ইত্যাদির ভেতর। তারপরে খেলার নিয়মমতো ২৮টা ঘুঁটিই একটা মালার আকারে সাজানো হয়ে যাবে।

১৫. ২৮ ঘুঁটির সারি যত ফোঁটাতে শুরু হয়েছে, ঠিক তত ফোঁটাতেই যে শেষ হবে, তা প্রমাণ করা সোজা। আসলে, তা যদি না হয়, তবে সারির শেষ মাথায় যত ফোঁটা আছে তার পুনরাবৃত্তি হবে বিজোড় সংখ্যায় (সারির ভেতরে সংখ্যাগুলি সবসময়েই জোড়া থাকবে)। যাই হোক, আমরা জানি যে একটা সম্পূর্ণ সেটে প্রতিসংখ্যার পুনরাবৃত্তি হয় আটবার, অর্থাৎ
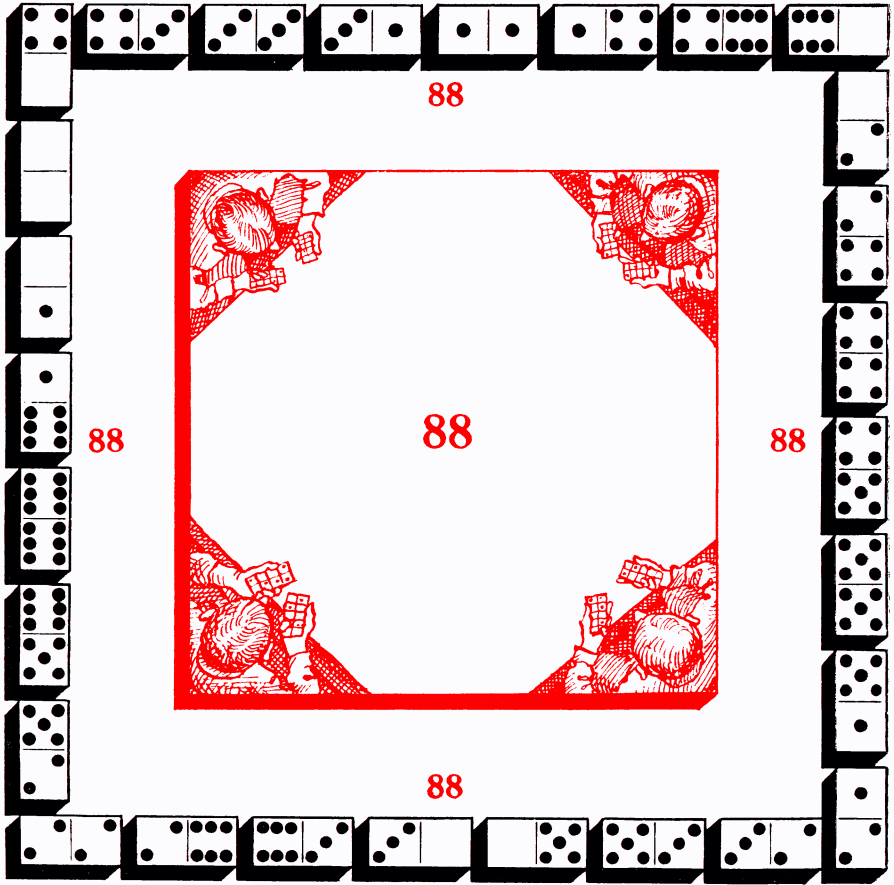
১৫ নং ছবি

জোড়া সংখ্যায়। সুতরাং, সারির শেষ মাথাগুলোতে অসমান সংখ্যার ফোঁটা হতে পারে বলে আমরা যদি মনে করে নিই — তা ভুল হবে। ফোঁটার সংখ্যা সমানই হবে। (গণিতে এই ধরনের যুক্তিবিচারকে বলে 'বিপরীত দিক থেকে প্রতিপাদন'।)

ঘটনাক্রমে সারির এই প্রকৃতির ভেতর আরও একটা মজার ব্যাপার আছে: সেটা হল এই যে, ২৮ ঘুঁটির সারির মাথাগুলিকে মিলিয়ে সবসময়ই একটা মালার আকার দেওয়া চলে। তাহলে একটা পুরো ডোমিনো সেটকে,
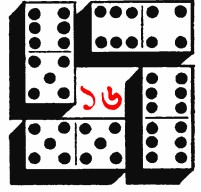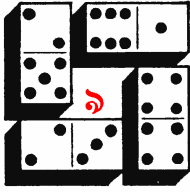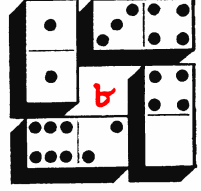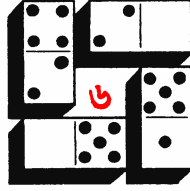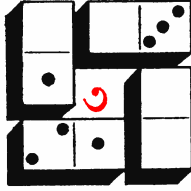
১৬ নং ছবি

খেলার নিয়ম অনুসারে, খোলা প্রান্তওয়ালা সারি বা মালার মতো দু'রকম করেই সাজানো যেতে পারে।

আমার পাঠকদের কৌতূহল হতে পারে যে এই মালা বা সারি কতভাবে তৈরি করা যেতে পারে? হিসেব-নিকেশের পরিশ্রমের ভেতর না গিয়ে আমরা বলতে পারি যে, যত উপায় আছে সব মিলিয়ে তা একটা বিরাট সংখ্যা হবে। ঠিকঠাক বলা যায় যে ৭৯,৫৯,২২,৯৯,৩১,৫২০ রকম উপায় আছে

(অর্থাৎ $২^{১৩} \times ৩^{৮} \times ৫ \times ৭ \times ৪২৩১$-এর সমান)।

১৬. এ ধাঁধার সমাধানও অনেকটা আগের ধাঁধাটারই মতো। আমরা জানি যে ডোমিনোর ২৮টা ঘুঁটিকে সবসময়ই মালার আকারে সাজানো যায়। তাহলে, যদি একটা ঘুঁটি সরিয়ে নিই আমরা, তাহলে

(ক) বাকি ২৭টা ঘুঁটি দিয়ে সবসময়ই একটা টানা সারি তৈরি করা যাবে, যার মাথাদুটো খোলা থাকবে;

(খ) এই সারির খোলা মাথাদুটোয় ফোঁটার সংখ্যা হবে, যে ঘুঁটিটাকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে তারই দুটো অংশে যে সংখ্যাদুটো আছে তার সমান।

তাই, একটা ডোমিনো ঘুঁটি লুকিয়ে রেখে, তুমি সবসময়ই আগে থেকে বলে দিতে পারবে যে সারির প্রান্তভাগে মোট কটা করে ফোঁটা আছে।

১৭. অজানা বর্গক্ষেত্রের চারটে বাহুতে মোট ফোঁটার সংখ্যা নিশ্চয়ই ৪৪ × ৪ = ১৭৬-এর সমান হবে, অর্থাৎ সমস্ত ডোমিনো ঘুঁটিতে মোট যত ফোঁটা আছে (১৬৮) তার চেয়ে ৮ বেশী হবে। এর কারণ হল, বর্গক্ষেত্রের মাথার কোণগুলোতে যে সংখ্যা আছে তা দুবার করে গোনা হয়েছে। এ থেকেই ঠিক করা যায় যে মাথার কোণগুলিতে মোট সংখ্যা থাকবে ৮, আর তা আমাদের দরকারী বিন্যাসটা পেতে সাহায্য করবে, যদিও ঠিকঠিক বিন্যাসটা বের করা বেশ বিরক্তিকরই থেকে যায়। সমাধানটা ১৫ নং ছবিতে দেখান হয়েছে।

১৮. এই ধাঁধাটার অনেকগুলো সমাধানের ভেতর দুটো দেওয়া হল এখানে। প্রথমত (১৬ নং ছবি) আমরা পাচ্ছি:
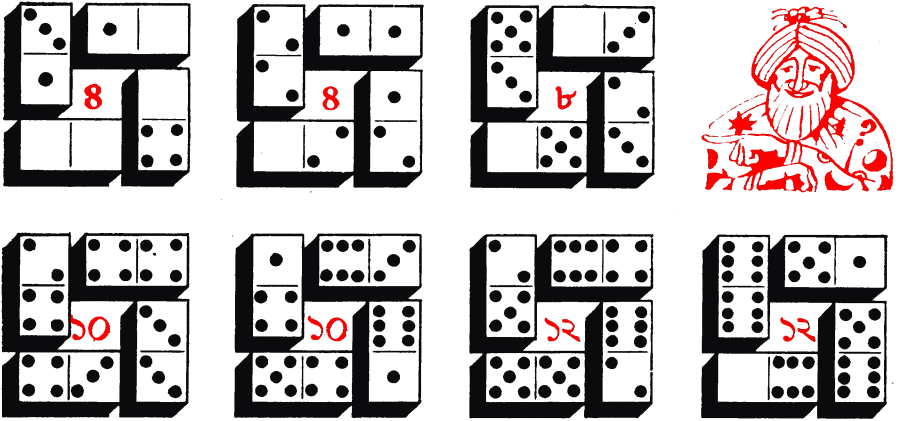
১৭ নং ছবি

১টা বর্গক্ষেত্রে মোট সংখ্যা ৩ ২টা বর্গক্ষেত্রে মোট সংখ্যা ৯
১টা বর্গক্ষেত্রে মোট সংখ্যা ৬ ১টা বর্গক্ষেত্রে মোট সংখ্যা ১০
১টা বর্গক্ষেত্রে মোট সংখ্যা ৮ ১টা বর্গক্ষেত্রে মোট সংখ্যা ১৬

দ্বিতীয়টাতে (১৭ নং ছবি) আমরা পাচ্ছি:

২টা বর্গক্ষেত্রে মোট সংখ্যা ৪ ২টা বর্গক্ষেত্রে মোট সংখ্যা ১০
১টা বর্গক্ষেত্রে মোট সংখ্যা ৮ ২টা বর্গক্ষেত্রে মোট সংখ্যা ১২
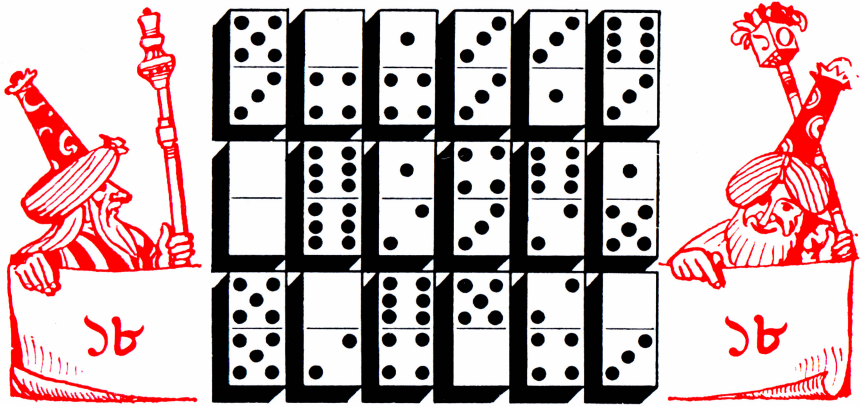
১৮ নং ছবি

১৯. ১৮ নং ছবিতে একটা যাদু-বর্গক্ষেত্রের নমুনা আছে। এতে প্রতি সারিতে ১৮টা করে ফোঁটা আছে।

২০. এখানে 'পাটিগণিত প্রগতির' (ক্রমবর্ধমান) দুটো সারির নমুনা দেওয়া হল। এতে সংখ্যাগুলির তফাত হচ্ছে ২:

(ক) ০—০, ০—২, ০—৪, ০—৬, ৪—৪ (অথবা ৩—৫), ৫—৫ (অথবা ৪—৬)।

(খ) ০—১, ০—৩ (অথবা ১—২), ০—৫ (অথবা ২—৩), ১—৬ (অথবা ৩—৪), ৩—৬ (অথবা ৪—৫), ৫—৬।

এখানে ছ'টা করে ঘুঁটির মোট ২৩টা ক্রমবর্ধমান সারি আছে। যে ঘুঁটিগুলি দিয়ে শুরু করা হয়েছে, তা হল:

(ক) ১ সংখ্যা করে বেড়ে গেছে এমন ক্রমবর্ধমান সারি:

০—০	১—১	২—১	২—২	৩—২
০—১	২—০	৩—০	৩—১	২—৪
১—০	০—৩	০—৪	১—৪	৩—৫
০—২	১—২	১—৩	২—৩	৩—৪

(খ) ২ সংখ্যা করে বেড়ে গেছে এমন ক্রমবর্ধমান সারি:

০—০; ০—২; ০—১

২১. এর সমাধান করা যায় নীচের মতো করে ৪৪টা চাল দিয়ে:

১৪, ১১, ১২, ৮, ৭, ৬, ১০, ১২, ৮, ৭,
৪, ৩, ৬, ৪, ৭, ১৪, ১১, ১৫, ১৩, ৯,
১২, ৮, ৪, ১০, ৮, ৪, ১৪, ১১, ১৫, ১৩,
৯, ১২, ৪, ৮, ৫, ৪, ৮, ৯, ১৩, ১৪,
১০, ৬, ২, ১

২২. এর সমাধান করা চলে নীচের মতো করে ৩৯টা চাল দিয়ে:

১৪, ১৫, ১০, ৬, ৭, ১১, ১৫, ১০, ১৩, ৯,
৫, ১, ২, ৩, ৪, ৮, ১২, ১৫, ১০, ১৩,
৯, ৫, ১, ২, ৩, ৪, ৮, ১২, ১৫, ১৪,
১৩, ৯, ৫, ১, ২, ৩, ৪, ৮, ১২

২৩. মোট ৩০ সংখ্যাওয়ালা যাদু-বর্গক্ষেত্র তৈরি করা যায় নীচের মতো চাল দিয়ে:

১২, ৮, ৪, ৩, ২, ৬, ১০, ৯, ১৩, ১৫,
১৪, ১২, ৮, ৪, ৭, ১০, ৯, ১৪, ১২, ৮,
৪, ৭, ১০, ৯, ৬, ২, ৩, ১০, ৯, ৬,
৫, ১, ২, ৩, ৬, ৫, ৩, ২, ১, ১৩,
১৪, ৩, ২, ১, ১৩, ১৪, ৩, ১২, ১৫, ৩.

৩

আরও এক সারি ধাঁধা

২৪. দড়ি

খোকার মা ময়লা কাপড়-চোপড় কাচা বন্ধ করে রেগে উঠলেন, ''কী! আরও দড়ি চাই বুঝি? ভেবেছ আমি একেবারে দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে বসে আছি! খালি শুনব দড়ি দাও। কালই তো পুরো একগাছি দড়ি দিয়েছি, কী কাজটা করা হল তা দিয়ে, কিসে যে এত লাগে তোমার?''

খোকাও অমনি জবাব দিলে, ''কী আবার করেছি? অর্ধেক তো তুমিই ফিরিয়ে নিলে...''

''না হলে কাপড়-চোপড়গুলো বাঁধব কোন্ মুণ্ডু দিয়ে শুনি?''

''বাকিটার অর্ধেক নিল টম। ও খালের জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরবে।''

''বেশ তো, তোমার বড় ভাইকে তুমি তো আর না বলতে পার না।''

''তা আমি করি নি। আর তো অল্পই ছিল, বাবা তা থেকে আবার অর্ধেক নিলেন গ্যালিস সারাবার জন্যে, মোটরগাড়ীর ব্যাপার যখন ঘটে তখন হাসতে হাসতে ছিড়ে গেছিল ওটা। সবশেষে বিনুনি বাঁধতে খুকু বাকিটার পাঁচ ভাগের দু'ভাগ...''

''আর বাকিটা কি করলে?''

''বাকিটা? আর মাত্র ৩০ সেন্টিমিটারই ছিল, ওই দিয়ে বুঝি টেলিফোন তৈরি করা যায়?''

প্রথমে কতটা দড়ি ছিল?

২৫. মোজা আর দস্তানা

একটা বাক্সে ১০ জোড়া বাদামী মোজা আর ১০ জোড়া কালো মোজা আছে, আরেক বাক্সে আছে ঐ একই সংখ্যার বাদামী আর কালো দস্তানা। তাহলে একই রংয়ের একজোড়া মোজা আর দস্তানা পেতে হলে বাক্স থেকে কটা মোজা আর দস্তানা তুলতে হবে?

২৬. চুলের আয়ু

একজন মানুষের মাথায় গড়পড়তা কত চুল থাকে? প্রায় ১,৫০,০০০*। হিসেব করে দেখা গেছে মানুষের মাথা থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৩০০০ করে চুল ওঠে যায়।

আচ্ছা এ থেকে মানুষের মাথার প্রতিটা চুলের গড়পড়তা আয়ু কত তা বলতে পার?

২৭. মাইনে

মাইনে ও ওভারটাইম মিলিয়ে গত মাসে আমার পাওনা হয়েছিল ১৩০ রুবল। ওভারটাইম বাদে আমার মূল মাইনে হল ওভারটাইমের চেয়ে ১০০ রুবল বেশী। ওভারটাইম বাদ দিয়ে আমার আয় কত?

২৮. স্কিইং

একজন লোক হিসেব কষে দেখল যদি সে ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার স্কি করে যায়, তাহলে একটা জায়গায় সে পেঁছিবে বেলা ১টায়, আর ১৫ কিলোমিটার হিসেবে গেলে সেখানে পেঁছিবে বেলা ১১টায়।

ঐ জায়গাতে বেলা ১২টায় পেঁছিতে হলে সে কত জোরে স্কি করবে?

২৯. দু'জন শ্রমিক

দু'জন শ্রমিক, একজন বুড়ো আর একজন জোয়ান, তারা একই ফ্ল্যাটে থাকে আর কাজও করে একই কারখানায়। কারখানায় পেঁছিতে জোয়ান শ্রমিকের লাগে ২০ মিনিট, বুড়ো পেঁছিয় ৩০ মিনিটে। যদি বুড়ো শ্রমিক পাঁচ মিনিট আগে রওনা হয়, তাহলে জোয়ান শ্রমিক তাকে কখন ধরে ফেলবে?

---

* অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে আমরা এই সংখ্যাটা পেলাম কি করে। আমাদের কি মাথার চুল গুনতে হয়েছে? তা নয়। মানুষের মাথার এক বর্গ সেন্টিমিটার স্থানের চুল গুনলেই যথেষ্ট। এই সংখ্যা এবং চুলে-ঢাকা খুলির পরিমাণ জেনে নিয়ে মোট হিসেবটা বের করা কঠিন নয়। বনজঙ্গলের গাছ গোনার জন্য বৃক্ষগণনাকারীরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন এ ব্যাপারে সেই পদ্ধতিরই প্রয়োগ করা হয়।

৩০. টাইপ করা

দু'জন মেয়েকে একই ঘরে টাইপ করতে দেওয়া হল। এদের ভেতর যে বেশী অভিজ্ঞ সে কাজটা করে দু'ঘণ্টায়, অন্যজনের লাগে তিন ঘণ্টা। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে হলে তাদের কতটা সময় লাগবে?

এ ধরনের সমস্যার সমাধান সাধারণত করা হয় এভাবে: বের করতে হবে এক ঘণ্টায় তারা কাজটার কতখানি অংশ শেষ করে, তারপর দুটোকে যোগ করে, যোগফল দিয়ে ১-কে ভাগ করে নিতে হয়। এ ধাঁধাটাকে কোন নতুনভাবে সমাধান করার উপায় বের করতে পার?

৩১. দাঁতওয়ালা চাকা
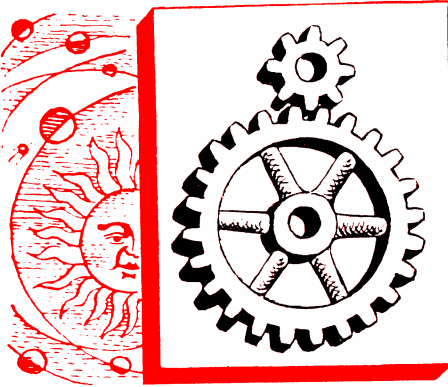
১৯ নং ছবি। কবার ছোট চাকা পাক খাবে?

২৪ দাঁতওয়ালা একটি চাকার সঙ্গে ৮ দাঁতওয়ালা একটা চাকা জুড়ে দেওয়া হল (১৯ নং ছবি)। বড় চাকাটা একবার ঘুরে আসতে ছোট চাকাটাকে নিজের ওপর কবার পাক খেতে হবে?

৩২. বয়স কত?

এক উৎসাহী ধাঁধাবিশারদকে তার বয়স কত প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরটায় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় মেলে:

''এখন থেকে ৩ বছর পর আমার যা বয়স হবে, তাকে ৩ গুণ করে তা থেকে আমার তিন বছর আগের বয়স তিন গুণ করে বিয়োগ করলেই আমার বয়স কত জানতে পারবে।''

তাহলে তার বয়সটা কত?

৩৩. ইভানোভ পরিবার

সেদিন আমার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ''ইভানোভের বয়স কত হে?''

''ইভানোভ? আচ্ছা দেখছি। আঠারো বছর আগে তার বয়স ছিল তার ছেলের বয়সের তিন গুণ। আমার এটা ভালই মনে আছে, কারণ সে বছর লোক-গণনা হয়েছিল।''

''কিন্তু আমি যতদূর জানি, এখন তো তার বয়স ছেলের বয়সের দ্বিগুণ। এটা কি অন্য ছেলে?'' আমার বন্ধু বললে বাধা দিয়ে।

''না, সেই ছেলেই, ওর একটাই ছেলে। আর তাই ওদের বয়স বের করা কঠিন নয়।''

আচ্ছা পাঠক, বল তো ওদের বয়স?

৩৪. কেনাকাটা

এক রুবলের নোট আর খুচরো ২০ কোপেকের মুদ্রাগুলো মিলিয়ে প্রায় ১৫ রুবল নিয়ে আমি বাজারে গেলাম। যখন ফিরলাম তখন আগে আমার কাছে যে কয়টা রুবলের নোট ছিল ততটা ২০ কোপেকের মুদ্রা আছে। আর নোট আছে যতটা ২০ কোপেকের মুদ্রা ছিল ততটা। বাজারে যত টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম ফিরলাম তার তিনভাগের একভাগ নিয়ে।

আমি কত টাকা খরচ করেছিলাম?

২৪—৩৪ নম্বর ধাঁধার উত্তর

২৪. খোকার মা অর্ধেকটা দড়ি নিয়ে নেবার পর থাকল ১/২। ভাই তার অর্ধেকটা নিয়ে নিলে থাকল ১/৪, বাবা নিলে বাকি রইল ১/৮ আর বোন ভাগ নেবার পর থাকল ১/৮ × ৩/৫ = ৩/৪০। যদি ৩০ সেন্টিমিটার = ৩/৪০ হয় তাহলে সবচেয়ে প্রথমে সুতোটা ছিল ৩০ : ৩/৪০ = ৪০০ সেন্টিমিটার বা ৪ মিটারের সমান।

২৫. তিনটে মোজা নিলেই যথেষ্ট হবে, কারণ তাহলে দুটো মোজার রং সবসময়েই সমান হবে। দস্তানার বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা তত সোজা হবে না, কারণ তাদের রংই শুধু আলাদা নয়, তাদের অর্ধেক হল ডান হাতের

আর বাকিটা বাঁ হাতের। এ ব্যাপারে অন্তত ২১টা দস্তানা তুলতে হবে। এর চেয়ে কম, ধরা যাক যদি ২০টা নেওয়া যায় তাহলে তার সব কটাই হয়ত হবে বাঁ হাতের (১০টা বাদামী আর ১০টা কালো)।

২৬. সেই চুলই সবশেষে উঠবে যার বয়স সবচাইতে কম। তার মানে আজ যার বয়স একদিন মাত্র।

শেষ চুলটা উঠতে কতদিন লাগবে তা হিসেব করা যাক। একজন মানুষের মাথার ১,৫০,০০০ চুলের ভেতর ৩০০০ চুল উঠে যায় প্রথম মাসে; প্রথম দু'মাসে ওঠে ৬০০০, আর প্রথম বছরে ওঠে ৩০০০ × ১২ = ৩৬,০০০। সেই হিসেবে শেষ চুল উঠে যেতে লাগবে চার বছরের একটু বেশী। এভাবেই মানুষের চুলের গড়পড়তা আয়ু হিসেব করেছি আমরা।

২৭. অনেকেই তো একটুও না ভেবে বলে বসবে ১০০। ওটা ভুল, কারণ তাহলে মূল মাইনে ওভারটাইমের চেয়ে ৭০ রুবল বেশী হয়, ১০০ রুবল নয়।

ধাঁধাটার সমাধান করতে হবে এভাবে: আমরা জানি যে উপরি খাটুনির আয়ের সঙ্গে ১০০ রুবল যোগ দিলে মূল মাইনেটা পাওয়া যাবে। তাহলে ১৩০-র সঙ্গে ১০০ রুবল যোগ দিলে পাওয়া যাবে দুটো মূল বেতন। কিন্তু ১৩০ + ১০০ = ২৩০, অর্থাৎ দুটো মূল বেতন হল ২৩০ রুবলের সমান। তাহলে উপরি খাটুনির আয় বাদে আমার বেতন হল ১১৫ রুবল আর উপরি আয় ১৫ রুবল।

উত্তরটা মিলিয়ে দেখা যাক: ১১৫ − ১৫ = ১০০। আর ধাঁধাটাতেও তো তাই আছে।

২৮. দুটি কারণে এই ধাঁধাটা খুবই মজার। প্রথমটা হল, এমন মনে হতে পারে যে আমরা যে গতিটা বের করতে চাই তা ১০ আর ১৫ কিলোমিটারের গড় বের করলেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ ঘণ্টায় ১২·৫ কিলোমিটার। এটা যে ভুল, তা বুঝতে পারা মোটেই কঠিন নয় কিন্তু। আসলে যদি ক কিলোমিটার দূরত্ব স্কি করে যেতে হয়, তাহলে ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার করে গেলে ক/১৫ ঘণ্টা দরকার হবে। ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার করে স্কি দৌড়ালে লাগবে ক/১০ ঘণ্টা আর ১২·৫ কিলোমিটার বেগে স্কি করলে ক/১২·৫ বা ২ক/২৫ ঘণ্টা। তাহলে সমীকরণ দাঁড়াচ্ছে:

$$২ক/১৫ − ক/১৫ = ক/১০ − ২ক/২৫,$$

কারণ এদের প্রত্যেকটাই ১ ঘণ্টার সমান। সবকটাকে ক দিয়ে ভাগ করলে দাঁড়াচ্ছে:

$$২/২৫ - ১/১৫ = ১/১০ - ২/২৫$$

অথবা অনুপাতটা দাঁড়াচ্ছে:

$$৪/২৫ = ১/১৫ + ১/১০$$

এই **সমীকরণটা** কিন্তু ভুল, কারণ ১/১৫ + ১/১০ = ১/৬, অর্থাৎ ৪/২৪, ৪/২৫ নয়।

অন্য যে কারণে এ ধাঁধাটা খুব মজার তা হল সমীকরণ না করেও মুখে মুখেই করে ফেলা যায় এটা।

কি করে তা হয় বলছি: যদি লোকটি ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার করে স্কি দৌড়ত আর পথে আরও দু'ঘণ্টা বেশী স্কি করত (অর্থাৎ ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার বেগে স্কি করলে যতটা হয় ততটা), তাহলে সে বাড়তি আরও ৩০ কিলোমিটার স্কি করত। আর আমরা জানি ১ ঘণ্টায় তার বাড়তি স্কি দৌড় ৫ কিলোমিটার। তাহলে মোট দৌড়ের সময়টা হবে ৩০ : ৫ = ৬ ঘণ্টা। এ থেকেই বের হচ্ছে যে ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার করে স্কি দৌড়লে তার ৬ − ২ = ৪ ঘণ্টা লাগবে। এখন তো মোট দূরত্বটা বের করা কিছুই কঠিন নয়: ১৫ × ৪ = ৬০ কিলোমিটার।

তাহলে দুপুর ১২টায়, অর্থাৎ ৫ ঘণ্টায় ঐ জায়গায় পৌঁছতে তাকে কত জোরে স্কি করতে হবে তা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

৬০ : ৫ = ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটার।

এই উত্তরটা যাচাই করে দেখা মোটেই কঠিন নয়।

২৯. সমীকরণ না করেও এই ধাঁধাটাকে বহুভাবে সমাধান করা যায়।

প্রথম উপায়টা দেখাচ্ছি। জোয়ান শ্রমিক পাঁচ মিনিটে সমস্তটা রাস্তার ১/৪ এগিয়ে আসছে, আর বুড়ো শ্রমিক আসছে ১/৬, অর্থাৎ জোয়ান শ্রমিকের থেকে ১/৪ − ১/৬ = ১/১২ কম।

এখন বুড়ো শ্রমিক জোয়ান শ্রমিকের থেকে ১/৬ পথ এগিয়ে ছিল। সুতরাং জোয়ান শ্রমিক ১/৬ : ১/১২ = ২ বার পাঁচ মিনিট করে হাঁটাবার

পর বুড়ো শ্রমিককে ধরে ফেলবে। অর্থাৎ ১০ মিনিট পর তাদের দেখা হবে।

অন্য উপায়টা আরও সহজ। কারখানায় যেতে জোয়ান শ্রমিকের থেকে বুড়ো শ্রমিকের ১০ মিনিট বেশী লাগে। সুতরাং বুড়ো শ্রমিক যদি ১০ মিনিট আগে বাড়ি থেকে রওনা হয় তাহলে তারা কারখানায় পেঁছিয় একই সঙ্গে। যদি মাত্র ৫ মিনিট আগে রওনা হয় তাহলে জোয়ান শ্রমিক অর্ধেক রাস্তাতেই তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। তার মানেই তাদের ১০ মিনিট পর দেখা হবে (কারণ সারা পথ যেতে তার লাগছে ২০ মিনিট)।

এছাড়াও অঙ্কের সাহায্যে অন্যভাবেও সমাধান করা যায় এটাকে।

৩০. এই ধাঁধাটাকে সমাধান করার একটা নতুন উপায় বলছি। একই সময়ে শেষ করবে বলে টাইপিস্টরা কাজটা কিভাবে ভাগ করে নেবে সেটা বের করা যাক। (এটা তো পরিষ্কার যে একমাত্র এই উপায়েই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কাজটাকে শেষ করে ফেলা যাবে, অবশ্য যদি মাঝখানে তারা আলসেমি করে সময় নষ্ট না করে।) এখন অভিজ্ঞ টাইপিস্ট অন্যজনের চেয়ে ১·৫ গুণ তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে, সুতরাং এটাও পরিষ্কার যে তার ভাগে ১·৫ গুণ বেশী কাজ পড়বে। তাহলেই দু'জনের কাজ একইসঙ্গে শেষ হবে। সুতরাং প্রথম জন নেবে কাজটার ৩/৫ আর দ্বিতীয় জন — ২/৫।

সাধারণভাবে, এতেই ধাঁধাটার সমাধান হল। এখন প্রথম টাইপিস্টের তার ভাগের কাজটা করতে, অর্থাৎ ৩/৫ করতে কত সময় লাগবে সেটা বের করতে হবে। আমরা জানি যে সমস্তটা কাজ করতে তার লাগে ২ ঘণ্টা, তাহলে ৩/৫ করতে সময় লাগবে ২ × ৩/৫ = ১·২ ঘণ্টা। অন্য টাইপিস্টকেও এই সময়ের ভেতরই তার কাজ শেষ করতে হবে।

তাহলে সবচেয়ে কম সময় ১ ঘণ্টা ১২ মিনিটেই দু'জনে কাজটা শেষ করে ফেলতে পারবে।

৩১. তোমরা যদি মনে করে থাক যে ছোট চাকাটা তিনবার ঘুরবে, তাহলে খুবই ভুল করেছ। ওটা ঘুরবে চারবার।

কেন এমন হল তা দেখতে চাও? একটুকরো কাগজ নাও আর তার ওপরে দুটো সমান মাপের মুদ্রা রাখ, দুটো ২০ কোপেক মুদ্রা হলেই চলবে (২০ নং ছবি)। এখন নীচের মুদ্রাটা শক্ত করে চেপে ধরে ওপরের মুদ্রাটাকে চারপাশে ঘোরাও। এবার একটা মজার ব্যাপার দেখতে পাবে। উপরের মুদ্রাটা অন্য মুদ্রাটার নীচে এসে পেঁছিতে পেঁছিতে নিজেও পুরো
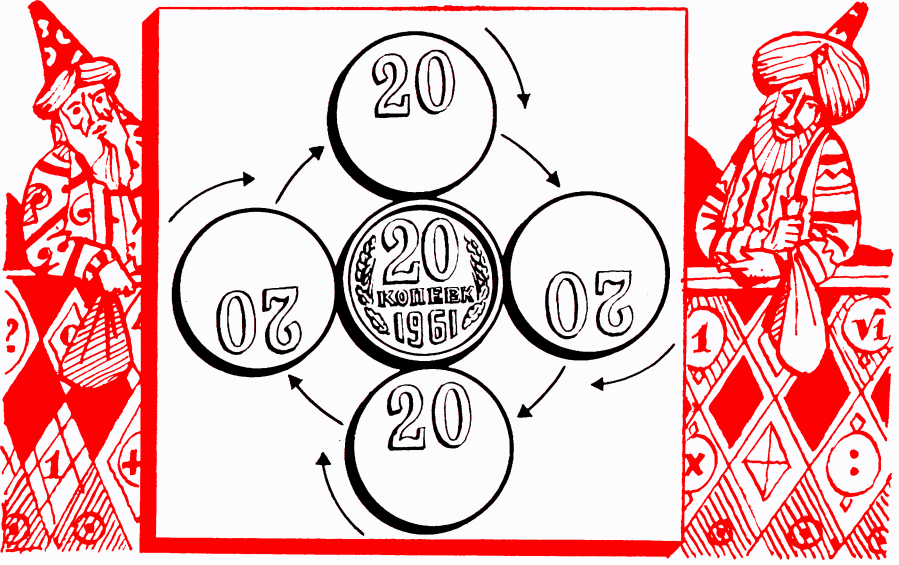
২০ নং ছবি

একবার পাক খেয়ে আসবে। মুদ্রার উপরের ছাপটা কিভাবে থাকছে তা দেখলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। আবার নীচের মুদ্রাটার (যেটা আমরা নাড়াব না) চারপাশে এটা যখন সম্পূর্ণ ঘুরে আসবে, তখন নিজে ঘুরবে দু'বার।

সাধারণভাবে বলা যায় কোন জিনিস বৃত্তাকার পথে ঘুরে এলে, আমাদের গুনতিতে যা হবে তার চেয়েও একবার বেশী সে নিজে ঘুরে আসে। সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করবার সময় যদি পৃথিবীর নিজের আবর্তনকে সূর্যের দিক থেকে না দেখে অন্য কোন তারার দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে ৩৬৫ ১/৪ দিনের বদলে পৃথিবীর আবর্তন হচ্ছে ৩৬৬ ১/৪ দিন। উপরের ব্যাপারটা থেকেই এই জিনিসটার সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে। তাহলেই বুঝতে পারছ নাক্ষত্রিক দিন থেকে সৌরদিন বড় হয় কেন?

৩২. পাটিগণিতের সাহায্যে এর সমাধান করা একটা জটিল ব্যাপার, কিন্তু বীজগণিতের সাহায্য নিলে তা খুবই সোজা হয়ে যায়। ধরা যাক ব বছর বর্তমান বয়স। তাহলে তিন বছর পরে বয়স হবে ব + ৩, আর তিন বছর আগে বয়স হবে ব − ৩, তাহলে আমাদের সমীকরণটা দাঁড়াচ্ছে

$$৩(ব + ৩) - ৩(ব - ৩) = ব।$$

এটাকে সমাধান করলে দাঁড়াচ্ছে ব = ১৮। ধাঁধা-বিশারদের বয়স ছিল ১৮ বছর।

এটাকে যাচাই করে দেখা যাক: তিন বছর পরে তার বয়স হবে ২১; তিন বছর আগে ছিল ১৫।

তফাতটা হল

$$(৩ \times ২১) - (৩ \times ১৫) = ৬৩ - ৪৫ = ১৮$$

৩৩. আগের ধাঁধাটার মতো এটাও সরল সমীকরণের সাহায্যে সমাধান করা চলবে। ছেলের বয়স যদি হয় ব বছর, তাহলে বাবার বয়স হল ২ব বছর। ১৮ বছর আগে তাদের দু'জনের বয়সই ছিল ১৮ বছর কম: বাবার বয়স ছিল ২ব − ১৮ আর ছেলের বয়স ছিল ব − ১৮। আমরা জানি যে ঐ সময় বাবার বয়স ছিল ছেলের বয়সের তিন গুণ

$$৩(ব - ১৮) = ২ব - ১৮$$

সমীকরণটা সমাধান করলে আমরা পাচ্ছি যে ব ৩৬-এর সমান। ছেলের বয়স ৩৬ আর বাবার বয়স ৭২।

৩৪. ধরে নেওয়া যাক যে প্রথমে আমার ছিল ক সংখ্যার রুবল আর খ সংখ্যার ২০ কোপেক। বাজারে যাবার সময় আমার ছিল (১০০ক + ২০খ) কোপেক। যখন ফিরলাম তখন ছিল মাত্র (১০০খ + ২০ক) কোপেক।

আমরা জানি যে এই পরের অঙ্কটা প্রথম অঙ্কটার তিন ভাগের এক ভাগ। তাহলে

$$৩(১০০খ + ২০ক) = ১০০ক + ২০খ$$

এটাকে সমাধান করলে আমরা পাই

$$ক = ৭খ$$

এখন খ যদি ১ হয়, তাহলে ক = ৭। এই রকম ধরে নিলে বাজারে যাবার সময় আমার ছিল ৭·২০ রুবল। কিন্তু এটা ভুল, কারণ ধাঁধাতেই বলে দেওয়া আছে আমার কাছে ১৫ রুবল মতন ছিল।

যদি খ=২ হয়, তাহলে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। তাহলে ক=১৪ হয়। তাহলে একেবারে প্রথমে আমার হাতে ছিল ১৪·৪০ রুবল, ধাঁধার শর্তগুলির সঙ্গে বেশ মিলে যায় এটা।

যদি খ=৩ ধরি, তাহলে টাকাটা খুবই বেশী হয়ে যায়, ২১·৬০ রুবল।

তাহলে একমাত্র উপযুক্ত উত্তর হল ১৪·৪০ রুবল। বাজার শেষ করার পর আমার কাছে ছিল ১ রুবলের দুটো আর ২০ কোপেকের ১৪টা মুদ্রা, অর্থাৎ ২০০+২৮০=৪৮০ কোপেক। এটা কিন্তু প্রথম যে টাকাটা ছিল তার ঠিক তিন ভাগের একভাগ (১৪৪০ : ৩=৪৮০)। তাহলে কেনাকাটা করতে আমার খরচ হয়েছিল ১৪·৪০−৪·৮০=৯·৬০ রুবল।

৪

গুনতি

৩৫. তুমি গুনতে জান?

তিন বছরের বেশী বয়সের কাউকে যদি কথাটা জিজ্ঞেস কর তাহলে সম্ভবত সে অপমান বোধ করবে। সত্যিই তো ১, ২, ৩, ৪ গুনে যেতে তো আর কোনো দক্ষতার দরকার নেই। তবু একথা সত্যি যে কখনো কখনো এই গোনাগুনতির ব্যাপারটাই খুব গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়। তাই না? আসলে জিনিসটার সবটাই নির্ভর করে কী গুনছে তার ওপর। উদাহরণ দেওয়া যাক: একটা বাক্সের ভেতরের পেরেকগুলো গুনে ফেলা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু ধরা যাক বাক্সটায় পেরেক ছাড়াও কতকগুলি স্ক্রু আছে, আর কোনটা কতটা করে আছে তোমাকে তাই গুনতে বলা হয়েছে। এখন তাহলে কী করবে তুমি? স্ক্রু থেকে পেরেকগুলোকে আলাদা করে তারপর গুনবে?

মেয়েদের কিন্তু এই কাজটাই করতে হয় কাপড়-চোপড় ধোপাবাড়ি পাঠাবার সময়। তাদের প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাগ করে জামা, তোয়ালে, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি বেছে নিতে হয়। এই একঘেয়ে কাজটা সারবার পরে তারা গুনতে শুরু করে।

তুমি যদি এভাবে গুনতি কর, তাহলে গুনবার নিয়মটা জান না তুমি। এই নিয়মটায় অসুবিধে হয়, একঘেয়ে লাগে, কখনো কখনো অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদি পেরেক বা স্ক্রু অথবা কাপড়-চোপড় গুনতে হয় তাহলে অবশ্য নিয়মটা মোটামুটি খারাপ নয়। কিন্তু ধর তুমি একজন বনরক্ষক, তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে প্রতি হেক্টর জমিতে কতগুলি পাইন, ফার, বার্চ বা অ্যাসপেন গাছ আছে। এখানে কিন্তু গাছ হিসেবে ভাগ করে ফেলা সম্ভব নয়। তুমি কী করবে? পাইন, বার্চ, ফার বা অ্যাসপেন আলাদা আলাদা করে গুনবে? যদি তা কর, তাহলে জঙ্গলটাকে তোমাকে চারবার ঘুরে আসতে হবে।

একবার ঘুরেই গুনতি করে ফেলার একটা সহজ উপায় আছে, বনরক্ষকরা তাই ব্যবহার করে। পেরেক আর স্ক্রু দিয়ে এটা কি করে করা যায় তা তোমাদের দেখাচ্ছি।

একটা বাক্সের ভেতরের পেরেক আর স্ক্রুগুলো ভাগ না করে গুনতে হলে তোমার সবচেয়ে প্রথমে দরকার হবে একটা পেন্সিল, আর নিচের মতো ছককাটা একটা কাগজ।

এরপর গুনতি শুরু করে দাও। বাক্স থেকে একটা কিছু উঠাও, যদি এটা পেরেক হয়, তাহলে পেরেকের সারিতে একটা দাগ দাও। স্ক্রুর বেলাতেও তাই কর। এভাবে বাক্স খালি হওয়া পর্যন্ত দাগ মেরে যাও। পেরেকের সারিতে তুমি যে কয়টা দাগ পাবে সেই কয়টা পেরেকই তোমার বাক্সে ছিল। স্ক্রুর বেলাতেও একই কথা। এরপর, তোমাকে যা করতে হবে তা হল শুধু যোগটা করে ফেলা।

এই দাগগুলো যোগ করার কাজটা আরও তাড়াতাড়ি আর সহজে করা যায়, যদি পাঁচটা করে দাগ একসঙ্গে দিয়ে ছোট চৌখুপীর মতো করে সাজাও (২১ নং ছবি)।

এ ধরনের চৌখুপীগুলি জোড়ায় জোড়ায় সাজালে সবচেয়ে সুবিধের হয়। অর্থাৎ প্রথম ১০টা দাগের পর ১১ নম্বরের দাগটা নতুন আর এক
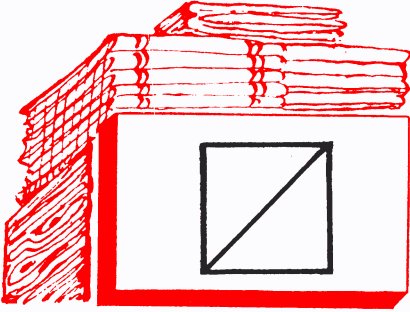
২১ নং ছবি। দাগ পাঁচটা হওয়া চাই।
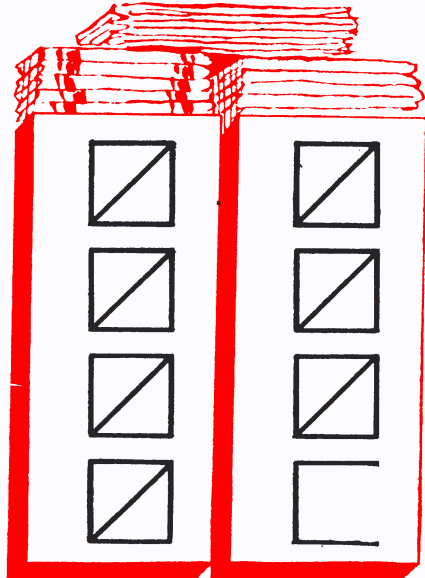
২২ নং ছবি। গুনতির ফলাফল এমনভাবে সাজাতে হবে।
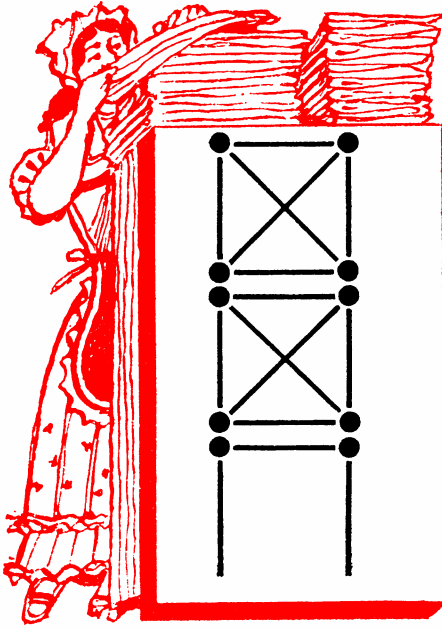
২৩ নং ছবি। প্রত্যেকটি বর্গক্ষেত্র ১০-এর প্রতীক।

সারিতে বসাও। দ্বিতীয় সারিতে দুটো চৌখুপী হয়ে গেলে তৃতীয়টা শুরু কর। এইভাবে চলবে। তাহলেই তোমার দাগগুলো ২২ নং ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে তেমন হবে।

এগুলোকে গুনতি করা খুবই সোজা। কারণ স্পষ্টই দেখতে পাবে প্রত্যেকটাতে ১০টা করে দাগ মিলিয়ে তিনটে সারি রয়েছে। তাছাড়া আছে ৫ দাগের একটা চৌখুপী আর তিন দাগের একটা অসমাপ্ত ঘর, অর্থাৎ ৩০ + ৫ + ৩ = ৩৮।

অন্য ধরনের ঘরও ব্যবহার করতে পার। একটা পুরো চৌখুপীকে অনেক সময় ১০ বলে ধরা হয় (২৩ নং ছবি)।

ভিন্ন ভিন্ন জাতের গাছ গুনতি করতে হলেও একই নিয়ম চলবে। এক্ষেত্রে কেবল দুই সারির বদলে তোমাকে চার সারি গুনতে হবে। এছাড়া পাশাপাশি সারি বসালে আরও সুবিধে হবে, যেমন ২৪ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

এরপর প্রতি সারিতে মোট কতটা হল, তা বের করা খুবই সোজা (২৫ নং ছবি):

পাইন	৫৩	বার্চ	৪৬
ফার	৭৯	অ্যাসপেন	৩৭

ডাক্তারী কাজে রক্তের ফোঁটার শ্বেত ও লোহিত কণিকা গোনবার সময়েও এই নিয়ম মানা হয়।

এইভাবে ধোপাবাড়ির কাপড়-চোপড় ভাগ করলে মেয়েরা তাঁদের প্রচুর সময় আর মেহনত বাঁচাতে পারবেন।

তাহলে, সবচেয়ে ভাল উপায়ে কিভাবে জমির গাছ গুনে ফেলা যায় তা শিখলে তোমরা। একটা ছক আঁক, প্রত্যেক আলাদা সারিতে আলাদা আলাদা গাছের নাম লেখ। যদি অন্য কোন গাছ পাও তার জন্য কয়েকটা সারি আলাদা করে রাখ। তারপর গুনতে শুরু কর (২৬ নং ছবি)।
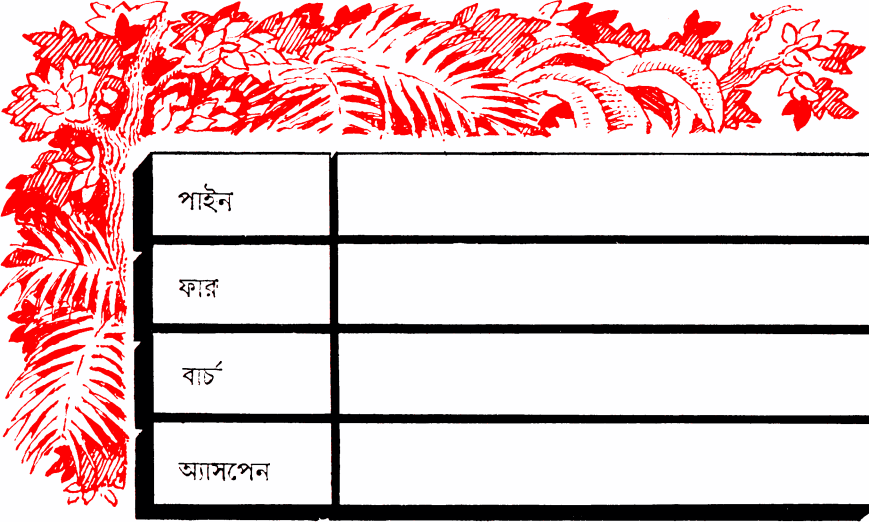
২৪ নং ছবি। বনে গাছ গুনতির ফর্ম।
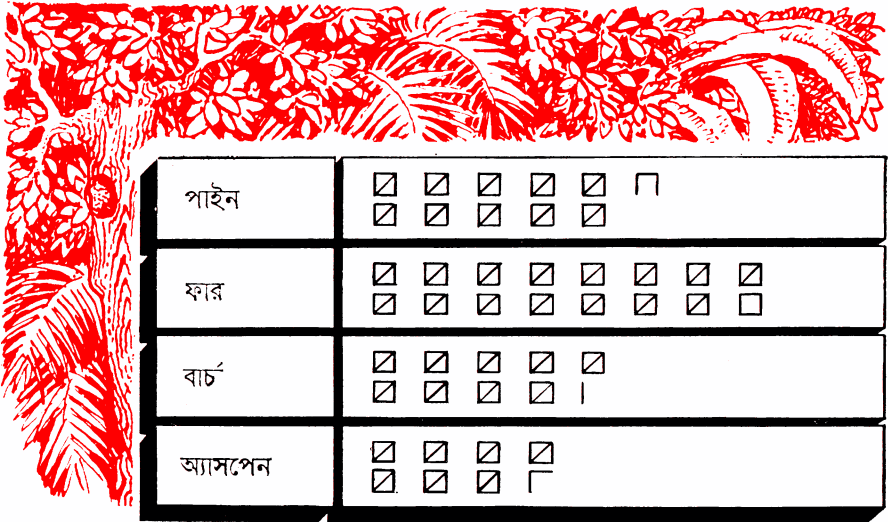
২৫ নং ছবি। গুনতির পর ফর্মের চেহারা।
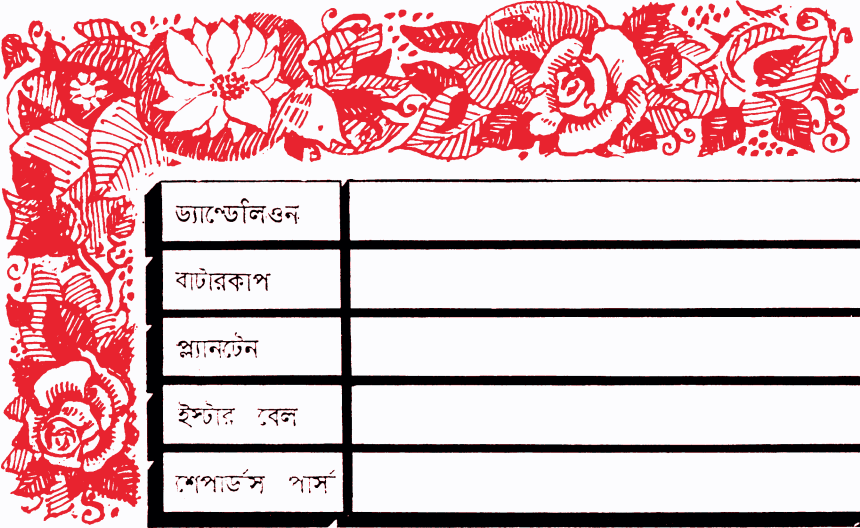
২৬ নং ছবি। গাছ গন্নতির নমন্না।

৩৬. বনের গাছ গন্নব কেন?

সত্যিই তো, কেন? যারা শহরে থাকে তারা কাজটাকে অপ্রয়োজনীয় বলে ভাবে। লেভ তলস্তোয়ের 'আন্না কারেনিনা'তে অব্‌লোন্‌স্কি একটা বন বেচে ফেলার সময় কৃষিকাজ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ লেভিন নামে তার এক আত্মীয় তাকে জিজ্ঞেস করেছিল:

''গাছগন্নলো গন্নেছেন?''

অব্‌লোন্‌স্কি অবাক হয়ে বলল, ''গাছগন্নলো গন্নব? বেড়ে বলেছ। সমন্দ্রপারের বালি বা তারার ছ'টা গন্নতে বসব নাকি! খন্ব প্রতিভাবান লোকেরা অবশ্য...'' লেভিন তাকে বাধা দিয়ে বলল, ''কিন্তু রিয়াবিনিনের মতো (ব্যবসাদার) বিরাট প্রতিভা তা পেরেছিল। তাছাড়া কোনো চাষীই গন্নতি না করে জিনিস কেনে না।''

কতখানি (ঘন মিটার) কাঠ আছে তা জানবার জন্য বনের গাছ গোনা হয়। সব গাছ গোনা হয় না, শন্ধন্ একটা অংশে, মনে কর ০·২৫ বা ০·৫ হেক্টর জমিতে গোনা হয়। একটু যত্ন নিয়ে এমন জায়গা বেছে নেওয়া হয় যেখানে গাছগন্নলো মাঝারি রকমের ঘন হয়ে গজিয়েছে আর গাছের

উচ্চতাও প্রায় মাঝামাঝি রকম আছে। এজন্য অবশ্য চোখটা অভিজ্ঞ হওয়া দরকার। প্রত্যেকটা জাতের মোট কটা করে গাছ আছে তা জানলেই যথেষ্ট হবে না। গাছগুলোর গুঁড়ি কতটা মোটা তাও জানতে হবে, অর্থাৎ কতগুলো ২৫ সে.মি মোটা, কতগুলো ৩০, ৩৫ সে.মি বা বেশী মোটা। সহজ করে আমরা যে চার সারির ছকটা দেখিয়েছি, সম্ভবত এক্ষেত্রের ছকটায় তার চেয়ে বেশী সারি হবে। এই নিয়ম ছাড়া সাধারণভাবে গুনতে গেলে বনের ভেতর আমাদের কতবার ঘোরাঘুরি করতে হবে তা তো বুঝতেই পারছ।

তাহলে দেখছ, একই জিনিস গুনতে হলে ব্যাপারটা কত সহজ এবং সরল। কিন্তু বিভিন্ন জিনিস গুনতে হলে যে নিয়মটা এইমাত্র দেখানো হল তাই ব্যবহার করতে হবে। এরকম একটা নিয়ম যে আছে অনেকের তাই জানা নেই।

ঠকানো সংখ্যা

৩৭. পাঁচ রুবলের বদলে একশো রুবল

একবার এক যাদুকর দর্শকদের এই লোভনীয় প্রস্তাবটা দিয়েছিল:

''৫০ কোপেক, ২০ কোপেক আর ৫ কোপেক মিলিয়ে মোট ২০টি মুদ্রায় কেউ যদি আমাকে ৫ রুবল দিতে পারেন তাহলে আমি তাঁকে ১০০ রুবল দেব। পাঁচ রুবলে একশো রুবল! নেবেন নাকি কেউ?''

সারাটা প্রেক্ষাঘর নিস্তব্ধ।

কেউ কেউ কাগজ পেন্সিল বাগিয়ে ধরে এমন একটা সুযোগ নেবার জন্য হিসেব কষতে শুরু করেছে। যাদুকরকে বিশ্বাস করে তার প্রস্তাবটা মেনে নিতে কেউ-ই রাজী নয়।

যাদুকর বলে চলল, ''১০০ রুবলের জন্য ৫ রুবলকে আপনারা খুব বেশী বলে মনে করছেন দেখছি। আচ্ছা বেশ, ২০টি মুদ্রায় ৩ রুবল নিতে রাজী আছি আমি, তার বদলে দেব ১০০ রুবল। যাঁরা নেবেন লাইন করে দাঁড়ান!''

কেউ-ই লাইনে দাঁড়াতে এল না। সহজে টাকা উপায়ের এই সুযোগটা নিতে কেউ-ই ব্যস্ততা দেখাল না।

''কী ব্যাপার! ৩ রুবলও খুব বেশী মনে হচ্ছে আপনাদের? আচ্ছা, আচ্ছা, আরও এক রুবল কমিয়ে দিচ্ছি আমি, ২০টা মুদ্রায় ২ রুবল দিন আপনারা। এবার হল তো?''

তবু কেউ সুযোগটা নিতে এলেন না। যাদুকর বলে চলল:

''খুচরো মুদ্রাগুলি নেই বোধহয় আপনাদের কাছে? আচ্ছা বেশ, আমি বিশ্বাস করছি আপনাদের, কোন মুদ্রা কতটা করে দেবেন সেইটা শুধু লিখে দিন আমাকে। আমার দিক থেকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যে এসব মুদ্রার একটি তালিকা আমাকে দেবেন তাঁদের প্রত্যেককে আমি ১০০ রুবল দেব!''

৩৮. এক হাজার

একই অঙ্ক আট বার ব্যবহার করে ১০০০ লিখতে পার?

অঙ্কগুলো ছাড়াও অঙ্কের বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করতে পার।

৩৯. চব্বিশ

৮ অঙ্কটাকে তিনবার ব্যবহার করে ২৪ লেখা খুবই সহজ: ৮+৮+৮। অন্য কোন একই অঙ্ককে তিনবার ব্যবহার করে এইরকম ২৪ লিখতে পার? এ ধাঁধাটার একাধিক উত্তর হয়।

৪০. তিরিশ

৫-কে তিনবার ব্যবহার করে সহজেই ৩০ লেখা চলে: ৫×৫+৫। অন্য কোনও অঙ্ককে তিনবার ব্যবহার করে ৩০ লেখা একটু কঠিন।

চেষ্টা করে দেখ না! অনেকগুলো উত্তর হতে পারে এর।

৪১. লুপ্ত সংখ্যা বের করা

নীচের এই গুণনটায় অর্ধেকেরও বেশী অঙ্কের জায়গায় * বসানো আছে।

```
      *১*
    × ৩*২
    -----
      *৩*
    ৩*২*
   *২*৫
   ------
   ১*৮*৩০
```

অঙ্কগুলো বের করতে পার?

৪২. সংখ্যাগুলো কি বল তো?

ঐ একই ধরনের আর একটা ধাঁধা দেওয়া হল।

তোমাদের এই হারানো অঙ্কগুলো খুঁজে বের করতে হবে।

```
      **৫
    × ১**
    -----
     ২**৫
    ১৩*০
    ***
   ------
   ৪*৭৭*
```

৪৩. ভাগ

নীচের ধাঁধাটার হারানো অঙ্কগুলো বের কর তো:

```
৩২৫) *২*৫* (১**
     ***
     ----
     *০**
     *৯**
     -----
       *৫*
       *৫*
       ---
```

৪৪. ১১ দিয়ে ভাগ

কোন অঙ্ককে দু'বার ব্যবহার না করে নয়টা অঙ্ক দিয়ে এমন কয়েকটা সংখ্যা লেখ যাদের ১১ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়।

এদের ভেতর প্রথমে লেখ সবচেয়ে বড়টা, তারপর সবচেয়ে ছোটটা।

৪৫. মজার গুণন

নীচের উদাহরণটা ভাল করে দেখ:

$$৪৮ \times ১৫৯ = ৭৬৩২$$

এর ভেতরে মজার ব্যাপার হল নয়টা অঙ্কই একেবারে আলাদা।

এইরকম আরও কয়েকটা উদাহরণ দিতে পার? এরকম অঙ্ক সত্যিই যদি থাকে তাহলে মোট কটা আছে বল তো?

৪৬. সংখ্যার ত্রিভুজ

২৭ নং ছবির ত্রিভুজের বৃত্তগুলির ভেতর এমনভাবে নয়টা অঙ্ক লেখ যাতে প্রতি বাহুর যোগফল হয় ২০। একই অঙ্ক দু'বার বসানো চলবে না।

৪৭. আরও একটা সাংখ্যিক ত্রিভুজ

ঐ একই ত্রিভুজের (২৭ নং ছবি) বৃত্তে কোন অঙ্ককে দু'বার ব্যবহার না করে নয়টা অঙ্ক লেখ। এবার কিন্তু যোগফল হওয়া চাই ১৭।
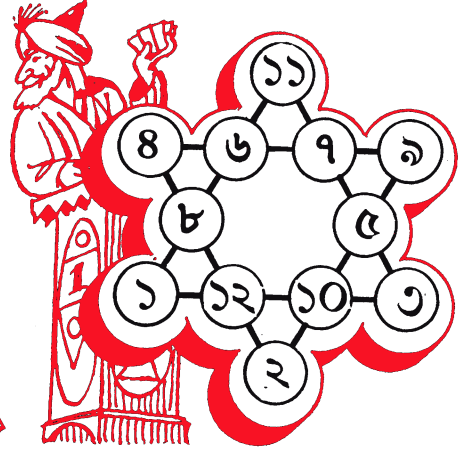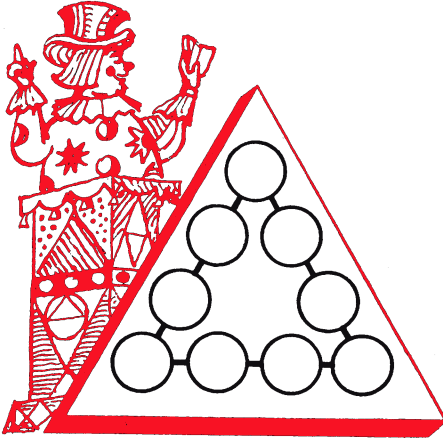
২৭ নং ছবি। বৃত্তগুলিতে নয়টি অঙ্ক বসাও। ২৮ নং ছবি। ছয়কোনা সাংখ্যিক তারা।

৪৮. যাদু-তারা

ছয়-মাথাওয়ালা তারাটা (২৮ নং ছবি) খুব মজার, প্রত্যেক সারির যোগফল সমান:

৪+৬+ ৭+৯=২৬ ১১+ ৬+ ৮+১=২৬
৪+৮+১২+২=২৬ ১১+ ৭+ ৫+৩=২৬
৯+৫+১০+২=২৬ ১+১২+১০+৩=২৬

অবশ্য মাথাগুলোর যোগসংখ্যা অন্যরকম:

৪+১১+৯+৩+২+১=৩০

সংখ্যাগুলো এমনভাবে সাজাতে পার যাতে এই গলদটা দূর হয়ে প্রত্যেক সারির আর মাথায় যোগফল হয় ২৬?

৩৭—৪৮ নম্বর ধাঁধার উত্তর

৩৭. তিনটে ধাঁধারই কোনো সমাধান নেই। এদের সমাধানের জন্য যাদুকর এবং আমি যেকোন পুরস্কার ঘোষণা করতে পারি। এটা প্রমাণ করার জন্য বীজগণিতের সাহায্যে তিনটেকেই বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

পাঁচ রুবলের হিসেব — ধরে নেওয়া যাক এটা সম্ভব আর তার জন্য ৫০ কোপেকের মুদ্রা দরকার ক সংখ্যা, ২০ কোপেকের মুদ্রা দরকার খ সংখ্যা, আর ৫ কোপেক দরকার গ সংখ্যা। তাহলে এই সমীকরণটা পাওয়া গেল:

৫০ক + ২০খ + ৫গ = ৫০০

একে ৫ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে:

১০ক + ৪খ + গ = ১০০

এছাড়াও, এই ধাঁধাটায় আছে যে মুদ্রার মোট সংখ্যা হল ২০। তাহলে আমরা আর একটা সমীকরণ পেলাম:

ক ÷ খ + গ = ২০

প্রথম সমীকরণ থেকে দ্বিতীয়টাকে বিয়োগ করলে পাওয়া যায়:

৯ক + ৩খ = ৮০

একে ৩ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়:

৩ক + খ = ২৬ ২/৩

কিন্তু ৩ক, অর্থাৎ ৫০ কোপেকের মোট মুদ্রার সংখ্যাকে ৩ দিয়ে গুণ করলে তা একটা পূর্ণ সংখ্যা হবে। খ, অর্থাৎ ২০ কোপেকের মুদ্রার সংখ্যাও হবে পূর্ণ সংখ্যা। সুতরাং এই দুটো সংখ্যার যোগফল কোন ভগ্নাংশ হতে পারে না। সুতরাং এই ধাঁধাটা সমাধান করা যাবে এমন মনে করাই বোকামি। এর সমাধান হবে না।

ঐ একইভাবে পাঠকরা বুঝতে পারবে যে 'কম রুবলের হিসেবগুলোও' সমাধানযোগ্য নয়। প্রথম ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ৩ রুবলের হিসেবে) এই সমীকরণটা পাওয়া যায়:

৩ক + খ = ১৩ ১/৩

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (২ রুবলের হিসেবে):

৩ক + খ = ৬ ২/৩

তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, দু'ক্ষেত্রেই ভগ্নাংশ সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে।

সুতরাং এই ধাঁধাগুলির সমাধানের জন্য বিরাট টাকার পুরস্কার ঘোষণা করতে যাদুকরকে কোনো ঝুঁকিই নিতে হয় নি। টাকাটা তো তাকে কখনই দিতে হবে না!

ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম হত, যদি ২০টি মুদ্রায় ৫, ৩ বা ২ রুবলের হিসেব না করে হিসেব করতে হত ৪ রুবলের। ধাঁধাটা তখন সহজেই হয়ে যেত, আর সাতটা বিভিন্ন ধরনে তা করা যেত।*

৩৮. ৮৮৮ + ৮৮ + ৮ + ৮ + ৮ = ১০০০

এর আরও উত্তর হয়।

৩৯. দুটো উত্তর হল:

$$২২ + ২ = ২৪; \quad ৩^{৩} - ৩ = ২৪$$

৪০. তিনটে উত্তর দেওয়া হল:

$$৬ \times ৬ - ৬ = ৩০; \quad ৩^{৩} + ৩ = ৩০; \quad ৩৩ - ৩ = ৩০$$

৪১. নীচের নিয়মে হিসেব করে গেলে আস্তে আস্তে হারানো অংকগুলো বের হয়ে আসবে। সুবিধার জন্য প্রতি সারিকে একটা নম্বর দেওয়া যাক:

```
       *১*  . . . . . . . . . . . . প্রথম
   ×   ৩*২  . . . . . . . . . . . . দ্বিতীয়
      -----
       *৩*  . . . . . . . . . . . . তৃতীয়
     ৩*২*   . . . . . . . . . . . . চতুর্থ
    *২*৫    . . . . . . . . . . . . পঞ্চম
   --------
   ১*৮*৩০   . . . . . . . . . . . . ষষ্ঠ
```

তৃতীয় সারির শেষ সংখ্যা যে ০ হবে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে, কারণ ষষ্ঠ নম্বর লাইনের শেষে রয়েছে ০।

---

* যে যে উত্তর সম্ভব তার মধ্যে একটা দেওয়া হল: ছয়টা ৫০ কোপেকের মুদ্রা, দুটো ২০ কোপেকের মুদ্রা আর ৫ কোপেকের মুদ্রা বারোটা।

এরপর প্রথম সারির শেষ *-এর অংকটা বের করা যাক: এটা এমন একটা অংক যাকে ২ দিয়ে গুণ করলে ডানদিকের অংকটা হয় ০, আর ৩ দিয়ে গুণ করলে ডানদিকের অংকটা হয় ৫ (পঞ্চম সারির শেষ অংক ৫)। এরকম অংক মাত্র একটিই হয় — ৫।

দ্বিতীয় সারির *-এর আড়ালে কোন অংক লুকিয়ে আছে তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। তা হল ৮, কারণ একমাত্র এই অংককেই ১৫ দিয়ে গুণ করলে এমন একটা উত্তর হয় যার ডানদিকে থাকে ২০ (চতুর্থ সারি)।

এরপর পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে চতুর্থ সারির শেষে আছে ০। (তৃতীয় ও ষষ্ঠ সারিগুলির ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অংকগুলো দেখলেই বোঝা যাবে!)

সবশেষে প্রথম সারির প্রথম * যে ৪ তা পরিষ্কার হয়ে যাবে, কারণ একমাত্র ৪-কে ৮ দিয়ে গুণ করলেই এমন সংখ্যা পাওয়া যায় যার প্রথমে থাকে ৩ (চতুর্থ সারি)।

এরপর বাকি অজানা অংকগুলোকে বের করতে কোন মুস্কিল নেই: যে দুটো উৎপাদক আমরা বের করেছি তাকে গুণ করলেই যথেষ্ট হবে।

সবশেষে গুণনের অংকটা দাঁড়াল এই:

```
×    ৪১৫
     ৩৮২
    ─────
     ৮৩০
   ৩৩২০
  ১২৪৫
  ───────
  ১৫৮৫৩০
```

৪২. এ ধাঁধাটাও একই উপায়ে সমাধানযোগ্য।

উত্তরটা দাঁড়াবে:

```
×    ৩২৫
     ১৪৭
    ─────
    ২২৭৫
   ১৩০০
  ৩২৫
  ───────
  ৪৭৭৭৫
```

৪৩. সবগুলো সংখ্যা উদ্ধার করলে ধাঁধার অংকটা দাঁড়ায়:

```
৩২৫) ৫২৬৫০ (১৬২
    _ ৩২৫
      ————
    _ ২০১৫
      ১৯৫০
      —————
      _ ৬৫০
        ৬৫০
```

৪৪. এই ধাঁধাটার **সমাধান** করতে হলে ১১ দিয়ে বিভাজ্য **এমন সংখ্যার** নিয়মকানুন জানতে হবে। কোন সংখ্যার ডান দিক থেকে গুনে জোড় ক্ষেত্রের সংখ্যাগুলির যোগফল আর বিজোড় ক্ষেত্রের সংখ্যাগুলির যোগফল দুটোকে বিয়োগ করলে যদি উত্তরটা ০ হয় অথবা ১১ দিয়ে ভাগ দিলে মিলে যায় তাহলে সেই সংখ্যাটা ১১ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে। একটা উদাহরণ দেখা যাক — ২,৩৬, ৫৮,৯০৪।

জোড় ক্ষেত্রের সংখ্যার যোগফল:

$$৩ + ৫ + ৯ + ৪ = ২১$$

আবার বিজোড় ক্ষেত্রের সংখ্যার যোগফল:

$$২ + ৬ + ৮ + ০ = ১৬$$

বিয়োগফল (বড়টা থেকে ছোটটাকে বিয়োগ করে) হল:

$$২১ - ১৬ = ৫$$

একে ১১ দিয়ে ভাগ করলে মেলে না। তাহলে এ সংখ্যাটা ১১ দিয়ে বিভাজ্য নয়।

আর একটা সংখ্যা ধরা যাক, যেমন — ৭৩,৪৪,৫৩৫।

$$৩ + ৪ + ৩ = ১০ \qquad ৭ + ৪ + ৫ + ৫ = ২১ \qquad ২১ - ১০ = ১১$$

১১-কে ১১ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়, সুতরাং সংখ্যাটাকেও ১১ দিয়ে ভাগ দিলে মিলে যাবে।

এইভাবে সহজেই বোঝা যায়, নয় অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটায় অংকগুলো কোন ধারাবাহিকতায় বসাতে হবে যাতে সংখ্যাটাকে ১১ দিয়ে ভাগ দিলে মিলে যায়।

আর একটা উদাহরণ: ৩৫,২০,৪৯,৭৮৬।
এটাকে অঙ্ক কষে দেখা যাক:

৩ + ২ + ৪ + ৭ + ৬ = ২২ ৫ + ০ + ৯ + ৮ = ২২

(২২ − ২২) বিয়োগফল হল ০, তাহলে যে সংখ্যাটা নিয়েছি আমরা তা ১১ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে।

এই সংখ্যাগুলোর ভেতর সবচেয়ে বড়টা হল — ৯৮,৭৬,৫২,৪১৩।
সবচেয়ে ছোটটা — ১০,২৩,৪৭,৫৮৬।

৪৫. কোন পাঠক ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে নীচের ধরনের নয়টা উদাহরণ বের করতে পারবে। এগুলো হল:

১২ × ৪৮৩ = ৫৭৯৬
৪২ × ১৩৮ = ৫৭৯৬
১৮ × ২৯৭ = ৫৩৪৬
২৭ × ১৯৮ = ৫৩৪৬
৩৯ × ১৮৬ = ৭২৫৪
৪৮ × ১৫৯ = ৭৬৩২
২৮ × ১৫৭ = ৪৩৯৬
৪ × ১৭৩৮ = ৬৯৫২
৪ × ১৯৬৩ = ৭৮৫২
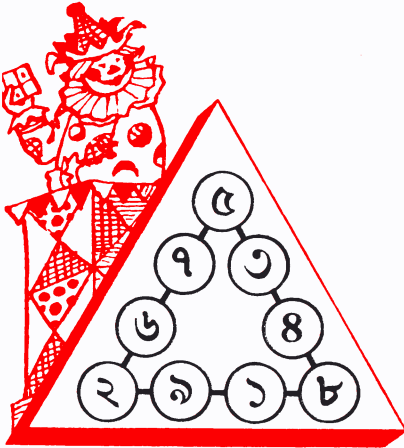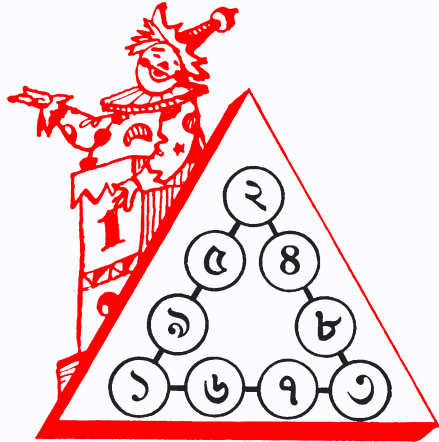
২৯ নং ছবি ৩০ নং ছবি

৪৬—৪৭. ২৯ নং আর ৩০ নং ছবিতে সমাধান দেখান হয়েছে। প্রত্যেক সারির মাঝখানের অংকগুলোকে জায়গা বদল করে বসালে আর এক সারি সমাধান পাওয়া যাবে।

৪৮. কিভাবে সংখ্যাগুলো সাজাতে হবে তা দেখতে হলে নীচের মতো হিসেব ধরে নিয়ে এগোতে হবে।

মাথাগুলাতে সংখ্যার যোগফল হবে ২৬। আর তারাটার সমস্ত সংখ্যার যোগফল ৭৮। তাহলে, ভেতরের ষড়ভুজের সংখ্যার যোগফল হবে ৭৮ – ২৬ = ৫২।

৩১ নং ছবি

এবার বড় ত্রিভুজগুলির ভেতর একটা ধরা যাক। এর প্রত্যেক বাহুর সংখ্যাগুলির যোগফল ২৬। যদি তিনটে বাহুকে যোগ করা যায় তবে হবে ২৬ × ৩ = ৭৮। কিন্তু এখানে মাথাগুলির প্রত্যেকটি সংখ্যাকে গোনা হচ্ছে দু'বার করে। ভেতরের তিন জোড়ার (অর্থাৎ ভেতরের ষড়ভুজের) যোগফল আমরা জানি হবে ৫২, তাহলে প্রতিটি ত্রিভুজের মাথার যোগফলের দ্বিগুণ হবে ৭৮ – ৫২ = ২৬, অথবা প্রতি ত্রিভুজে ১৩।

এবার আমাদের অংক খুঁজে বের করার কাজটা কমে এল। উদাহরণস্বরূপ, মাথার বিন্দুগুলোতে ১২ বা ১১ কোন সংখ্যাই থাকতে পারে না। তাহলে ১০ দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, আর এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বের হয়ে যাবে যে অন্য দুটো অংক হবে ১ আর ২।

এখন যে কাজটা করতে হবে তা হল সংখ্যাগুলো বসিয়ে যাওয়া। তা করতে করতেই আমাদের সমাধানে যেভাবে সাজাতে হবে তা বার হয়ে যাবে। ৩১ নং ছবিতে এটা দেখান হয়েছে।
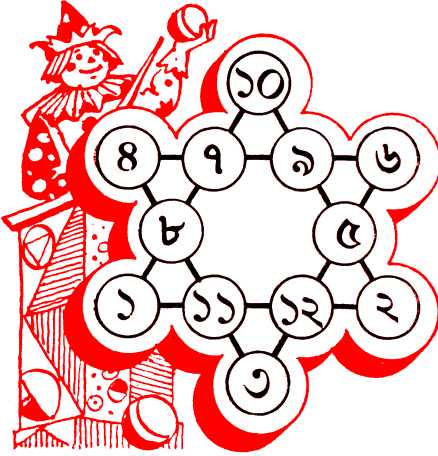
৬
দানবীয় সংখ্যা
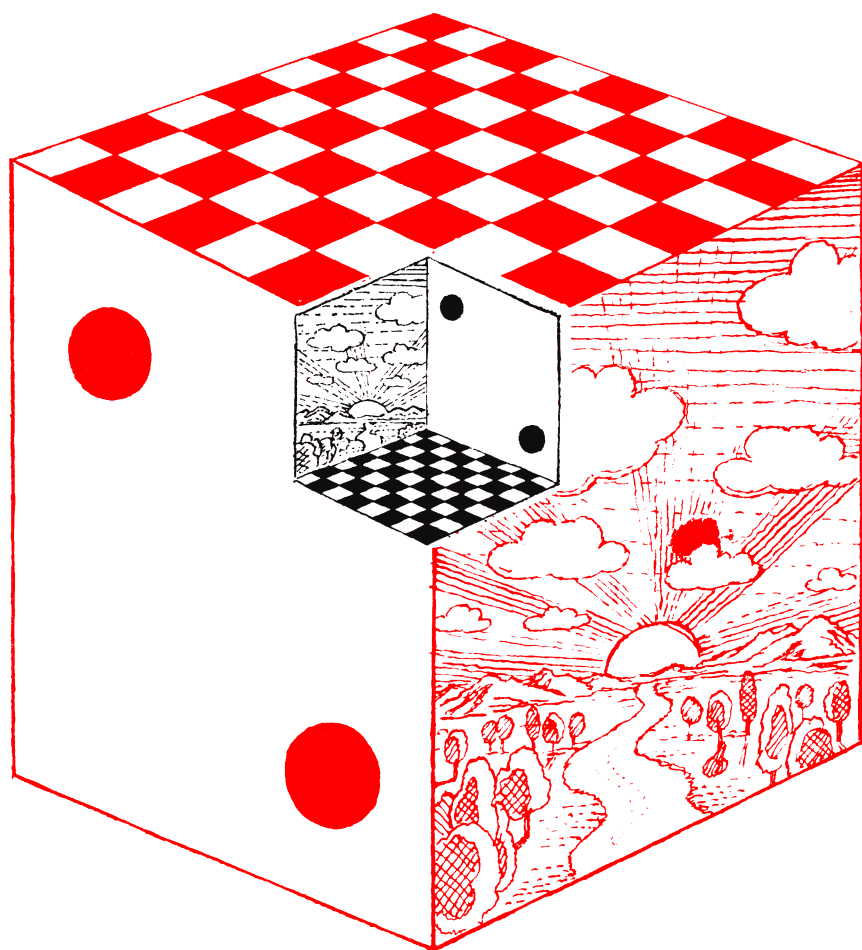
৪৯. একটি লাভজনক লেনদেন

ঘটনাটা কবে বা কোথায় ঘটেছিল তা জানা নেই আমাদের। হয়ত কোনদিনই ঘটে নি, সেটাই অবশ্য বেশী সম্ভব। কিন্তু সত্যিই হোক আর কল্পনাই হোক, এই মজার গল্পটা শোনবার মতো।

এক

এক কোটিপতি তো খুব খুশী হয়ে ঘরে ফিরল। একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তার মতে, এই দেখা হওয়াটা ভবিষ্যতে খুবই লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে।

বাড়ির লোকদের বলল সে, ''কপালখানা দেখ তো! লোকে যে বলে সৌভাগ্য শুধু পয়সাওয়ালা লোকদের জন্য, ঠিকই। অন্তত আমার ভাগ্যে তো কিছুটা ফলেছে কথাটা। ব্যাপারটা ঘটল একেবারে অপ্রত্যাশিত! বাড়িতে আসছি, এমন সময় দেখা হল একটা অতি সাধারণ লোকের সঙ্গে, হয়ত লক্ষ্যই করতাম না তাকে আমি। কিন্তু আমার পয়সাকড়ি আছে শুনে সে একটা প্রস্তাব করল। আর সেই প্রস্তাবটা শুনে, বুঝলে তোমরা, আমার তো দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।

''লোকটা বলল, 'আসুন, চুক্তি করা যাক একটা, পুরো এক মাস প্রতিদিন আমি আপনাকে দেব ১ লক্ষ রুবল। এর বদলে আমারও নিশ্চয়ই চাই কিছু — অবশ্য সেটা প্রায় কিছুই না!'

''প্রথম দিন আমাকে যা দিতে হবে সে একটা তামাশামাত্র, শুধু একটা কোপেক। আমি তো আমার কানদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

''জিজ্ঞেস করলাম, 'মাত্র একটা কোপেক?'

''সে আবার বলল, 'মাত্র একটা, দ্বিতীয় দিনের ১ লক্ষ রুবলের জন্য অবশ্য দিতে হবে ২ কোপেক।'

''আমার আর তর সইছিল না, জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর, তারপর কত দিতে হবে?'

৩২ নং ছবি। 'মাত্র একটি কোপেক...'

" 'আজ্ঞে, তৃতীয় বার ১ লক্ষ রুবলের জন্য আপনি আমাকে দেবেন ৪ কোপেক, চতুর্থবারে দেবেন ৮ কোপেক, পঞ্চম বারে ১৬ কোপেক। এইভাবে প্রতিদিন আপনি আমাকে আগের দিনের ডবল কোপেক দেবেন।'

" 'তারপর?'

" 'ব্যস, শুধু এই এর বেশী আর কিছু চাইব না আমি। আপনি শুধু এই শর্তটাই মেনে চলবেন। প্রতিদিন আমি আপনাকে ১ লক্ষ রুবল এনে দেব, প্রতিদিন আপনি আমাদের কথামতো টাকাটা দিয়ে দেবেন। একটা শর্ত আছে শুধু, মাস শেষ না হলে কিন্তু লেনদেন বন্ধ করা চলবে না।'

"ভেবে দেখ কথাটা! শুধু কয়েকটা কোপেকের জন্য লোকটা লাখ লাখ রবুল দিয়ে দিচ্ছে। লোকটা হয় জালিয়াত, নয়ত পাগল। তা যাই হোক, ব্যবসাটা কিন্তু লাভের। সুযোগটা তো ছাড়া চলবে না।

''আমি বললাম, 'আচ্ছা বেশ, টাকাটা নিয়ে এস, যা চাইছ তাই দেব আমি। দেখ বাবা, ঠকিও না কিন্তু জাল নোট-টোট এন না যেন।'

''লোকটা বলল, 'ভাববেন না। কাল সকালেই আসব আমি।'

''আমার শুধু এই ভয় যে লোকটা হয়ত আসবে না। সে হয়ত বুঝতে পেরেছে যে একটা বোকার মতো কাজ করে ফেলেছে সে। আচ্ছা দেখা যাক, আগামী কালের তো দেরি নেই আর।"

দুই

পরদিন খুব ভোরেই জানালায় টোকা পড়ল। সেই অচেনা লোকটা এসেছে।

সে জিজ্ঞেস করল, ''আপনার কোপেক ঠিক করে রেখেছেন তো, আমার কথামতো টাকাটা নিয়ে এসেছি আমি।''

সত্যিই তাই, ঘরে ঢুকেই একটা টাকার বাণ্ডিল বের করল সে। ঠিকঠিক ১ লক্ষ রুবল গুনল, তারপর বলল:

‘‘এই হল আমাদের কথামতো টাকাটা। এখন আমার কোপেকটা দিয়ে দিন।”

টেবিলের উপর একটা তামার মুদ্রা রাখল কোটিপতি। তার হৃদয় এখন গলার কাছে ধুকপুক করছে, হঠাৎ যদি মত বদলায় লোকটার, যদি হঠাৎ ফেরত চেয়ে বসে টাকাটা! লোকটা মুদ্রাটাকে হাতের তালুতে নিয়ে ওজন করে দেখল, তারপর রেখে দিল ব্যাগের ভেতর।
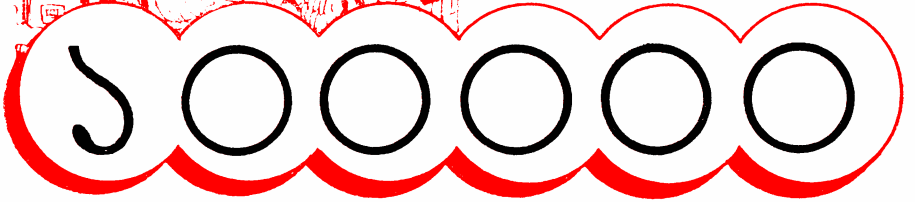
৩৩ নং ছবি। জানালায় টোকা দিল অচেনা লোকটি।

“কালও এই সময়েই আসছি আমি। কোপেক দুটো তৈরি রাখতে ভুলবেন না।”

সেই ধনী লোকটি তো তার সৌভাগ্যকে বিশ্বাসই করতে পারল না। ১ লক্ষ রুবল কি আকাশের চাঁদ হাতে নিয়ে এল! টাকাটা গুনলে সে, সব ঠিক আছে, কোন জাল নোট-টোট নেই দেখে আশ্বস্ত হল। তারপর খুশী মনে টাকাটা সরিয়ে রেখে আগামী দিনের কথাটা ভাবতে লাগল।

রাতের বেলা আবার দুশ্চিন্তা শুরু হল। লোকটা যদি কোন ছদ্মবেশী ডাকাত হয়? কোটিপতি তার ধনরত্ন কোথায় রাখে তাই দেখবার জন্যই এসে থাকে যদি, হয়ত পরে ডাকাতি করবে।

ধনী লোকটি উঠে, আরও ভাল করে দরজাগুলো এ'টে দিল; বারবার জানালা খুলে দেখতে লাগল, আর একটু শব্দ হলেই ঘাবড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল, ঘুম এল না বহুক্ষণ। ভোরের বেলায় জানালায় একটা টোকা পড়ল। সেই লোকটা এসেছে। আরও ১ লক্ষ রুবল গুনে দিয়ে কথামতো দুটো কোপেক নিয়ে ব্যাগে পুরে বেরিয়ে গেল সে।

বলে গেল, "কাল চার কোপেক তৈরি রাখতে ভুলবেন না।"

পকেটে আরও ১ লক্ষ রুবল এল। ধনী লোকটির তো আনন্দ আর ধরে না। এবার কিন্তু লোকটিকে আর ডাকাত বলে মনে হল না। আসলে, কোটিপতির লোকটিকে আর সন্দেহজনক বলেই মনে হল না। শুধুমাত্র কয়েকটা কোপেক চায়, পাগল নাকি! আহা পৃথিবীতে যদি আরও কিছু এমন লোক থাকত, চালাক লোকেরা বেশ থাকত তাহলে...

তৃতীয় দিনেও ঠিকমতোই এল লোকটি। কোটিপতিও এবার ৪ কোপেকের বদলে পেল ১ লক্ষ রুবল।

পরদিন আরও ১ লক্ষ রুবল এল ৮ কোপেকের বদলে।

পঞ্চম বারে ১ লক্ষ রুবলের জন্য ধনী লোকটি দিল ১৬ কোপেক।

আর ষষ্ঠ বারের জন্য দিল ৩২ কোপেক।

প্রথম সাত দিনে কোটিপতি পেল ৭ লক্ষ রুবল, আর তার জন্য তার খরচা হল অতি সামান্য:

$$১+২+৪+৮+১৬+৩২+৬৪= \text{১ রুবল ২৭ কোপেক}$$

এটা লোভী লোকটার খুব মনমতো হল। শর্তটা এক মাস মাত্র চলবে এই একটামাত্র দুঃখ থাকল তার। তার মানে হল মাত্র ৩০ লক্ষ রুবল পাবে সে। সময়টা অন্তত আরও ১৫ দিন বাড়াবার জন্য লোকটার সঙ্গে কথা বলবে নাকি? না, বাবা, না বলাই ভাল। লোকটা হয়ত তাহলে বুঝে ফেলবে যে টাকাটা সে শুধু শুধুই দিয়ে দিচ্ছে...

এর ভেতর সেই অচেনা লোকটা কিন্তু প্রতি সকালেই ১ লক্ষ রুবল নিয়ে আসতে লাগল। আট দিনের দিন সে পেল ১ রুবল ২৮ কোপেক, নবম দিনে — ২·৫৬ রুবল, দশম দিনে — ৫·১২ রুবল, এগারো দিনের দিন — ১০·২৪ রুবল, বারো দিনের দিন — ২০·৪৮ রুবল, তেরো দিনের দিন — ৪০·৯৬ রুবল, চৌদ্দ দিনের দিন — ৮১·৯২ রুবল।

ধনী লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিত টাকাটা। কমবেশী ১৫০ রুবলের বদলে সে ১৪ লক্ষ রুবল পেয়েছে।

কিন্তু তার আনন্দ স্থায়ী হল না। অল্প দিনেই সে দেখতে পেল কারবারটাকে প্রথমে সে যতটা লাভজনক ভেবেছিল, ততটা নয়। ১৫ দিন বাদেই তাকে আর কোপেক নয়, কয়েক শো রুবল দিতে হল। তারপর থেকেই দেবার অংকটা তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল। আসলে তাকে যা দিতে হল তা এই:

পনেরো	বারের ১ লক্ষের জন্য	১৬৩·৮৪
ষোলো	বারের ১ লক্ষের জন্য	৩২৭·৬৮
সতেরো	বারের ১ লক্ষের জন্য	৬৫৫·৩৬
আঠারো	বারের ১ লক্ষের জন্য	১,৩১০·৭২
উনিশ	বারের ১ লক্ষের জন্য	২,৬২১·৪৪

এখনও ক্ষতি হচ্ছিল না তার। ৫০০০ রুবলেরও বেশী দিতে হয়েছে তাকে সত্যি কথা, কিন্তু তার বদলে সে কি ১৮ লক্ষ রুবল পায় নি?

লাভের অংকটা কিন্তু প্রতিদিনই ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছিল।

এরপর ধনী লোকটিকে যা দিতে হল তা হচ্ছে:

বিশ	বারের ১ লক্ষের জন্য	৫,২৪২·৮৮
একুশ	বারের ১ লক্ষের জন্য	১০,৪৮৫·৭৬
বাইশ	বারের ১ লক্ষের জন্য	২০,৯৭১·৫২
তেইশ	বারের ১ লক্ষের জন্য	৪১,৯৪৩·০৪
চব্বিশ	বারের ১ লক্ষের জন্য	৮৩,৮৮৬·০৮
পঁচিশ	বারের ১ লক্ষের জন্য	১,৬৭,৭৭২·১৬
ছাব্বিশ	বারের ১ লক্ষের জন্য	৩,৩৫,৫৪৪·৩২
সাতাশ	বারের ১ লক্ষের জন্য	৬,৭১,০৮৮·৬৪

এখন থেকে সে যা পাচ্ছিল তার থেকে অনেক বেশী দিতে হচ্ছিল তাকে। এখনই তার থামা দরকার। কিন্তু চুক্তি ভাঙতে পারছে না সে।

অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে লাগল। খুব দেরি করেই সেই ধনী লোকটি বুঝতে পারল যে অপরিচিত লোকটি নির্দয়ভাবে বোকা বানিয়েছে তাকে, সে যা পেয়েছে তার থেকে অনেক অনেক বেশী দিতে হবে তাকে...

২৮ দিনের দিন ধনী লোকটিকে দশ লাখেরও বেশী রুবল দিয়ে দিতে হল। তারপরের দু'বারের টাকা একেবারে পথে বসিয়ে দিল তাকে। সে একেবারে আকাশ ছোঁয়া টাকা:

আঠাশ বারের ১ লক্ষের জন্য . . . . ১৩,৪২,১৭৭·২৮
উনত্রিশ বারের ১ লক্ষের জন্য . . . . ২৬,৮৪,৩৫৪·৫৬
ত্রিশ বারের ১ লক্ষের জন্য . . . . ৫৩,৬৮,৭০৯·১২

আগন্তুক যখন শেষ বারের মতো চলে গেল, কোটিপতি তখন ৩০ লক্ষ রুবলের জন্য তাকে কত দিতে হয়েছে হিসেব কষতে বসল। উত্তর হল:

১,০৭,৩৭,৪১৮ রুবল ২৩ কোপেক

১ কোটি ১০ লক্ষ রুবলের অল্প কিছু কম!.. আর এর শুরু হয়েছিল এক কোপেক থেকে। অপরিচিত লোকটি যদি দৈনিক ৩ লক্ষ রুবল করেও দিত, তাহলেও তার এক কোপেকও ক্ষতি হত না।

তিন

গল্পটা শেষ করার আগে কোটিপতির লোকসান আরও তাড়াতাড়ি কিভাবে হিসেব করে বের করা যায়, অর্থাৎ তার দেওয়া টাকাগুলো তাড়াতাড়ি যোগ করার উপায় দেখাব তোমাদের:

১ + ২ + ৪ + ৮ + ১৬ + ৩২ + ৬৪ ইত্যাদি

সংখ্যাগুলির নিম্নবর্ণিত বিশেষত্বগুলো লক্ষ্য করা কঠিন নয় মোটেই:

১ = ১
২ = ১ + ১
৪ = (১ + ২) + ১
৮ = (১ + ২ + ৪) + ১
১৬ = (১ + ২ + ৪ + ৮) + ১
৩২ = (১ + ২ + ৪ + ৮ + ১৬) + ১ ইত্যাদি

আমরা দেখছি যে প্রতিটি সংখ্যা তার আগের সংখ্যাগুলোর যোগফলের চাইতে ১ বেশী। তাহলে, যদি আমাদের সবগুলো সংখ্যা যোগ করতে হয়, যেমন ধরা যাক ১ থেকে ৩২,৭৬৮ পর্যন্ত, তখন শেষ সংখ্যার সঙ্গে

(৩২,৭৬৮) আমরা যোগ করব তার আগের সংখ্যাগুলোর যোগফল। এই আগের সংখ্যাগুলোর যোগফল হল, সেই সংখ্যা থেকে ১ কম (৩২,৭৬৮ — ১)। উত্তর হল ৬৫,৫৩৫।

কোটিপতি শেষবার কত টাকা দিয়েছিল সেটা জানলে, এভাবে অংক কষেই সে মোট কত টাকা দিয়েছিল তা আমরা বের করতে পারি। সে শেষ যে টাকাটা দিয়েছিল তা হল ৫৩,৬৮,৭০৯ রুবল ১২ কোপেক।

তাহলে ৫৩,৬৮,৭০৯·১২ আর ৫৩,৬৮,৭০৯·১১ যোগ করলেই আমাদের উত্তরটা পেয়ে যাব:

১,০৭,৩৭,৪১৮·২৩

৫০. গুজব

গুজব যে কত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কখনও একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা হয়ত চোখে দেখেছে মাত্র কয়েক জন। কিন্তু দু'ঘণ্টার ভেতরেই সেটা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। এর অসাধারণ গতি দেখলে অবাক হতে হয়, বুদ্ধি গুলিয়ে যায়।

কিন্তু সমস্তটা ব্যাপার যদি অংকের সাহায্যে কষো তাহলেই দেখবে আসলে এর ভেতর চমক লাগানো ব্যাপার কিছুই নেই, ব্যাপারটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

নীচের ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখা যাক।

এক

রাজধানী থেকে একটা আগ্রহজনক খবর নিয়ে এল একজন লোক ৫০,০০০ লোক বাস করে এমন একটা শহরে। যে বাড়িতে উঠল সেখানে তিনজন মাত্র লোককে কথাটা বলল সে। ধর, এতে তার সময় লাগল ১৫ মিনিট।

তাহলে, লোকটি পৌঁছবার ১৫ মিনিট পরে, ধরা যাক সকাল ৮·১৫-তে, খবরটা জানল মাত্র চারজন: সে নিজে আর স্থানীয় তিনজন বাসিন্দা।

এই তিনজনের প্রত্যেকেই অন্য তিনজনকে খবরটা বলতে বেরিয়ে গেল।

৩৪ নং ছবি। রাজধানীর বাসিন্দা একটা মজার খবর নিয়ে এল।

এতে লাগল আরও ১৫ মিনিট। তার মানেই, আধ ঘণ্টা বাদে, ৪+(৩×৩)=১৩ জন লোকের ভেতর সংবাদটা জানাজানি হল।

শেষ যে নয়জন কথাটা জেনেছিল, তারা আবার তিনজন করে বন্ধুবান্ধবকে ঘটনাটা জানাল। সকাল ৮·৪৫ নাগাদ খবরটা জানল: ১৩+(৩×৯)=৪০ জন বাসিন্দা।

গুজবটা যদি এভাবে ছড়াতে থাকে, অর্থাৎ শোনবার ১৫ মিনিটের ভেতর প্রত্যেকেই যদি আরও তিনজনকে খবরটা বলে, তাহলে ফলটা দাঁড়াবে এই রকম:

সকাল ৯টায় খবরটা জানবে
৪০+(৩× ২৭)= ১২১ জন
সকাল ৯·১৫-তে খবরটা জানবে
১২১+(৩× ৮১)= ৩৬৪ জন
সকাল ৯·৩০-এ খবরটা জানবে
৩৬৪+(৩×২৪৩)=১০৯৩ জন

৩৫ নং ছবি। প্রত্যেকে খবরটা অন্য তিনজনকে বলল।

তার মানে দাঁড়াচ্ছে দেড় ঘণ্টার ভেতর খবরটা জানাজানি হবে প্রায় ১১০০ জনের ভেতর। যে শহরে ৫০,০০০ লোকের বাস সে শহরের পক্ষে এটা অবশ্য খুব বেশী বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে কি, কেউ কেউ ভাববে যে সমস্ত শহর খবরটা জানতে অনেক সময় লাগবে। খবরটা কত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে দেখা যাক:

সকাল ৯·৪৫-তে খবরটা জানবে
১০৯৩+(৩× ৭২৯)=৩২৮০ জন
সকাল ১০টায় খবরটা জানবে
৩২৮০+(৩×২১৮৭)=৯৮৪১ জন

তারপরের ১৫ মিনিটেই এটা শহরের অর্ধেকেরও বেশী লোকের কাছে পেঁৗছে যাবে:

$$৯৮৪১ + (৩ \times ৬৫৬১) = ২৯,৫২৪ \text{ জন}$$

তার মানেই হল সকাল ৮টায় যে খবরটা জানত মাত্র একজন লোক, সকাল ১০·৩০-এর ভেতর সারা শহরের লোক তা জেনে ফেলবে।

দুই

এবার দেখা যাক এটা কি করে হিসেব করা হয়। সমস্ত ব্যাপারটা নীচের এই সংখ্যাগুলির যোগ করায় এসে ঠেকছে:

$$১ + ৩ + (৩ \times ৩) + (৩ \times ৩ \times ৩) + (৩ \times ৩ \times ৩ \times ৩) + \text{ইত্যাদি}$$

আগে যেভাবে আমরা হিসেব করেছিলাম (১ + ২ + ৪ + ৮ ইত্যাদি) সেরূপ সহজতর পদ্ধতিতেও এটা করা যায় বোধহয়? তা যায়, অবশ্য যে সংখ্যাগুলি বসাচ্ছি তার কতকগুলি বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে:

$$১ = ১$$
$$৩ = ১ \times ২ + ১$$
$$৯ = (১ + ৩) \times ২ + ১$$
$$২৭ = (১ + ৩ + ৯) \times ২ + ১$$
$$৮১ = (১ + ৩ + ৯ + ২৭) \times ২ + ১ \text{ ইত্যাদি}$$

তার মানেই হল, প্রতিটি সংখ্যা তার আগের সংখ্যাগুলোর যোগফলের দ্বিগুণের চাইতে ১ বেশী।

তাহলে, ১ থেকে যেকোন সংখ্যা পর্যন্ত যোগফল বের করতে হলে শেষের সংখ্যাটার সঙ্গে যোগ করতে হবে সেই সংখ্যার (তা থেকে ১ বিয়োগ দিয়ে নিতে হবে) অর্ধেক।

যেমন ধরা যাক, এই অঙ্কটার যোগফল কত?

$$১ + ৩ + ৯ + ২৭ + ৮১ + ২৪৩ + ৭২৯$$

অথবা ৭২৯ + ৭২৮-এর অর্ধেক, অর্থাৎ ৭২৯ + ৩৬৪ = ১০৯৩।

7—2196
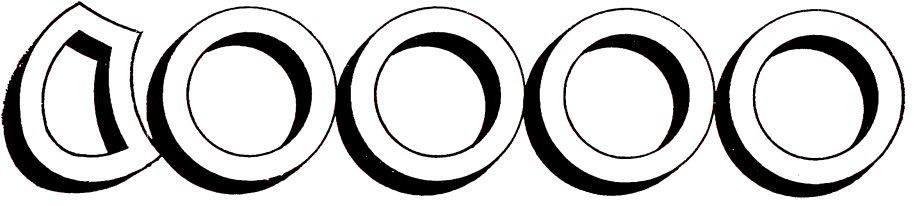
৩৬ নং ছবি। সাড়ে দশটায় সারা শহরের লোক খবরটা জেনে যাবে।
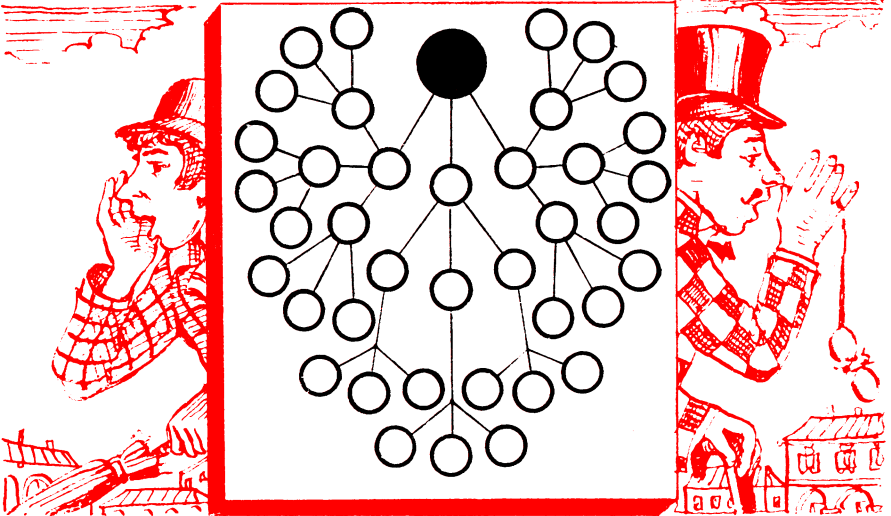
৩৭ নং ছবি। গুজব ছড়ানোর ধারা।

তিন

আমাদের গল্পটায় প্রত্যেক বাসিন্দা খবরটা বলছে কেবলমাত্র তিনজনের কাছে। কিন্তু শহরের বাসিন্দারা যদি একটু বেশী কথা বলে, আর খবরটা তিনজনকে না বলে, পাঁচ এমনকি দশজনকে বলে, তাহলে গুজবটা ছড়াবে আরও তাড়াতাড়ি।

পাঁচজন করে বললে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে:

সকাল ৮টায়	খবরটা জানে		১ জন
সকাল ৮·১৫-তে		১ + ৫ =	৬ জন
সকাল ৮·৩০-এ		৬ + (৫ × ৫) =	৩১ জন
সকাল ৮·৪৫-এ		৩১ + (২৫ × ৫) =	১৫৬ জন
সকাল ৯টাতে		১৫৬ + (১২৫ × ৫) =	৭৮১ জন
সকাল ৯·১৫-তে		৭৮১ + (৬২৫ × ৫) =	৩৯০৬ জন
সকাল ৯·৩০-এ		৩৯০৬ + (৩১২৫ × ৫) =	১৯,৫৩১ জন

মোদ্দা কথা, ৫০,০০০ বাসিন্দার প্রত্যেকেই সকাল ৯·৪৫-এর আগে খবরটা জেনে ফেলবে।

যদি প্রত্যেকে দশজন লোককে খবরটা বলত, তাহলে খবরটা ছড়িয়ে পড়ত আরও তাড়াতাড়ি। এক্ষেত্রে সংখ্যাটা এইভাবে তাড়াতাড়ি বেড়ে যেত:

সকাল ৮টায়	খবরটা জনত		১ জন
সকাল ৮·১৫-তে		১ + ১০ =	১১ জন
সকাল ৮·৩০-এ		১১ + ১০০ =	১১১ জন
সকাল ৮·৪৫-এ		১১১ + ১,০০০ =	১,১১১ জন
সকাল ৯টায়		১,১১১ + ১০,০০০ =	১১,১১১ জন

এরপরের সংখ্যাটা নিশ্চয়ই হবে ১,১১,১১১। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে সকাল ৯টার কিছু পরেই সারা শহর খবরটা জেনে যাবে। এক্ষেত্রে খবরটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে এক ঘণ্টার কিছু বেশী লাগবে।

৫১. সাইকেলের জুয়াচুরি

প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ায় এবং বিদেশে হয়ত বর্তমানেও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান সাধারণ স্তরের মালপত্তর কাটাবার জন্য এক নতুন ধরনের পথ বের করে। জনপ্রিয় সংবাদপত্র বা পত্রিকাগুলোতে নীচের ধরনের একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যাপারটা শুরু হত:
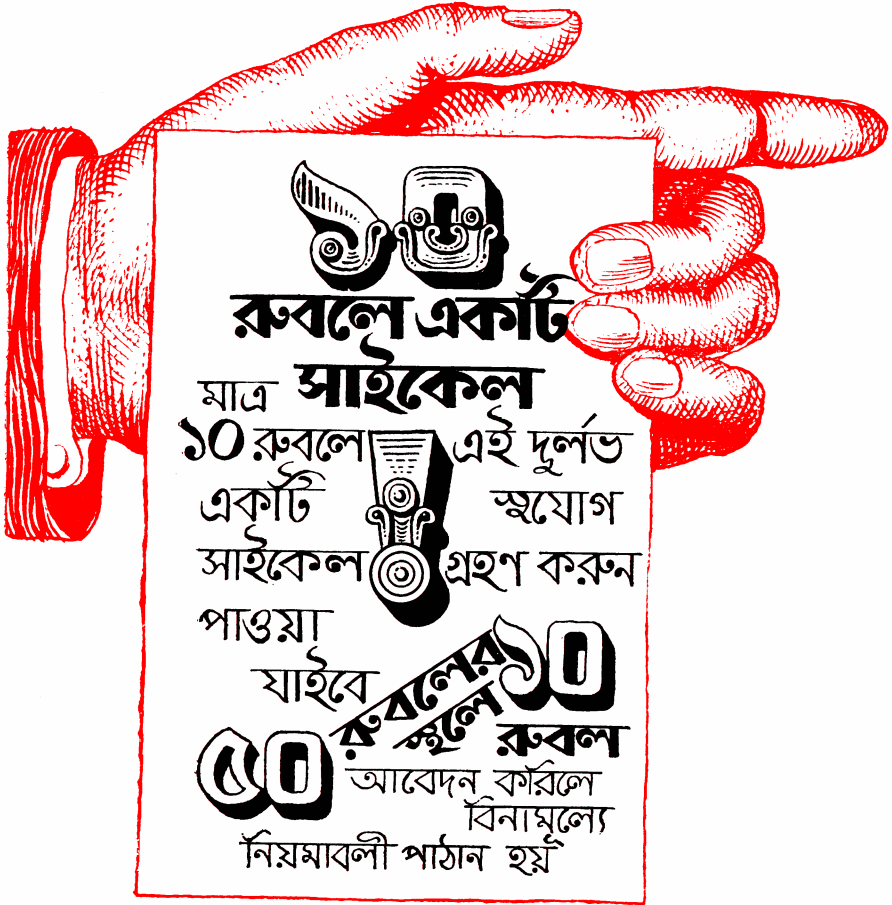
টোপটা অনেকেই গিলল, তারা লিখে পাঠাল নিয়মাবলীর জন্য। তাদের কাছে এল এক বিস্তৃত তালিকা।

১০ রুবলের বদলে তারা যা পেল তা কিন্তু সাইকেল নয়। তারা পেল চারটে কুপন, এগুলোকে আবার ১০ রুবল দামে তাদের বন্ধুদের কাছে বেচতে বলা হল। এভাবে যে ৪০ রুবল আদায় হল, সে তা পাঠিয়ে দিল সেই প্রতিষ্ঠানকে। তখন প্রতিষ্ঠানটি তাকে পাঠাল সাইকেলটা। সে তাহলে সত্যিসত্যিই ১০ রুবল দিল। বাকি ৪০ রুবল এল তার বন্ধুদের পকেট থেকে। আসলে এই ১০ রুবল দেওয়া ছাড়াও খদ্দেরকে বাকি চারটে কুপন

কেনার লোক জোগাড় করতে অনেক ঝামেলা পোয়াতে হল। অবশ্য তাতে তার পয়সা খরচা কিছু হল না।

এই কুপনগুলি কী? খদ্দের তার ১০ রুবলের জন্য কী কী সুবিধা পেল? সে একই ধরনের পাঁচটা কুপনের সঙ্গে তার কুপনটা বদলে নেবার অধিকারটাকে কিনে নিয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে সে সাইকেলের দাম ৫০ রুবল আদায় করার সুযোগের দাম দিয়েছিল। এই সাইকেলটা কিনতে তার আসলে লাগল কুপনের টাকাটা, মাত্র ১০ রুবল। নতুন করে যারা কুপনের মালিক হল তারা আবার প্রত্যেকে বিলি করার জন্য পেল পাঁচটা কুপন, এভাবে চলল।

একবার দেখলে সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর কোন জুয়াচুরি আছে বলে মনে হবে না। বিজ্ঞাপনদাতা তার কথা রাখল। সাইকেলটা কিনতে খদ্দেরকে আসলে ১০ রুবলই দিতে হল। প্রতিষ্ঠানটিরও কিছু ক্ষতি হচ্ছিল না, মালের পুরো দামটাই তারা পেয়ে যাচ্ছিল।

তবু ব্যাপারটা ছিল পরিষ্কার জুয়াচুরি। কারণ বহু লোক তাদের শেষ কুপনগুলি বেচতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত হল। তাই রাশিয়াতে এর নাম হল 'ধ্বস'। কোম্পানির লাভের টাকাটা এদের কাছ থেকেই জুটছিল। দু'দিন আগে বা পরে এমন একটা অবস্থা এল যে কুপনের মালিকদের পক্ষে ওগুলো বিক্রি করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কুপনের মালিকের সংখ্যা কত তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছিল। কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসেব কষতে বসলেই ঘটনাটার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখা যাবে।

প্রথম কিস্তিতে যারা সরাসরি প্রতিষ্ঠানটি থেকেই কুপন কিনেছিল, কেনবার নতুন লোক জোগাড় করতে কোন মুস্কিলই হল না তাদের। এই দলের প্রত্যেকে লেনদেনটার ভেতর চারজন করে নতুন লোক নিয়ে এল। এদের আবার কুপনগুলি বিক্রি করতে হল ২০ জনের (৪×৫) ভেতর, আর তা করতে গিয়ে তাদের এই কুপন কেনার সুবিধা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাতে হল। ধরে নেওয়া যাক তারা তা পারল, তখন কুড়ি জন নতুন করে অংশ গ্রহণ করল এতে।

বরফের ধ্বসটার গতি আর পরিধি (ভর, বেগ) দুইই বেড়ে উঠল। কুপনের ২০ জন নতুন মালিককে কুপনগুলো ছড়িয়ে দিতে হল আরও ২০×৫=১০০ জনের ভেতর।

এই পর্যন্ত সর্বপ্রথমে যারা কুপন পেয়েছিল তারা প্রত্যেকে খেলার ভেতর টেনে এনেছে ১+৪+২০+১০০=১২৫ জন লোককে। এদের

ভেতর ২৫ জন সাইকেল পেয়েছে। বাকি ১০০ জনকে একটি করে সাইকেল পাবার আশা দেওয়া হয়েছে, আর এই আশাতেই তারা প্রত্যেকে দিয়েছে ১০ রুবল করে।

'ধ্বস' এবার বন্ধুবান্ধবদের ছোট পরিধি ভেদ করে ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে, সেখানে কেনবার নতুন লোক খুঁজে পাওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। শেষ যে ১০০ জন কুপন কিনল তাদের আবার বিক্রি করতে হল ৫০০ জন নতুন শিকারের কাছে। তাদের আবার টানতে হল আরও ২৫০০ জনকে। শহরটা একেবারে কুপনে ছেয়ে যেতে লাগল, আর সত্যি বলতে কি, কুপন কিনতে চায় এমন লোক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল।

তোমরা দেখতে পাবে যে এই 'লাভের ব্যবসাতে' যাদের টানা হল তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল গুজব যেভাবে ছড়িয়েছিল (আগে দেখ) ঠিক সেভাবে। যে সংখ্যাগুলো পাওয়া গেল তা পিরামিডের মতো করে সাজালে দাঁড়ায় :

১
৪
২০
১০০
৫০০
২৫০০
১২,৫০০
৬২,৫০০

শহরটা যদি বড় হয় আর সাইকেল চড়া লোকের সংখ্যা হয় ৬২,৫০০ তাহলে ৮ কিস্তিতেই 'বরফ ধসে' পড়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এই সময়ের ভেতর সমস্ত লোকই পরিকল্পনার আওতায় এসে গেছে। কিন্তু এদের মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগই সাইকেল পাবে। বাকি লোকদের কাছে থাকবে কুপন। সে কুপনগুলো বিক্রির সম্ভাবনা আর এ জন্মে হবে না।

আরও বেশী লোকসংখ্যা যেসব শহরে, এমনকি যে আধুনিক রাজধানীতে লোক থাকে লক্ষ লক্ষ সেখানেও আর কয়েকটি কিস্তিতেই খেল্ খতম হয়ে যাচ্ছে। কারণ সংখ্যার এই পিরামিড বেড়ে উঠেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। নবম কিস্তির পর থেকে সংখ্যাগুলো এইরকম দাঁড়াচ্ছে:

৩,১২,৫০০
১৫,৬২,৫০০
৭৮,১২,৫০০
৩,৯০,৬২,৫০০

তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে ১২ নম্বর কিস্তিতে এই পরিকল্পনাটা একটা দেশের সমস্ত অধিবাসীকে গ্রাস করে ফেলবে, আর এই জাল কারবারীদের হাতে ঠকে যাবে তাদের ৪/৫ ভাগ।

তাদের লাভটা কী হল দেখা যাক। তারা জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ক্রেতার জন্য বাকি পাঁচ ভাগের চার ভাগকে দাম দিতে বাধ্য করছে। তার মানে: এই দল হয়েছে অন্য দলের সুখের জোগানদার। তাছাড়াও তারা পাচ্ছে অত্যুৎসাহী একদল মালবিক্রেতা, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেতেই কাজে এসেছে তারা। সমস্ত ঘটনাটাকে একজন রুশ লেখক ঠিকই নাম দিয়েছিলেন 'পারস্পরিক জুয়াচুরির হিমানী প্রপাত'। ঘটনাটি সম্বন্ধে আর যা বলা যেতে পারে তা হল: কি করে হিসেব কষে জুয়াচুরি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে হয়, তা যারা জানত না, তারাই ভুগত।

৫২. পুরস্কার

পুরনো রোমের সেই উপকথার ঘটনাটা বলছি এখানে।*

এক

রোমান সেনাপতি তেরেনতিয়াস এক বিজয় অভিযান থেকে অনেক ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরে একবার সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

সম্রাটও তাঁকে খুব সমাদর করে গ্রহণ করে সাম্রাজ্যের জন্য তিনি যা করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ জানালেন এবং সিনেটে তাঁর সম্মানের উপযুক্ত একটি পদ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কিন্তু তেরেনতিয়াস এই পুরস্কার চান নি।

তিনি বললেন, "আপনার সুনাম আর ক্ষমতা বিস্তারের জন্য আমি অনেক যুদ্ধ জয় করেছি, মৃত্যুকেও আমি ভয় করি নি। যদি আমার

* ব্রিটেনের এক ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সংগ্রহভূক্ত একটি হাতে-লেখা ল্যাটিন পাণ্ডুলিপির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।

একাধিক প্রাণ থাকত তাহলে তাও আপনার জন্য স্বেচ্ছায় আমি উৎসর্গ করতাম। কিন্তু যুদ্ধ করে করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সে বয়স এখন আমার আর নেই, শিরার রক্তেও আর তেজ নেই। এখন আমার পৈত্রিক বাড়িতে ফিরে গিয়ে জীবন কাটাবার সময় হয়েছে।"

"তেরেনতিয়াস, বল, কী তুমি চাও?" সম্রাট প্রশ্ন করলেন।

"হে সম্রাট! আমি চাই আপনার অনুগ্রহ। প্রায় সারা জীবনই আমি যুদ্ধে কাটিয়েছি, রক্তরঞ্জিত করেছি আমার তরবারি, কিন্তু নিজের সৌভাগ্য গড়ার কোন সময়ই আমি পাই নি। আমি দরিদ্র..."

"সাহসী তেরেনতিয়াস, বল, বল!" সম্রাট বলে উঠলেন।

উৎসাহ পেয়ে সেনাপতি বললেন, "আপনার অনুচরকে যদি পুরস্কারই দেবেন, তাহলে অনুগ্রহ করে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন শান্তি ও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে সাহায্য করুন। আমি সম্মান চাই না, চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী সিনেটেও কোন উঁচু পদের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। ক্ষমতা এবং সমাজ থেকে সরে গিয়ে আমি শান্তিতে বসবাস করতে চাই। হে সম্রাট, জীবনের বাকি দিনগুলি সুখে কাটাবার উপযুক্ত অর্থ আমাকে দিন।"

গল্পে আছে, সম্রাট দয়ালু ছিলেন না। আসলে, তিনি ছিলেন কৃপণ। টাকা দিতে প্রাণে লাগে তাঁর। সেনাপতিকে উত্তর দেবার আগে একমুহূর্ত ভেবে নিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

"কত টাকা হলে চলবে বলে মনে কর?"

"হে সম্রাট, দশ লক্ষ দিনারী (স্বর্ণমুদ্রা)।"

সম্রাট আবার চুপ হয়ে গেলেন। সেনাপতি মাথা নীচু করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত সম্রাট বললেন:

"সাহসী তেরেনতিয়াস, তুমি একজন বিরাট সেনাপতি। সত্যিসত্যিই তোমার কীর্তির উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া উচিত। ধনদৌলত আমি দেব তোমাকে। আমি যা ঠিক করি কাল দুপুরে জানতে পাবে।"

নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন তেরেনতিয়াস।

দুই

পরদিন রাজপ্রাসাদে এলেন তেরেনতিয়াস।

"এই যে সাহসী তেরেনতিয়াস!" সম্রাট আহ্বান জানালেন।

শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথা নোয়ালেন সেনাপতি।

"সম্রাট, আমি আপনার মতামত জানতে এসেছি, আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পুরস্কার দেবেন কথা দিয়েছেন।"

সম্রাট উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই, তোমার মতো একজন মহান যোদ্ধাকে আমি সামান্য কোন প্রতিদান দিতে চাই না। দেখ, আমার ধনাগারে ৫০ লক্ষ পেতলের মুদ্রা আছে, যার দাম হল দশ লক্ষ দিনারী। এবার খেয়াল করে শোনো। তুমি আমার ধনাগারে গিয়ে একটা মুদ্রা এখানে নিয়ে আসবে। পরদিন আবার ধনাগারে গিয়ে প্রথমটার দ্বিগুণ দামের মুদ্রা এনে প্রথমটার পাশে রাখবে। তৃতীয় দিনে পাবে প্রথমটার চার গুণ, চতুর্থ দিনে আট গুণ, পঞ্চম দিনে ষোলো গুণ এক একটা করে মুদ্রা। এইভাবেই চলতে থাকবে। তোমার জন্য প্রতিদিন উপযুক্ত দামের মুদ্রা তৈরির আদেশ দিয়ে রাখব। যতদিন পর্যন্ত ক্ষমতা থাকবে তোমার, তুমি আমার কোষাগার থেকে মুদ্রা নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু কারুর সাহায্য না নিয়ে কাজটা একাই করতে হবে তোমাকে। আর যখন তুমি আর মুদ্রা তুলতে পারবে না, তখন থামবে। আমাদের চুক্তি শেষ হবে তখন। যা কিছু মুদ্রা তুমি নিয়ে আসবে, তাই হবে তোমার পুরস্কার।"

খুব আগ্রহ নিয়ে সম্রাটের কথা শুনলেন তেরেনতিয়াস। রাজকোষ থেকে বিরাট ধন নিয়ে আসার কল্পনায় তাঁর চোখ তখন স্বপ্নিল।

"হে সম্রাট, আপনার বদান্যতায় আমি কৃতজ্ঞ। আপনার পুরস্কার সত্যিই অপূর্ব!" সানন্দে উত্তর দিলেন তেরেনতিয়াস।

তিন

সম্রাটের দরবার-ঘরের কাছেই কোষাগার। এভাবে প্রতিদিন সেখানে যেতে শুরু করলেন তেরেনতিয়াস। প্রথম মুদ্রাকে দরবার-ঘরে নিয়ে আসা কঠিন হল না।

প্রথম দিন যে ছোট্ট মুদ্রাটি তেরেনতিয়াস নিয়ে এলেন তার ব্যাস হল ২১ মিলিমিটার আর ওজন ৫ গ্রাম।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম আর ষষ্ঠ মুদ্রাগুলি বয়ে নিয়ে আসাও বেশ সহজ হল। ওগুলির ওজন ছিল যথাক্রমে ১০, ২০, ৪০, ৮০ আর ১৬০ গ্রাম।
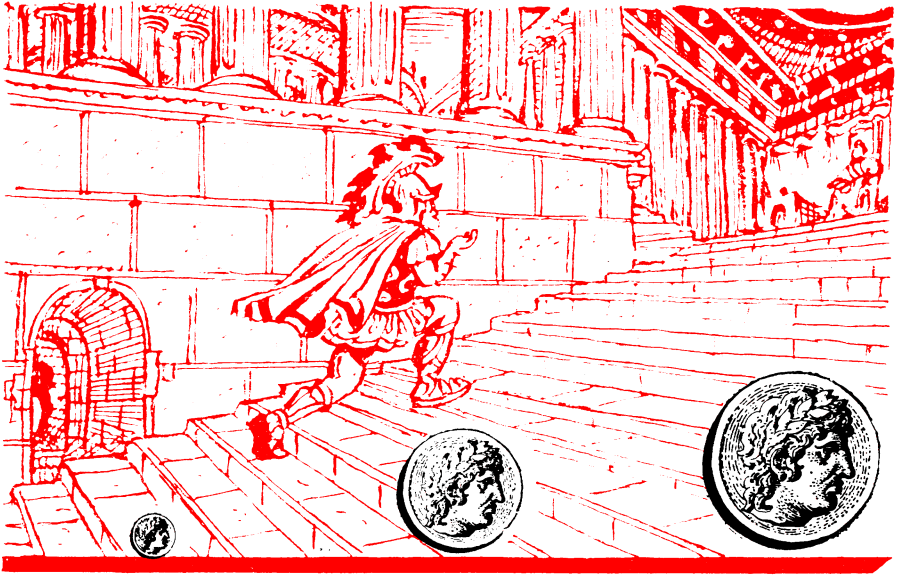
৩৮ নং ছবি। প্রথম মুদ্রা।
৩৯ নং ছবি। সপ্তম মুদ্রা।
৪০ নং ছবি। নবম মুদ্রা।

সপ্তম মুদ্রার ওজন হল ৩২০ গ্রাম আর তার ব্যাস হল ৮ · ৫০ সেন্টিমিটার (অথবা ঠিকঠিক বলতে গেলে ৮৪ মিলিমিটার*)।

অষ্টম দিনে তেরেনতিয়াসকে যে মুদ্রাটা নিতে হল তার দাম ছিল প্রথম মুদ্রার ১২৮ গুণ, এর ওজন হল ৬৪০ গ্রাম, আর ব্যাস হল প্রায় ১০ সেন্টিমিটার।

নবম দিনে তিনি সম্রাটের কাছে যে মুদ্রাটা নিয়ে এলেন তার দাম হল প্রথম মুদ্রার ২৫৬ গুণ, ওজন হল ১·২৫০ কিলোগ্রামেরও বেশী আর ব্যাস হল ১৩ সেন্টিমিটার।

বারো দিনের মুদ্রাটার ব্যাস হল প্রায় ২৭ সেন্টিমিটার, আর ওজন দাঁড়াল ১০·২৫০ কিলোগ্রাম।

সম্রাট প্রতিদিন সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন তেরেনতিয়াসকে। জয়ের

---

* প্রথম মুদ্রা থেকে ব্যাস আর পুরুত্বে চার গুণ বেশী হলেই মুদ্রাটা ৬৪ গুণ ভারী হয়ে যায়, কারণ ৪×৪×৪=৬৪। গল্পের শেষে যখন আমরা মুদ্রার আকার হিসেব করব তখন কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে।

আনন্দ আর লুকিয়ে রাখতে পারলেন না তিনি। তিনি দেখলেন যে, তেরেনতিয়াস তাঁর কোষাগারে গিয়েছেন ১২ বার, আর এনেছেন ২000 পেতলের মুদ্রার কিছু বেশী মাত্র।

তেরো দিনের দিন তেরেনতিয়াস পেলেন প্রথম মুদ্রাটা থেকে ৪০৯৬ গুণ দামী মুদ্রা। এর ব্যাস ছিল ৩৪ সেন্টিমিটার আর ওজন ২০·৫০০ কিলোগ্রাম।

এর পরদিনের মুদ্রাটা হল আরও বড় আর আরও ভারী: ওজন হল ৪১ কিলোগ্রাম, ব্যাস হল ৪২ সেন্টিমিটার।

হাসি না চাপতে পেরে সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, "সাহসী তেরেনতিয়াস, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ কি?"

"না, সম্রাট," ভুরু কুঁচকে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে উত্তর করলেন সেনাপতি।

পার হয়ে এল পনেরো দিন। বোঝাটা এত ভারী হয় নি আর কখনও। প্রথম মুদ্রাটা থেকে ১৬,৩৮৪ গুণ দামী একটা মুদ্রা বয়ে নিয়ে তেরেনতিয়াস ধীরে ধীরে এসে ঢুকলেন দরবারে। এর ব্যাস ছিল ৫৩ সেন্টিমিটার আর ওজন ৮০ কিলোগ্রাম। ওজনটা একজন দীর্ঘকায় যোদ্ধার ওজনের সমান।

ষোলো দিনের দিন বোঝাটা বয়ে আনতে গিয়ে সেনাপতির পা কাঁপতে লাগল। মুদ্রাটার দাম ছিল ৩২.৭৬৮টা মূল মুদ্রার সমান, আর ওজন হল ১৬৪ কিলোগ্রাম। ব্যাস দাঁড়াল ৬৭ সেন্টিমিটার।

হাঁপাতে হাঁপাতে তেরেনতিয়াস এসে ঢুকলেন দরবার-ঘরে। তাঁকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সম্রাটের সঙ্গে দেখা হলে সম্রাট একটু হেসে তাঁর দিকে তাকালেন...

এর পরদিন সেনাপতি সেখানে আসতেই এক দমকা হাসি অভ্যর্থনা জানাল তাঁকে। মুদ্রাটা আর বয়ে আনতে পারেন নি তিনি, সেটাকে গড়িয়ে আনতে হয়েছে। এর ব্যাস ছিল ৮৪ সেন্টিমিটার, ওজন ৩২৮ কিলোগ্রাম আর দাম ৬৫,৫৩৬টি মূল মুদ্রার সমান।

আঠারো দিনটাতেই শেষবারের মতো কিছু ধনসম্পদ বাগাতে পারলেন তিনি। রাজকোষ হয়ে দরবারে যাওয়া শেষ হয়ে গেল তাঁর। এবারের মুদ্রাটার দাম ছিল ১,৩১,০৭২টি মূল মুদ্রার সমান, ব্যাস ১ মিটারেরও বেশী, আর ওজন ৬৫৫ কিলোগ্রাম। তাঁর বর্শাটাকে স্টিয়ারিং-লিভারের মতো করে ধরে মুদ্রাটা গড়িয়ে আনলেন তিনি। সম্রাটের পায়ের কাছে ধপাস করে পড়ল সেটা।

৪১ নং ছবি। একাদশতম মুদ্রা।
৪২ নং ছবি। ত্রয়োদশতম মুদ্রা।
৪৩ নং ছবি। পঞ্চদশতম মুদ্রা।

একেবারে দম ফুরিয়ে গেছে তেরেনতিয়াসের।

“যথেষ্ট... হয়েছে,” হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি।

আনন্দের হাসি অতিকষ্টে চাপলেন সম্রাট। সেনাপতিকে একেবারে বোকা বানিয়েছেন তিনি। কোষাধ্যক্ষকে এরপর হিসেব করতে বললেন তিনি: তেরেনতিয়াস রাজকোষ থেকে কত টাকা বের করে এনেছেন।

তাই করলেন কোষাধ্যক্ষ।

“হে সম্রাট, আপনার সহৃদয়তাকে ধন্যবাদ। সাহসী তেরেনতিয়াস পুরস্কার পেয়েছেন ২,৬২,১৪৩টি পেতলের মুদ্রা।”

এভাবে সেই কৃপণ সম্রাট, সেনাপতি যে দশ লক্ষ দিনারী চেয়েছিলেন তার মাত্র কুড়ি ভাগের এক ভাগ দিলেন তাঁকে।

* * *

কোষাধ্যক্ষের হিসেব আর মুদ্রাগুলির ওজন দেখা যাক এবার। রাজকোষ থেকে তেরেনতিয়াস যা নিয়েছিলেন তা হল:

৪৪ নং ছবি। ষোড়শতম মুদ্রা। ৪৫ নং ছবি। সপ্তদশতম মুদ্রা।

১ম	দিনে	১টির সমান মুদ্রার ওজন	৫ গ্রাম
২য়	দিনে	২টির সমান মুদ্রার ওজন	১০ গ্রাম
৩য়	দিনে	৪টির সমান মুদ্রার ওজন	২০ গ্রাম
৪র্থ	দিনে	৮টির সমান মুদ্রার ওজন	৪০ গ্রাম
৫ম	দিনে	১৬টির সমান মুদ্রার ওজন	৮০ গ্রাম
৬ষ্ঠ	দিনে	৩২টির সমান মুদ্রার ওজন	১৬০ গ্রাম
৭ম	দিনে	৬৪টির সমান মুদ্রার ওজন	৩২০ গ্রাম
৮ম	দিনে	১২৮টির সমান মুদ্রার ওজন	৬৪০ গ্রাম
৯ম	দিনে	২৫৬টির সমান মুদ্রার ওজন	১,২৮০ গ্রাম
১০ম	দিনে	৫১২টির সমান মুদ্রার ওজন	২,৫৬০ গ্রাম
১১শ	দিনে	১,০২৪টির সমান মুদ্রার ওজন	৫,১২০ গ্রাম
১২শ	দিনে	২,০৪৮টির সমান মুদ্রার ওজন	১০,২৪০ গ্রাম
১৩শ	দিনে	৪,০৯৬টির সমান মুদ্রার ওজন	২০,৪৮০ গ্রাম
১৪শ	দিনে	৮,১৯২টির সমান মুদ্রার ওজন	৪০,৯৬০ গ্রাম
১৫শ	দিনে	১৬,৩৮৪টির সমান মুদ্রার ওজন	৮১,৯২০ গ্রাম
১৬শ	দিনে	৩২,৭৬৮টির সমান মুদ্রার ওজন	১,৬৩,৮৪০ গ্রাম
১৭শ	দিনে	৬৫,৫৩৬টির সমান মুদ্রার ওজন	৩,২৭,৬৮০ গ্রাম
১৮শ	দিনে	১,৩১,০৭২টির সমান মুদ্রার ওজন	৬,৫৫,৩৬০ গ্রাম

৪৬ নং ছবি। অষ্টাদশতম মুদ্রা।

দ্বিতীয় কলমের সংখ্যাগুলোকে খুব সহজেই যোগ করে ফেলতে জানি আমরা (৯৪-৯৫ পৃষ্ঠার নিয়মটা এখানেও খাটবে)। যোগফলটা এখানে হচ্ছে ২,৬২,১৪৩। তেরেনতিয়াস কিন্তু চেয়েছিলেন ১০ লক্ষ দিনারী, অর্থাৎ ৫০ লক্ষ পেতলের মুদ্রা। তাহলে তিনি পেলেন

৫০,০০,০০০:২,৬২,১৪৩ ≈ ১৯ ভাগ।

৫৩. দাবাখেলার কাহিনী

দাবাখেলা — পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো খেলার একটা। খেলাটা আবিষ্কার হয়েছে বহু বহু শতাব্দী আগে। সুতরাং এর সম্বন্ধে যে অনেক কাহিনী থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী। আর কাহিনীগুলোর বেলায় যা হয়, সেগুলোর সত্যি-মিথ্যা জানা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এগুলির একটা বলছি তোমাদের। গল্পটা বুঝতে অবশ্য দাবা খেলতে জানা দরকার নেই: একটা ছক-কাটা বোর্ডে ৬৪টা খোপ থাকে, এটুকু জানলেই চলবে।

এক

পুরাবৃত্ত বলে, দাবাখেলাটা এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। একটা খেলায় যে কতরকম বুদ্ধির চাল দেওয়া যায় তা দেখে রাজা শেরাম খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

এর উদ্ভাবক তাঁরই একজন প্রজা জানতে পেরে, এই অপূর্ব আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার দেবেন ঠিক করে রাজা শেরাম তাঁকে তাঁর সামনে হাজির করতে আদেশ করলেন।

খুব সাদাসিধে পোশাক পরা এই লোকটির নাম ছিল সেসা। শিক্ষকতা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি। সেসা এসে উপস্থিত হলেন রাজার সামনে।

রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "আপনার অদ্ভুত আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার দিতে চাই আপনাকে।"

সেসা মাথা নুইয়ে নমস্কার জানালেন।

রাজা বললেন, "আপনার মনের যেকোন কামনা পূর্ণ করার মতো ধনসম্পদ আমার আছে। কী চাই আপনার তাই শুধু বলুন, তাই দেব আপনাকে।"

সেসা নীরব রইলেন।

রাজা উৎসাহ দিয়ে বললেন, "লজ্জার কী আছে? বলুন না কী চাই আপনার। আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে কোন ত্রুটিই হবে না।"

পণ্ডিত উত্তর করলেন, "মহারাজ, আপনার দয়ার সীমা নেই, কিন্তু একটু ভাবতে সময় দিন আমাকে। ভালভাবে চিন্তা করে কাল আমার প্রার্থনা জানাব আপনাকে।"

পরদিন অতি তুচ্ছ এক অনুরোধ জানিয়ে রাজাকে আশ্চর্য করে দিলেন সেসা।

তিনি বললেন, "প্রভু, দাবার ছকের প্রথম ছকটার জন্য এক দানা গম পেতে চাই আমি।"

"সাধারণ এক দানা গম?" রাজা যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

"হ্যাঁ প্রভু, দ্বিতীয়টার জন্য দুটো, তৃতীয়টার জন্য চারটে, চতুর্থটার জন্য আটটা, পঞ্চমটার জন্য ১৬টা, ষষ্ঠটার জন্য ৩২টা..."

বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন রাজা, "আচ্ছা, আচ্ছা, দাবার ৬৪টা ছকের
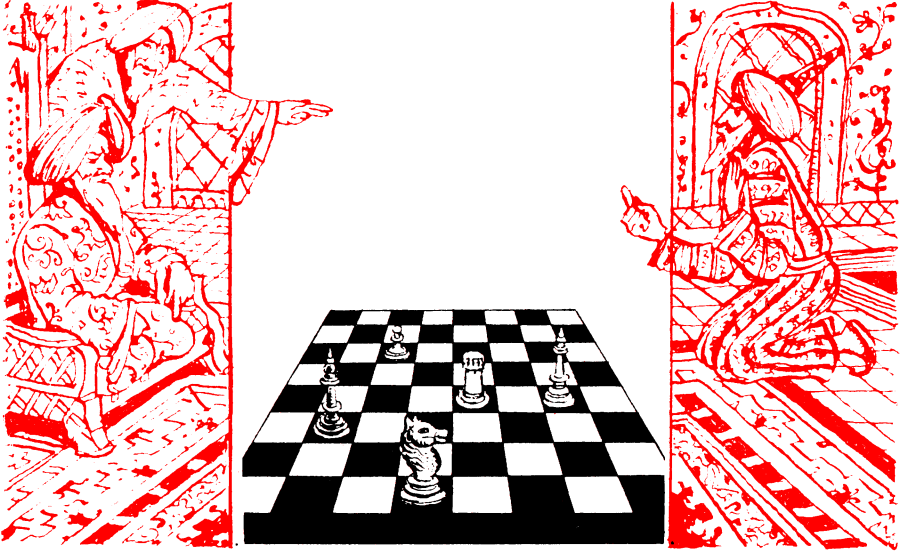
৪৭ নং ছবি। 'দ্বিতীয় ছকটির জন্য দুটি দানা দেবার **আদেশ করুন।'**

জন্যই আপনার ইচ্ছেমতো গমের দানা পাবেন আপনি। প্রতিদিন তার আগের দিনের চাইতে দ্বিগুণ, এই তো। কিন্তু জেনে রাখুন আপনার প্রার্থনাটা ঠিক আমার দেবার ইচ্ছের উপযুক্ত হল না। এইরকম একটা নগণ্য পুরস্কার প্রার্থনা করে আপনি আমাকে অসম্মান করলেন। সত্যি বলতে কি, একজন শিক্ষক হিসেবে রাজার উদারতাকে আরও একটু বেশী সম্মান দেখাতে পারতেন আপনি। আপনি যান! আমার ভৃত্যরা আপনার গমের থলি পেঁছে দেবে।"

হেসে বেরিয়ে গেলেন সেসা। তারপর তোরণের কাছে তাঁর পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দুই

খাবার সময় সেসার কথা মনে পড়ল রাজার। সেই 'বেকুব' আবিষ্কারক তার নগণ্য পুরস্কার পেয়ে গেছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

তাঁকে জানান হল, “প্রভু! আপনার আদেশ পালন করা হচ্ছে। কতগুলো গমের দানা তিনি পাবেন, তা পণ্ডিতরা হিসেব করছেন।”

রাজা ভুরু কোঁচকালেন। এত ধীরে ধীরে তাঁর আদেশ পালন করা হচ্ছে, এতে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি।

রাতে শোবার আগে আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি, সেসাকে তাঁর গমের থলিটা দেওয়া হয়েছে কিনা।

উত্তর শুনলেন, “প্রভু, আপনার হিসেবনবীশরা হিসাব করে চলেছেন একটানা, তাঁরা আশা করছেন সকালের আগেই হিসেবটা শেষ হবে।”

রেগে উঠে প্রশ্ন করলেন রাজা, “এরা এত দেরি করছে কেন? আমার ঘুম ভাঙবার আগেই সেসাকে যেন কড়ায় ক্রান্তিতে সব শোধ করে দেওয়া হয়। একটা দানাও যেন বাকি না থাকে। আমি দু’বার আদেশ দিই না!’

সকালবেলায় রাজাকে বলা হল, রাজসভার প্রধান হিসেবনবীশ দেখা করতে চেয়েছেন।

রাজা তাঁকে আসতে আদেশ করলেন।

রাজা শেরাম প্রশ্ন করলেন তাঁকে, “আপনার দরকারী কথা শোনবার আগে, সেসাকে তাঁর প্রার্থনা মতো নগণ্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কিনা, সেটাই জানতে চাই।”

বুড়ো পণ্ডিত উত্তর করলেন, “সেজন্যই তো এত ভোরে আপনার সামনে আসতে সাহস করেছি। সেসার প্রার্থনা মতো গমের দানার সংখ্যাটা বের করতে একটানা খেটেছি আমরা। সে একটা বিরাট...”

অধৈর্য হয়ে তাঁকে বাধা দিলেন রাজা, “হিসেবটা যত বিরাটই হোক না কেন, আমার শস্যের গোলাগুলো থেকে সহজেই তা দেওয়া যাবে। তাঁকে এই পুরস্কার দেব কথা দিয়েছি। আর তা দিতেই হবে...”

“মহারাজ, সেসার প্রার্থনা পূর্ণ করা আপনার ক্ষমতার বাইরে। সেসা যা চেয়েছেন তত দানা আপনার গোলায় নেই। আপনার সমস্ত রাজ্যেও ততটা দানা নেই। সত্যি বলতে কি সারা পৃথিবীতেও নেই। যদি আপনার কথা রাখতেই হয় তাহলে সমস্ত সাগর ও মহাসাগরের জল ছেঁচে, উত্তরের মরুভূমিগুলোর তুষার আর বরফ গলিয়ে ফেলে সারা পৃথিবীর সমস্ত জমিতে গমের চাষ করতে আদেশ করুন। যদি এই সমস্তটা জমিতেই গমের আবাদ করা যায় তাহলে হয়ত সেসাকে দেবার মতো গমের দানা পাওয়া যাবে।”

অবাক বিস্ময়ে পণ্ডিতের কথা শুনছিলেন রাজা।

"কত দানা?" চিন্তান্বিতভাবে বললেন তিনি।

পণ্ডিত উত্তর করলেন, "মহারাজ, সংখ্যাটা ১,৮৪,৪৬,৭৪,৪০,৭৩,৭০, ৯৫,৫১,৬১৫!"

তিন

গল্পটা হল এই। সত্যিই এরকম ঘটেছিল কিনা তা আমরা জানি না। কিন্তু পুরস্কারটা যে এইরকমই একটা সংখ্যায় দাঁড়াবে তা বোঝা কিছু কঠিন নয়। একটু ধৈর্য ধরে আমরাই হিসেবটা কষে ফেলতে পারি।

১ থেকে শুরু করে ১, ২, ৪, ৮ ইত্যাদি সংখ্যাগুলো যোগ করতে হবে। ২-এর ৬৩তম ঘাত যত সেটাই হল ৬৪তম ছকের জন্য আবিষ্কারকের প্রাপ্যের সমান। $২^{৬৪}$-এর থেকে ১ বিয়োগ করলেই খুব সহজে শস্যদানার সংখ্যাটা পেয়ে যাব আমরা। এর অর্থ হল ২-কে ২ দিয়ে ৬৪ বার গুণ করতে হবে:

২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ইত্যাদি ৬৪ বার।

হিসেবের সুবিধার জন্য এই ৬৪টি উৎপাদককে আমরা ৬টা ভাগে ভাগ করব, প্রতিভাগে থাকবে ১০টা করে ২, সবচেয়ে শেষের ভাগে থাকবে ৪টা ২। $২^{১০}$-এর ফল হল ১০২৪ আর $২^{৪}$ **হল ১৬।** তাহলে যে উত্তরটা আমরা চাই তা দাঁড়াচ্ছে:

১০২৪ × ১০২৪ × ১০২৪ × ১০২৪ × ১০২৪ × ১০২৪ × ১৬

১০২৪-কে ১০২৪ দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই ১০,৪৮,৫৭৬। এখন আমাদের বের করতে হবে

১০,৪৮,৫৭৬ × ১০,৪৮,৫৭৬ × ১০,৪৮,৫৭৬ × ১৬

এর থেকে ১ বিয়োগ করলেই শস্যের এই সংখ্যাটা পেয়ে যাব আমরা:

১,৮৪,৪৬,৭৪,৪০,৭৩,৭০,৯৫,৫১,৬১৫

এই বিরাট সংখ্যাটা সম্বন্ধে ঠিকঠিক ধারণা করতে হলে ভেবে দেখ শস্যগুলো রাখতে কত বড় গোলার দরকার হবে? আমরা জানি যে এক ঘন মিটার গমের ভেতর থাকে ১,৫০,০০,০০০ দানা। তাহলে দাবাখেলা যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর ইচ্ছেমতো পুরস্কারটা রাখতে হলে ১,২০,০০,০০,০০,০০,০০০ ঘন মিটার বা ১২,০০০ ঘন কিলোমিটারের কাছাকাছি আয়তনের গোলা দরকার। যদি এমন একটা গোলাঘর হয় যা ৪ মিটার উঁচু আর পাশে ১০ মিটার, তাহলে এর দৈর্ঘ্য হবে ৩০ কোটি কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের যা দূরত্ব তার দ্বিগুণ।

রাজা সেসার প্রার্থনা রাখতে পারলেন না। কিন্তু অংকে একটু মাথা থাকলেই তিনি এমন বিরাট পুরস্কার দেওয়াটাকে এড়িয়ে যেতে পারতেন। সেসাকেই একটি একটি করে দানা গুনে নিয়ে যেতে বললেই চলত।

সত্যিই সেসা যদি সারা দিনরাত্রি একেবারে না থেমে শস্যের দানা গুনে যেতেন, প্রতিটি দানা গুনতে যদি তাঁর সময় লাগত এক সেকেন্ড, তাহলে প্রথম দিনে তিনি গুনতেন ৮৬,৪০০টা দানা। দশ লক্ষ শস্যদানা ১০ দিনের কমে গুনতে পারতেন না। এক ঘন মিটারে যতটা গম ধরে তা গুনতে তাঁর লাগত প্রায় ছয় মাস। একবারও না থেমে ১০ বছর ধরে গুনে গেলে তিনি ৫৫০ বুশেল গোনা শেষ করতেন। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, সেসা যদি শস্য গোনার কাজে তাঁর জীবনের বাকি সমস্ত দিনগুলিও লাগাতেন তাহলেও পুরস্কারের একটা নগণ্য অংশই পেতেন তিনি।

৫৪. দ্রুত বংশবিস্তার

একটা পাকা পাপিতে থাকে ছোট ছোট বীজ, তাদের সবকটা থেকেই গজাতে পারে নতুন গাছ। যদি সবগুলো বীজকেই বুনে দেওয়া যায়, আর তা থেকে গাছ গজায় তাহলে মোট কত গাছ হবে? এটা বের করতে হলে জানতে হবে প্রত্যেকটা পাপিতে কতগুলো করে বীজ আছে। কাজটা খুবই একঘেয়ে। কিন্তু এর ফলটা এত মজার যে ধৈর্য ধরে হিসেবটা নিখুঁতভাবে করে ফেললে সময়টা নষ্ট হবে না। প্রথমেই দেখতে পাবে যে প্রত্যেকটা পাপি-ফলে গড়ে ৩০০০ করে বীজ থাকে।

তারপর? তারপরেই দেখতে পাবে যে এই পাপি গাছের চারপাশে যদি যথেষ্ট জমি থাকে, তাহলে প্রতিটি বীজ থেকেই গাছ হবে, আর আগামী গ্রীষ্মকালেই আমরা পেয়ে যাব ৩০০০টা পাপি গাছ। মাত্র একটা পাপি থেকে হবে পুরো এক পাপি বাগান।

তারপর কি দাঁড়াবে সেটা দেখা যাক। এই ৩০০০ পপি গাছের প্রত্যেকটিতেই অন্তত একটা করে পপি-ফল পাওয়া যাবে (আরও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক), আর তাতে থাকবে ৩০০০টা করে বীজ। এগুলো গজালে প্রত্যেকটি থেকে হবে ৩০০০টা নতুন চারা। তাহলেই দ্বিতীয় বছরের শেষে আমরা পাব কমপক্ষে

৩০০০ × ৩০০০ = ৯০,০০,০০০টা গাছ

এখন হিসেব করা খুবই সহজ যে তৃতীয় বছরের শেষে আমাদের একটিমাত্র পপির বংশধরের সংখ্যা দাঁড়াবে:

৯০,০০,০০০ × ৩০০০ = ২৭,০০,০০,০০,০০০

চার বছরের শেষে

২৭,০০,০০,০০,০০০ × ৩০০০ = ৮,১০,০০,০০,০০,০০,০০০

পাঁচ বছরের শেষে সমস্ত পৃথিবীতেও এই পপি গাছের স্থানসংকুলান হবে না, তাদের সংখ্যা তখন দাঁড়াবে:

৮,১০,০০,০০,০০,০০,০০০ × ৩০০০ = ২,৪৩,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০

আর সমস্ত মহাদেশ এবং দ্বীপগুলোর আয়তন নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর পরিধি হল মাত্র ১৩,৫০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা ১৩,৫০,০০,০০,০০,০০,০০০ বর্গ মিটার।

যতগুলো পপি গাছ এ সময়ের মধ্যে গজাতে পারবে জায়গাটা তার প্রায় ২০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

দেখতে পাচ্ছ, যদি সমস্ত পপি বীজ থেকেই চারা হয়, তাহলে এক বর্গ মিটারে ২০০০ চারা হিসেবে পাঁচ বছরের ভেতরই একটামাত্র পপির বংশ সারা পৃথিবীর মাটি ছেয়ে ফেলবে। ছোট্ট পপি বীজটায় এমন একটা দানবীয় সংখ্যা লুকিয়ে আছে, তাই না?

৪৮ নং ছবি। ডান্ডেলিয়ন ফুলে বছরে বীজ হয় প্রায় ১০০ টা করে।

অল্প বীজ হয় এমন গাছ দিয়েও ব্যাপারটা দেখা যেতে পারে। ফল তাতে সমানই হবে। শুধু এক্ষেত্রে সারা

পৃথিবীর মাটি ছেয়ে ফেলতে গাছগুলোর পাঁচ বছরের কিছু বেশী সময় লাগবে। যেমন ধরা যাক, ডান্ডেলিয়ন ফুলের কথা। এতে বছরে গড়ে বীজ হয় ১০০টা*। সমস্ত বীজ থেকেই যদি গাছ গজায় তাহলে আমরা পাচ্ছি:

১ম	বছরের শেষে	১টি চারা
২য়	বছরের শেষে	১০০টি চারা
৩য়	বছরের শেষে	১০,০০০টি চারা
৪র্থ	বছরের শেষে	১০,০০,০০০টি চারা
৫ম	বছরের শেষে	১০,০০,০০,০০০টি চারা
৬ষ্ঠ	বছরের শেষে	১০,০০,০০,০০,০০০টি চারা
৭ম	বছরের শেষে	১০,০০,০০,০০,০০,০০০টি চারা
৮ম	বছরের শেষে	১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০টি চারা
৯ম	বছরের শেষে	১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০টি চারা

সমস্ত পৃথিবীতে যত বর্গ মিটার জমি আছে তার ৭০ গুণেরও বেশী জমি দরকার এই চারাগুলোর জন্য।

তাহলে, নয় বছর বাদে প্রতি বর্গ মিটারে ৭০টি হিসেবে সমস্ত মহাদেশগুলি ঢাকা পড়ে যাবে ডান্ডেলিয়ন ফুলে।

তাহলে, এমনটা হয় না কেন? কারণ খুবই সোজা। একটা বিরাট সংখ্যার বীজ গাছ গজাবার আগেই নষ্ট হয়ে যায়, হয় তারা পড়ে অনুর্বর জমিতে, না হয় ঢাকা পড়ে যায় অন্য গাছের নীচে, অথবা যদি শেকড় গজায় জন্তু-জানোয়ার নষ্ট করে ফেলে তাদের। বীজ আর চারাগুলো যদি এভাবে গাদায় গাদায় নষ্ট না হত তাহলে তারা অতি অল্প দিনের ভেতর ছেয়ে ফেলত আমাদের এই গ্রহকে।

শুধু উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই নয়, প্রাণীর ক্ষেত্রেও এমনই ঘটে। এরা যদি মরে না যেত, তাহলে আজ হোক বা কালই হোক মাত্র একজোড়া প্রাণীর সন্তানসন্ততিতেই গিজগিজ করত পৃথিবী। মৃত্যু যদি প্রাণীর বৃদ্ধিকে রোধ না করত, তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াত তার জ্বলন্ত উদাহরণ হল পঙ্গপালের বিস্তীর্ণ এলাকা ছেয়ে ফেলা। কয়েক বছর বাদেই আমাদের মহাদেশগুলো ছেয়ে যেত জঙ্গল আর তৃণভূমিতে, এবং তার ভেতর গিজগিজ করত প্রাণী, তারা একটু জায়গার জন্য মারামারি করত নিজেদের ভেতর। সাগরগুলোতে মাছ এত বেড়ে যেত যে নৌকো চালাবার প্রশ্নই আসত

---

* ২০০ বীজ হয় এমন ডান্ডেলিয়ন ফুলও পাওয়া যায় — তবে তা খুব বিরল।

না। আর আমরাও দিনের আলো আর দেখতে পেতাম না, কারণ অসংখ্য পাখি আর পতঙ্গ ঘুরে বেড়াত আকাশে।

সাধারণ মাছির উদাহরণটাই নেওয়া যাক। সে এক অদ্ভুত বিরাট সংখ্যা। ধরে নেওয়া যাক, প্রতিটি স্ত্রী মাছি ১২০টি করে ডিম পাড়ে; গ্রীষ্মকালের মধ্যে এই ১২০টি ডিম থেকে জন্ম নিতে পারে মাছিদের ৭ পুরুষ, এদের ভেতর অর্ধেক আবার স্ত্রী মাছি। ধরে নেওয়া যাক ১৫ এপ্রিল তারিখে জন্মাল প্রথম ডিমটা, আর তার ২০ দিনের মধ্যেই স্ত্রী মাছিগুলো ডিম পাড়বার মতো বড় হল। দৃশ্যটা এইরকম দাঁড়াচ্ছে তাহলে:

১৫ এপ্রিল একটা স্ত্রী মাছি ডিম পাড়ল। মে মাসের প্রথম দিকে তা থেকে হল ১২০টা মাছি। তাদের ভেতর ৬০টাই স্ত্রী মাছি।

৫ মে তারিখে প্রত্যেকটি স্ত্রী মাছি ১২০টা ডিম পাড়বে, আর মাসের মাঝামাঝি তা থেকে হবে ৬০ × ১২০ = ৭২০০টা মাছি, এদের ভেতর ৩৬০০টা স্ত্রী মাছি।

২৫ মে এই ৩৬০০ স্ত্রী মাছির প্রত্যেকে ১২০টা করে ডিম পাড়বে, আর জুন মাসের প্রথম দিকে তা থেকে হবে ৩৬০০ × ১২০ = ৪,৩২,০০০টা মাছি, তার ভেতরে ২,১৬,০০০টা স্ত্রী মাছি।

১৪ জুন প্রত্যেক স্ত্রী মাছি ১২০টা করে ডিম পাড়বে, মাসের শেষে ১,২৯,৬০,০০০টা স্ত্রী মাছি সহ মোট মাছি হবে ২,৫৯,২০,০০০টা।

৫ জুলাই ১,২৯,৬০,০০০টা স্ত্রী মাছি ১২০টা করে করে ডিম পাড়বে, তা থেকে হবে ১,৫৫,৫২,০০,০০০টা মাছি (৭৭,৭৬,০০,০০০টা স্ত্রী মাছি)।

২৫ জুলাই হবে ৯৩,৩১,২০,০০,০০০টা মাছি। তাদের ভেতর ৪৬,৬৫,৬০,০০,০০০টা হবে স্ত্রী মাছি।

১৩ আগস্ট সেই সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৫৫,৯৮,৭২,০০,০০,০০০, এদের ভেতর ২৭,৯৯,৩৬,০০,০০,০০০টা মাছি হবে স্ত্রী-জাতের।

১ সেপ্টেম্বর জন্মাবে ৩৫,৫৯,২৩,২০,০০,০০,০০০টা মাছি।

একটা গ্রীষ্ম ঋতুতে যত মাছি জন্মাতে পারে, তারা যদি কেউ না মরে যায় বা তাদের আর কিছু না ঘটে, সেই বিরাট সংখ্যক মাছির একটা পরিষ্কার ছবি দিচ্ছি। দেখা যাক, তারা সার বেঁধে দাঁড়ালে কী হয়। একটা মাছি ৫ মিলিমিটার লম্বা, তাহলে এই লাইনটা হবে ২,৫০,০০,০০,০০০ কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের যা দূরত্ব তারও ১৮ গুণ বেশী (ইউরেনাস গ্রহটার পৃথিবী থেকে যতটা দূরত্ব, প্রায় ততটা)।
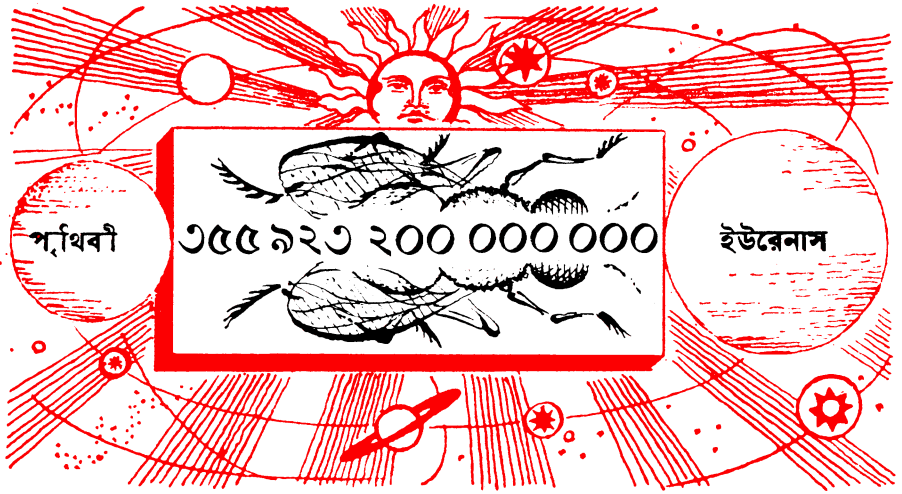
৪৯ নং ছবি। একটি গ্রীষ্মে মাছির যে বংশবৃদ্ধি হয় সেগুলিকে ইউরেনাস গ্রহ থেকে পৃথিবীর যা দূরত্ব সেই দৈর্ঘ্যের রেখায় পাশাপাশি বসানো যায়।

সবশেষে, উপযুক্ত অবস্থায় প্রাণীর অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধির কয়েকটা ঘটনা বললে মন্দ হবে না।

মার্কিন মুলুকে আগে কোন চড়ুই ছিল না। সেখানে তাদের আমদানি হয় পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্য। তোমরা তো জানই যে চড়ুই শুঁয়োপোকা আর ফলের বাগান এবং সব্জি ক্ষেত ধ্বংসকারী অন্যান্য পোকাও খেয়ে থাকে। বোধহয় চড়ুইদের ভাল লেগে গিয়েছিল ওই দেশটা, ওদের নষ্ট করবার মতো কোনো প্রাণী বা শিকারী পাখি ছিল না সেখানে। ওদের বংশ বাড়তে লাগল দ্রুতগতিতে। পোকামাকড়ের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে গেল। কিন্তু চড়ুইদের সংখ্যা হুহু করে বেড়ে উঠল। এরপর এমন একটা সময় এল যখন তাদের জন্য আর উপযুক্ত সংখ্যায় পিঁপড়েও থাকল না। তারা তখন শস্য নষ্ট করতে শুরু করল।* রীতিমতো একটা যুদ্ধ ঘোষণা

---

* হাওয়াই দ্বীপে তারা অন্য সব ছোট পাখিদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

৫০ নং ছবি। সেক্রেটারি পাখি — সাপের দুশমন।

করা হল চড়ুইদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এতে এত খরচ হল যে শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন করে বাইরে থেকে প্রাণী আমদানি বন্ধ করা হল।

আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইউরোপীয়ানদের অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের আগে সেখানে কোন খরগোস ছিল না। ১৮ শতাব্দীর শেষদিকে প্রথম খরগোস আমদানি হল সেখানে। খরগোসদের বংশ সেখানে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল। কারণ খরগোসদের খেয়ে ফেলার মতো কোন শিকারী জন্তু ছিল না সেখানে। অল্পদিনের ভেতরই খরগোসের দল অস্ট্রেলিয়া ছেয়ে ফেলে ফসল নষ্ট করতে শুরু করল। উৎপাতটা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। খরগোসদের বিনষ্ট করতে বিপুল ব্যয় হয়ে গেল। সাধারণ মানুষের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যবস্থাই শেষে এই ক্ষয়ক্ষতিকে রোধ করল। আরও পরে প্রায় এই ধরনেরই ঘটনা ঘটেছিল ক্যালিফোর্নিয়াতে।

তৃতীয় গল্পটা এসেছে জামাইকা থেকে। সেখানে ছিল বহু বিষধর সাপ। ওদের ধ্বংস করার জন্য সেক্রেটারি পাখি আনা ঠিক হল। সাপের ভয়ানক দুশমন বলে নাম আছে এদের। সাপের সংখ্যাটা কমে গেল ঠিকই, কিন্তু যে মেঠো ইঁদুরগুলিকে সাপ খেয়ে ফেলত তারা বাড়তে লাগল। ইঁদুরগুলো আখের আবাদের এত ক্ষতি করল যে কৃষকরা এদের বিনাশ করে ফেলা ঠিক করে চার জোড়া ভারতীয় বেজী নিয়ে এল — এরা ইঁদুরের শত্রু বলে পরিচিত। ওদের যথেচ্ছভাবে বাড়তে দেওয়া হল। আর অল্প সময়ের ভেতরই দ্বীপটা ছেয়ে ফেলল ওরা। বছর দশেকের ভেতরই প্রায় সমস্ত ইঁদুরকেই উৎখাত করে ফেলল তারা। কিন্তু তা করতে গিয়ে ওদের আর খাবারের বাছবিচার রইল না: কুকুরের বাচ্চা, মেষশাবক, শুয়োর ছানা আর মুরগীগুলোকে তারা আক্রমণ করতে লাগল, নষ্ট করে ফেলল ডিমগুলোকে। তাদের সংখ্যা আরও বেড়ে গেলে তারা ফলের বাগিচা, গমের ক্ষেত আর আবাদের ভেতর ঢুকে পড়ল স্রোতের মতন। পুরনো এই বন্ধুদের ওপর দ্বীপবাসীরা তখন খাপ্পা হয়ে উঠল, কিন্তু ক্ষতিরোধ করতে শুধু আংশিকভাবেই সফল হল তারা।

৫৫. বিনা পয়সার ভোজ

মাধ্যমিক পরীক্ষা-উত্তীর্ণ দশজন তরুণ ঠিক করল একটা রেস্তোরাঁয় ভোজের উৎসব করবে তারা। সবাই এসে পোঁছবার পর যখন প্রথম খাবারের থালা পরিবেশন করা হল, তখন কোন আসনে কে বসবে এই নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হল। একজন প্রস্তাব করল — নামের অক্ষর অনুযায়ী বসা যাক। অন্যরা বসতে চাইল বয়েস হিসেবে। আবার অন্য সকলে বলল বসতে হবে উচ্চতা অনুযায়ী। তাদের মধ্যে একজন আবার প্রস্তাব করল যে পরীক্ষা পাশের নম্বর অনুসারে বসা হোক। তর্কটা চলতে লাগল। খাবার জুড়িয়ে জল হয়ে গেল তবু কেউই বসল না। পরিবেশক মীমাংসা করে দিল সমস্যাটার।

সে বলল, “তরুণ বন্ধুরা, তর্কটা থামিয়ে আমার কথা শুনুন। যে যেখানে আছেন সেখানেই বসে আমার বক্তব্যটা শুনুন।

“আপনারা এখন যেভাবে বসে আছেন, আপনাদের কেউ সেটা লিখে নিন। কাল আবার এসে অন্য কোনওভাবে বসুন — যতদিন সবরকমভাবে বসা না হচ্ছে এভাবে আসতে থাকুন। এখন যেভাবে বসে আছেন আবার যখন সেভাবে বসবার সময় আসবে, তখন আমি কথা দিচ্ছি, প্রতিদিন
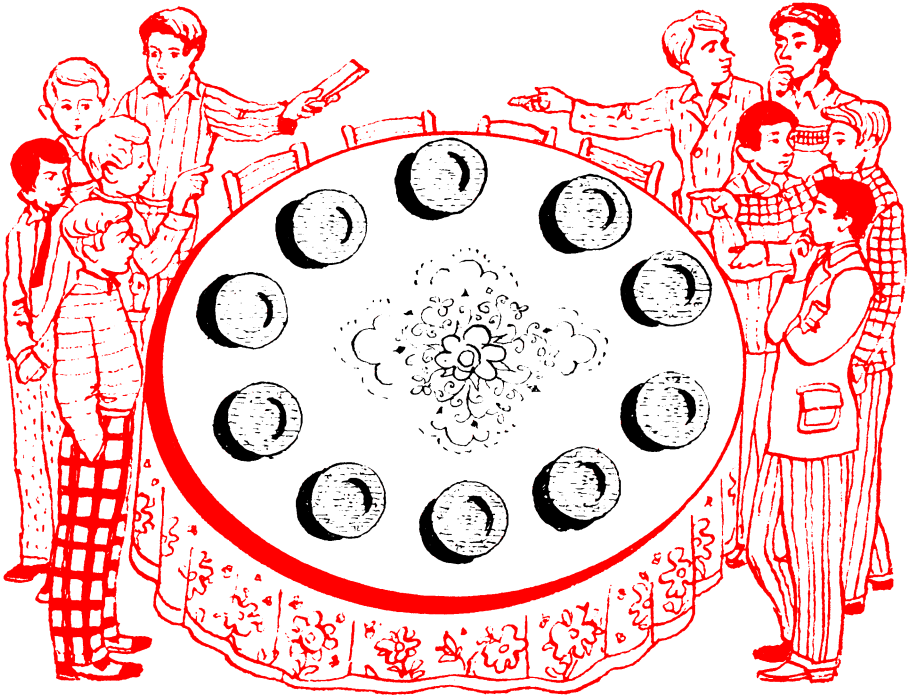
৫১ নং ছবি। 'যে যেখানে আছেন সেখানেই বসে...।'

আপনারা যে কোনও ভাল খাবার খেতে চাইবেন, তা আমি বিনা পয়সায় খাওয়াব আপনাদের।"

প্রস্তাবটা খুবই লোভনীয়। ঠিক হল প্রতিদিন তারা রেস্তোরাঁয় আসবে আর যতরকমভাবে বসা সম্ভব সবরকমে বসা হবে, যাতে করে পরিবেশকের কথামতো বিনা পয়সায় খাবার খাওয়া যায়।

সে দিনটা কিন্তু আর কোনদিনই এল না। তার কারণ এই নয় যে পরিবেশক তার কথা রাখতে পারল না। কারণটা হল: টেবিলে দশজন মানুষ বসবার অনেক অনেক ধরন ছিল। সত্যি বলতে কি ৩৬,২৮,৮০০ ধরনে তা হতে পারত। তোমরা দেখতে পাবে, সবরকমভাবে বসে দেখতে গেলে প্রায় ১০,০০০ বছর লেগে যাবার কথা।

দশজন মানুষ যে এত ধরনে একটা টেবিলে বসতে পারে তা হয়ত বিশ্বাস করছ না তোমরা। নিজেরাই হিসেব করে দেখতে পার।

বিন্যাসের সংখ্যাটা কত হতে পারে সেই হিসেবটা করতে হবে সবচেয়ে আগে। এটাকে যথা সম্ভব সহজ করার জন্য তিনটে জিনিস নিয়ে শুরু করা যাক। এদের নাম দিচ্ছি আমরা 'ক', 'খ' আর 'গ'।
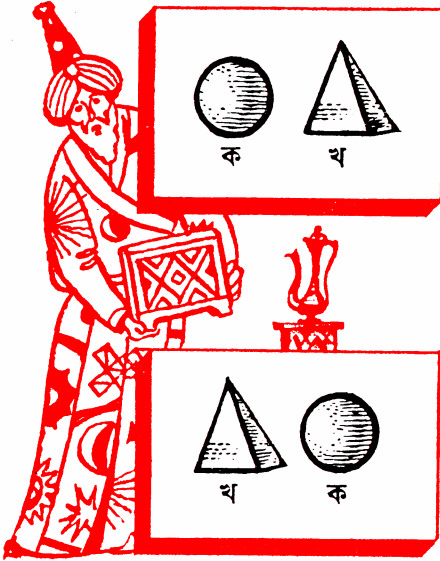
৫২ নং ছবি। দু'টি জিনিসকে মাত্র দু'ভাবে বসানো যায়।

আমাদের যা বের করতে হবে তা হল এই জিনিসগুলো কত বিভিন্ন ধরনে সাজানো যায়। প্রথমে গ-কে আলাদা করে রেখে মাত্র দুটো জিনিস নিয়েই এটা করা যাক। আমরা দেখছি যে এদের সাজাবার মাত্র দুটিই উপায় আছে।

এখন এই দুটোর প্রত্যেকটার সঙ্গে গ যোগ করছি। এটা করা যায় তিনটে বিভিন্নভাবে:

(১) গ-কে আমরা ঐ জোড়াটার পেছনে বসাতে পারি;

(২) সামনে বসাতে পারি;

(৩) দুটো জিনিসের মাঝখানে বসাতে পারি।

দেখা যাচ্ছে, আর কোনভাবে এটাকে বসানো যায় না। এখন আমাদের আছে দুই জোড়া জিনিস, ক খ আর খ ক, তাহলে দাঁড়াচ্ছে: জিনিসগুলোকে সাজা-বার ২ × ৩ = ৬টা উপায় হতে পারে।

৫৩ নং ছবিতে এই সাজানোটা দেখানো হয়েছে।

ক, খ, গ আর ঘ—এই চারটে জিনিস নিয়ে শুরু করা যাক। এখনকার মতো আমরা ঘ-কে আলাদা করে রেখে তিনটে জিনিস নিয়েই সবরকমভাবে সাজাব। ছয় রকমভাবে তা করা যায় আমরা ইতিমধ্যেই তা জেনেছি। তিনটে জিনিসের ছয় রকমভাবে সাজানোতে কতরকমভাবে চতুর্থ জিনিস ঘ-কে বসানো যায়? সেটা দেখা যাক। আমরা ঘ-কে

(১) তিনটে জিনিসের আগে বসাতে পারি;

(২) পরে বসাতে পারি;

(৩) প্রথম এবং দ্বিতীয় জিনিসের মাঝখানে বসাতে পারি;

(৪) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জিনিসটার ভেতর বসাতে পারি।
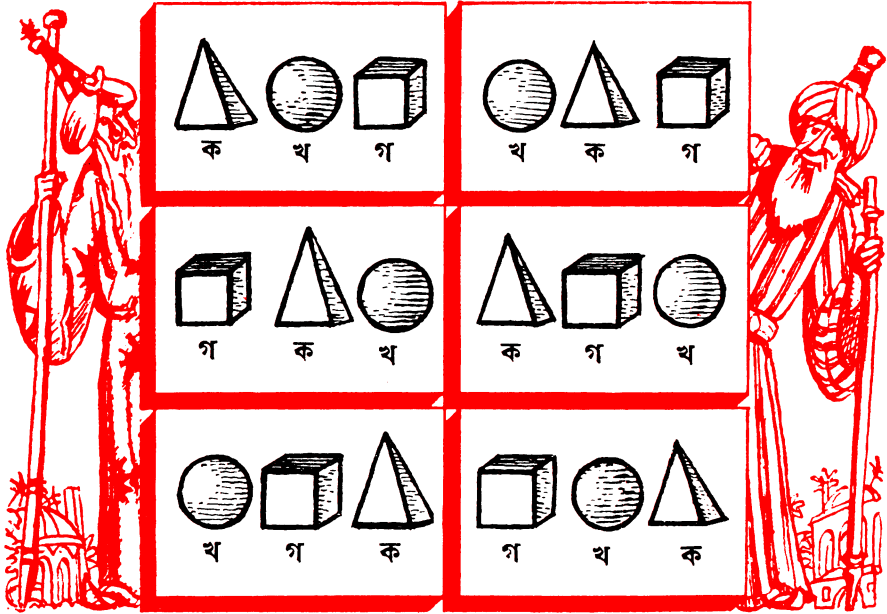
৫৩ নং ছবি। তিনটি জিনিস রাখা যায় ছয় রকম ভাবে।

তাহলে, আমরা পাচ্ছি: ৬ × ৪ = ২৪ রকমের সাজানো যায়।

যেহেতু ৬ = ২ × ৩ আর ২ = ১ × ২, তাহলে সবরকমের বিন্যাসের সংখ্যাটা এভাবে লেখা যায়:

$$১ \times ২ \times ৩ \times ৪ = ২৪$$

এখন যদি ঐ একই নিয়মে পাঁচটা জিনিসকে সাজানো যায়, তাহলে আমরা পাব:

$$১ \times ২ \times ৩ \times ৪ \times ৫ = ১২০$$

ছয়টা জিনিস হলে

১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫ × ৬ = ৭২০ ইত্যাদি।

দশজন তরুণের কাহিনীতে আবার ফিরে আসা যাক। এক্ষেত্রে একটু কষ্ট করে যদি হিসেবটা করি, তাহলে যত ধরনে তাদের বসানো যায় তার সংখ্যা হল:

$$১ \times ২ \times ৩ \times ৪ \times ৫ \times ৬ \times ৭ \times ৮ \times ৯ \times ১০$$

এর উত্তর হবে:

$$৩৬,২৮,৮০০$$

হিসেবটা আরও জটিল হত যদি এদের অর্ধেক হত মেয়ে, আর তারা প্রত্যেকে পালা করে প্রত্যেকটি ছেলের সঙ্গে বসতে চাইত। যদিও এক্ষেত্রে বসার ব্যবস্থার সংখ্যাটা হত আরও ছোট, তাহলেও হিসেবটা হত কঠিন।

ছেলেদের একজনকে, সে যেখানে বসতে চায় সেখানেই তাকে বসতে দেওয়া যাক। অন্য চারজন, তাদের মাঝে মাঝে মেয়েদের জন্য আসন খালি রেখে বসতে পারে $১ \times ২ \times ৩ \times ৪ = ২৪$ রকমভাবে। চেয়ার আছে দশটা, তাহলে প্রথম ছেলেটি বসতে পারে দশটা বিভিন্ন জায়গায়। তাহলে $১০ \times ২৪ = ২৪০$ রকম উপায়ে ছেলেরা টেবিলের চারপাশে বসতে পারছে।

ছেলেদের মাঝে মাঝে খালি জায়গাগুলোতে মেয়েরা কতরকমভাবে বসতে পারে? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে $১ \times ২ \times ৩ \times ৪ \times ৫ = ১২০$ রকমভাবে। ছেলেদের ২৪০ ধরনের বসার সঙ্গে মেয়েদের ১২০ ধরনের বসাকে একত্র করলেই আমরা বসবার সম্ভাব্য সংখ্যাটা পেয়ে যাব। তা হল:

$$২৪০ \times ১২০ = ২৮,৮০০$$

এটা অবশ্য ছেলেদের ৩৬,২৮,৮০০ উপায়ে বসার সংখ্যার চেয়ে অনেক কম, আর তাতে ৭৯ বছরের কিছু কম সময় লাগবে। তার মানে হল, ছেলেরা যদি ১০০ বছর বয়স অবধি বাঁচে, তাহলে তারা বিনা পয়সায় খাওয়াটা পরিবেশকের কাছ থেকে না পেলেও পাবে তার উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে।

এখন কি করে বিন্যাসের সংখ্যাটা বের করতে হয় তা আমরা শিখেছি। তাহলে 'পনেরোর ধাঁধা'র বাক্সতে ঘুঁটি সাজাবার সংখ্যাটাও বের করতে

পারি আমরা*। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, এই খেলায় কোন খেলোয়াড়কে যতরকমের ধাঁধার মুখোমুখী হতে হবে তার আমরা সমাধান করতে পারব। এটা সহজেই দেখা যাচ্ছে যে কাজটা হল এই ১৫টা ঘুঁটিকে কতরকমে সাজানো যায় তা বের করা। এটা করতে হলে. আমরা জানি যে নীচের গুণটা করতে হবে:

১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫ × ৬ × ৭ × ৮ × ৯ × ১০ × ১১ ×
× ১২ × ১৩ × ১৪ × ১৫

উত্তর হল:

১৩,০৭,৬৭,৪৩,৬৫,০০০

এই বিরাট সংখ্যার ধাঁধাগুলির অর্ধেকই সমাধান করা যায় না। তাহলেই ৬০,০০০ কোটির উপর সমস্যা আছে যার কোনো সমাধান নেই। লোকেরা যে এটা সন্দেহও করে নি, তাতেই বোঝা যায় 'পনেরোর ধাঁধা'র জন্য তারা কেন এত পাগল হয়ে উঠেছিল।

এটাও দেখা যাক, যদি প্রতি সেকেন্ডে একটি করে ঘুঁটি সাজানো যেত, তাহলে সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে সাজাতে ৪০,০০০ বছরেরও বেশী লাগত। আর তাও হত যদি কেউ একেবারে না থেমে কাজটা করত।

সাজানোর ব্যাপারে আলোচনা প্রায় শেষ করে এনেছি আমরা। স্কুল-জীবনের একটা ধাঁধা এবার সমাধান করা যাক।

ধরা যাক একটা ক্লাশে ২৫ জন ছাত্র আছে। কতরকমভাবে বসানো যায় তাদের?

উপরের যে ধাঁধাটা বলা হল তা যারা ভাল করে বুঝেছ, এটা সমাধান করতে তাদের কোন মুস্কিল হবে না। যে কাজটা করতে হবে তা হল ২৫টা সংখ্যাকে এভাবে গুণ করতে হবে:

১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫ × ৬ × ... × ২৩ × ২৪ × ২৫

অনেক ব্যাপারকে সহজ করে করার অনেক উপায় আছে গণিতে। কিন্তু উপরে যেটা বলা হল, তার জন্য কোনও সোজা উপায় নেই। ঠিকভাবে এটাকে করার একটিমাত্রই উপায় আছে, তা হল সবগুলোকে গুণ করা।

---

* এক্ষেত্রে খালি ঘরটা সবসময়েই থাকবে ডানদিকের নিচের কোণে।

এর জন্য সময় বাঁচাবার উপায় যা আছে তা হল গুণকগুলিকে ঠিকমতো সাজানো। ফল হবে বিরাট। এতে থাকবে ২৬টে সংখ্যা। এটা এত অদ্ভুত বড় যে তা ধারণা করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

সংখ্যাটা হল:

১,৫৫,১১,২১,০০,৪৩,৩৩,০৯,৮৫,৯৮,৪০,০০,০০০

এ পর্যন্ত যত সংখ্যা আমরা দেখেছি তার ভেতর এটাই সবচাইতে বড়। এ জন্যই একে একটি 'দানবীয় সংখ্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এর সঙ্গে তুলনায় সমস্ত সমুদ্র আর মহাসাগরে যত জল বিন্দু আছে তাও অনেক কম।

৫৬. মুদ্রার যাদু

আমার মনে পড়ছে ছেলেবেলায় আমার দাদা আমাকে মুদ্রা দিয়ে একটা মজার খেলা দেখিয়েছিল। প্রথমে সে তিনটে প্লেটকে সারবন্দী করে সাজাল। তারপর বিভিন্ন মূল্যের পাঁচটা মুদ্রাকে বড় থেকে ছোট হিসেবে একটার উপর আর একটা রাখল (১ রুবল, ৫০ কোপেক, ২০ কোপেক, ১৫ কোপেক আর ১০ কোপেক* মুদ্রা)।

কাজটা হচ্ছে নীচের তিনটে নিয়ম মেনে মুদ্রাগুলোকে তৃতীয় প্লেটে চালান করা:

(১) একবারে মাত্র একটা মুদ্রা চালান করা যাবে; (২) ছোট মুদ্রার উপর বড় মুদ্রা বসানো চলবে না আর (৩) প্রথম দুটো নিয়মমাফিক মাঝের প্লেটটাকে সাময়িকভাবে ব্যবহার করা চলবে। কিন্তু সবশেষে মুদ্রাগুলোকে আগের মতো করে তৃতীয় প্লেটেই সাজাতে হবে।

দাদা বলল, "বুঝলে, নিয়মটা খুবই সহজ। এবার আরম্ভ কর।"

আমি ১০ কোপেক মুদ্রাটা নিয়ে তৃতীয় প্লেটে রাখলাম। তারপর ১৫ কোপেকটা নিয়ে রাখলাম মাঝের প্লেটে, তারপরই আটকে গেলাম আমি। ২০ কোপেক মুদ্রাটা কোথায় রাখব? এটা তো দুটো থেকেই বড়।

দাদা আমাকে দেখিয়ে দিতে এগিয়ে এল, "আচ্ছা, ১০ কোপেকের মুদ্রাটাকে ১৫ কোপেক মুদ্রার উপরে বসাও। তাহলেই ২০ কোপেক মুদ্রাটার জন্য তৃতীয় প্লেটটা খালি পাবে।"

* বিভিন্ন মাপের যেকোন পাঁচটা মুদ্রা দিয়ে খেলা চলতে পারে।

আমি তাই করলাম। কিন্তু আমার অসুবিধে এতেই শেষ হল না। ৫০ কোপেক মুদ্রাটা কোথায় রাখব? অল্পসময়ের ভেতরই উপায়টা পেয়ে গেলাম। ১০ কোপেক মুদ্রাটাকে রাখলাম প্রথম প্লেটে, ১৫ কোপেকটা রাখলাম তৃতীয়টাতে, তারপর ১০ কোপেককে চালান করলাম সেখানে। এবারে ৫০ কোপেক মুদ্রাকে দ্বিতীয় প্লেটে রাখা সম্ভব হল। তারপর অসংখ্য চাল দেবার পর রুবলের মুদ্রাটাকে প্রথম প্লেট থেকে সরাতে পারলাম। তারপরেই সবকটা এসে গেল তৃতীয় প্লেটে।

দাদা আমার এই সমাধানের কায়দাটাকে তারিফ করে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, মোট কতগুলো চাল দিলে তুমি?"

"জানি না, গুনি নি তো আমি!"

"আচ্ছা বেশ। হিসেব করা যাক। কিভাবে সবচেয়ে কম চাল দিয়ে এটা করা যায় তা জানতে খুব মজা লাগবে। ধরা যাক, আমাদের পাঁচটা না থেকে মাত্র দুটো মুদ্রাই ছিল: ১৫ আর ১০ কোপেক। তাহলে মোট কত চাল লাগবে তোমার?"

"তিনটে। ১০ কোপেক মুদ্রাটা যাবে মাঝের প্লেটে, ১৫ কোপেক মুদ্রা যাবে তৃতীয়টাতে, তারপর ১০ কোপেক মুদ্রাটা যাবে এর উপরে।"

"ঠিক, এবার এর সঙ্গে আর একটা মুদ্রা যোগ করা যাক। ২০ কোপেকের মুদ্রা যোগ করার পর দেখা যাক মুদ্রার থাকটা চালান করতে কয়টা চাল লাগবে আমাদের। আমরা জানি এটা করতে লাগবে তিনটে চাল। তারপর ২০ কোপেকের মুদ্রাটিকে আমরা চালান করলাম তৃতীয় প্লেটে। এই আর একটা দান। তারপর দ্বিতীয় প্লেটটা থেকে মুদ্রাদুটোকে চালান দেওয়া হল তৃতীয়টাতে। এই হল আরও তিনটে চাল। তাহলেই আমাদের দিতে হবে: ৩ + ১ + ৩ = ৭টা চাল।"

"চারটে মুদ্রার জন্য কটা চাল লাগবে তা হিসেব করে দেখা যাক," আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম। "প্রথমে ছোট তিনটে মুদ্রা চালান করলাম মাঝের প্লেটে। এতে হল সাতটা দান। তারপর ৫০ কোপেকের মুদ্রাটাকে সরিয়ে দিলাম তৃতীয় প্লেটে। এই হল আরও একটা চাল। সবশেষে ছোট মুদ্রা তিনটিকে তৃতীয় প্লেটে চালান হল। এই হল আরও সাতটা চাল। সবশুদ্ধ হবে: ৭ + ১ + ৭ = ১৫টা চাল।"

"চমৎকার! পাঁচটা মুদ্রায় কি হবে তাহলে?"

"এ তো সোজা: ১৫ + ১ + ১৫ = ৩১," আমি চটপট উত্তর করলাম।

"বাঃ, ব্যাপারটা বেশ ধরে ফেলেছ তো! আমি তোমাকে এটা করার

আরও একটা সোজা উপায় দেখাচ্ছি। ৩,৭,১৫ আর ৩১, যে যে সংখ্যা আমরা পেয়েছি সেগুলো ধরা যাক। এদের সবকটার অর্থ হল ২-কে ২ দিয়েই একবার বা বারবার গুণ করে তা থেকে ১ বিয়োগ দিলে যা হয়। এই দেখ না!"

তারপর আমার দাদা এই ছকটা লিখল:

৩ = ২ × ২ − ১
৭ = ২ × ২ × ২ − ১
১৫ = ২ × ২ × ২ × ২ − ১
৩১ = ২ × ২ × ২ × ২ × ২ − ১

"এবার বুঝতে পেরেছি আমি, যতটা মুদ্রা আমাকে চালান করতে হবে ২-কে ততবার ২ দিয়েই গুণ করলাম। তারপর তা থেকে বিয়োগ করলাম ১। এবার তাহলে মুদ্রার থাক সরাতে কতবার চাল দিতে হবে তা হিসেব করা শিখলাম। ধরা যাক, আমাদের আছে সাতটা মুদ্রা। ব্যাপারটা এইরকম হবে তাহলে:

২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ২ − ১ = ১২৮ − ১ = ১২৭।"

আমার দাদা বলে চলল, "তুমি তাহলে এই পুরনো খেলাটা শিখলে। আর একটামাত্র নিয়ম মনে রাখতে হবে তোমাকে: যদি মুদ্রার সংখ্যাটা
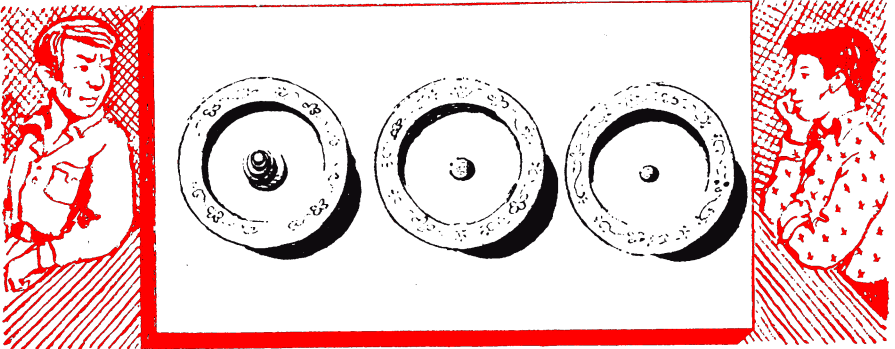
৫৪ নং ছবি। দাদা আমাকে একটা মজার খেলা দেখিয়েছিল।

বিজোড় হয় তাহলে প্রথম মুদ্রাটাকে রাখবে তৃতীয় প্লেটে, আর যদি জোড় হয় তাহলে প্রথম রাখবে দ্বিতীয় প্লেটে।”

আমি অবাক হয়ে বললাম, “খেলাটা কি সত্যিই পুরনো? আমি তো ভেবেছিলাম এটা তোমার নিজের!”

“না, আমি এটাকে মুদ্রা দিয়ে একটু আধুনিক করেছি মাত্র। খেলাটা খুবই পুরনো। সম্ভবত এটা ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। এর সঙ্গে একটা মজার গল্প জড়িয়ে আছে। বারাণসীতে একটা মন্দির আছে। শোনা যায় ব্রহ্মা যখন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন সেখানে রেখেছিলেন তিনটে হীরের কাঠি। তারই একটাতে পরালেন ৬৪টা সোনার আংটা। তার সবচেয়ে বড়টা ছিল একেবারে নীচে, আর ছোটটা সবার ওপরে। পুরোহিতদের সারা দিনরাত ঐ আংটাগুলোকে একটা কাঠি থেকে আর একটা কাঠিতে চালান করার কাজে ব্যস্ত থাকতে হত। তৃতীয় কাঠিটা এই কাজে সাহায্য করত, নিয়ম-কানুন ছিল ঠিক আমাদের মুদ্রার খেলার মতন। একবারে একটা আংটাই সরানো যেত, আর কোন ছোট আংটার ওপর বড় আংটা বসানো চলত না। গল্পে আছে, যেদিন সমস্ত আংটা চালান করা শেষ হবে, সে দিনই পৃথিবীর শেষ।”

“এ গল্পটা বিশ্বাস করলে তো পৃথিবীর বহু আগেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।”

“তুমি ভাবছ এভাবে ৬৪টা আংটা চালান করতে খুব বেশী দেরি হবে না, তাই না?”

“নিশ্চয়ই, খুব বেশী সময় লাগবে না। ধর না, যদি প্রত্যেকবার চালান করতে এক সেকেন্ড করে লাগে, তার মানে হল এক ঘণ্টায় একজন লোক ৩৬০০ বার ওগুলো সরাতে পারবে।”

“বেশ তো!”

“তাহলে একদিনে হবে প্রায় ১ লক্ষ বার আর দশদিনে হবে প্রায় ১০ লক্ষ বার। ১০ লক্ষটা চাল দিয়ে তুমি ১০০০টা আংটা চালান করতে পারবে বলে বিশ্বাস করি।”

“ভুল বললে তুমি। এই ৬৪টা আংটাকে চালান করতে তোমার লাগবে ৫০,০০০ কোটি বছর, এর একটুও কম বা একটুও বেশী নয়!”

“কিন্তু তা হবে কেন? মোট চালের সংখ্যা হবে ২-কে ৬৪ বার ২ দিয়ে গুণ করে তা থেকে ১ বিয়োগ দিলে... তার মানে হল... আচ্ছা একটু দাঁড়াও... এক সেকেন্ডের ভেতর উত্তরটা বলছি তোমাকে।”

"বেশ, তুমি যতক্ষণে এই গুণটা করবে আমি অন্য কাজকর্ম করার প্রচুর সময় পাব ততক্ষণ।"

দাদা চলে গেলে আমি বসে গেলাম হিসেবটা করতে। প্রথমে $২^{১৬}$-র ফলটা বের করে ফেললাম, হল ৬৫,৫৩৬; এবার ঐ সংখ্যাকে
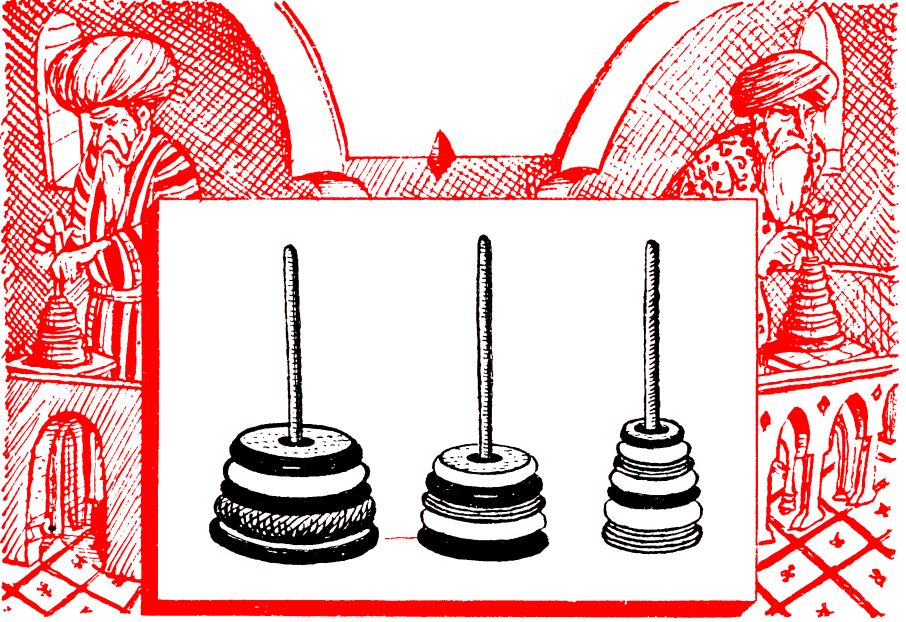
৫৫ নং ছবি। পুরোহিতদের অবিরাম আংটাগুলোকে এক কাঠি থেকে আর একটা কাঠিতে চালান করার কাজে ব্যস্ত থাকতে হত।

ঐ সংখ্যা দিয়েই গুণ করলাম; যে ফল পেলাম তাকে আবার সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলাম। পরে তা থেকে বিয়োগ করলাম ১। এতে যে সংখ্যাটা পাওয়া গেল, তা হল:

১,৮৪,৪৬,৭৪,৪০,৭৩,৭০,৯৫,৫১,৬১৫*

---

* সংখ্যাটা আমাদের চেনা: দাবাখেলা আবিষ্কারের জন্য সেসা এই পুরস্কারই চেয়েছিলেন।

দাদা তাহলে ঠিকই বলেছিল।

এরই সঙ্গে আরও একটা জিনিস এসে পড়ছে। আমাদের পৃথিবীর বয়স কত তা হয়ত জানবার ইচ্ছে হতে পারে তোমাদের। বৈজ্ঞানিকরা সেটা বের করেছেন। অবশ্য এটা একটা মোটামুটি হিসেব:

সূর্যের বয়স	৫,০০,০০০ কোটি বছর
পৃথিবীর বয়স	৩০০ কোটি বছর
পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব	১০০ কোটি বছর
মানুষের বয়স	৩ লক্ষ বছরের কম নয়

৫৭. বাজি ধরা

আমাদের ছুটি কাটাবার বাড়িটায় দুপুরে খেতে বসেছি আমরা। এমন সময় কথাবার্তা শুরু হল। আলোচ্য বিষয়: একই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা। এর ভেতর একজন তরুণ গণিতজ্ঞ একটা মুদ্রা নিয়ে বলতে লাগল:

"দেখ সবাই, আমি না দেখে এই মুদ্রাটাকে টস করব টেবিলের ওপর। বল তো, মাথার দিকটা উপর দিকে থাকার সম্ভাবনা কতটা?"
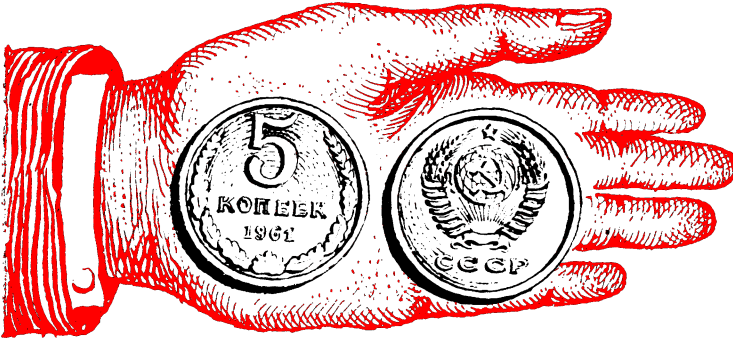
৫৬ নং ছবি। মুদ্রাটি দুরকম ভাবে টেবিলে পড়তে পারে।

আর সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "সম্ভাবনা বলতে কী বুঝছ তা একটু পরিষ্কার করে বলবে তো — ব্যাপারটা কী সবাই তো আর তা জানে না!"

"সে খুব সোজা জিনিস। একটা মুদ্রার মাত্র দু'রকমভাবেই পড়ার সম্ভাবনা আছে, হয় ছবির দিক, নয়ত সংখ্যার দিক (৫৬ নং ছবি)।"

এর ভেতর মাত্র একটাই আমাদের মনোমত হয়। তাহলে এইরকম হিসেব পাওয়া যাচ্ছে:

$$\frac{\text{মনোমতভাবে পড়ার সংখ্যা}}{\text{যতরকমভাবে পড়ার সম্ভাবনা তার সংখ্যা}} = ১/২$$

এই ১/২ ভগ্নাংশটা দিয়ে বোঝা যাবে কতবার ছবির দিক করে পড়ার সম্ভাবনা আছে।"

একজন বাধা দিয়ে বলল, "মুদ্রা নিয়ে করলে ব্যাপারটা খুবই সোজা। অন্যকোন জিনিস, যেমন ধর একটা ছক্কা, তাই দিয়ে এটা করা যাক না!"

অংকনবীশটি রাজী হল তাতে, "বেশ তাই হবে, একটা ছক্কা নেওয়া যাক। এর চেহারাটা ঘনক্ষেত্রাকার পদার্থের মতো এবং এর প্রত্যেক পাশে সংখ্যা দেওয়া আছে (৫৭ নং ছবি)। এখন বল তো, ৬ পড়ার সম্ভাবনা কতটা? এটা কতবার ঘটতে পারে? ৬টা দিক আছে এর, তাহলে ১ থেকে ৬ যেকোন সংখ্যাই পড়তে পারে। ৬ পড়লেই সেটা আমাদের মনোমত হবে। এক্ষেত্রে সম্ভাবনা হচ্ছে ১/৬।"

৫৭ নং ছবি। **খেলার ছক্কা।**

একটি মেয়ে প্রশ্ন করল, "কোনও ঘটনার সম্ভাবনা হিসেব করে বের করা কি সত্যিই সম্ভব? আমার একটা ধারণা আছে যে আমাদের জানালা দিয়ে প্রথম যে মানুষটিকে দেখা যাবে, সে একটা পুরুষ মানুষ। আমার ধারণাটা ঠিক হবার সম্ভাবনা কতটা?"

"যদি আমরা এক বছর বয়সের কোনও বাচ্চা ছেলেকেও পুরুষ বলে ধরে নিতে রাজী থাকি তাহলে এর সম্ভাবনা ১/২। কেননা পৃথিবীতে পুরুষ আর স্ত্রীলোকের সংখ্যা সমান।"

আর একজন প্রশ্ন করল, "প্রথম দু'জনই পুরুষ হবার সম্ভাবনা কতটা?"

"এখানে হিসেবটা আরও গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। যতরকমভাবে তারা আসতে পারে সব হিসেব করে দেখা যাক। প্রথমত, হতে পারে সকলেই হবে পুরুষ মানুষ। দ্বিতীয়ত, প্রথম জন হয়ত হবে পুরুষ, দ্বিতীয় জন হবে স্ত্রীলোক। তৃতীয়ত, ঘটনাটা একেবারে উল্টো হতে পারে: প্রথমে স্ত্রীলোক, তারপর পুরুষ। চতুর্থত, ওদের দু'জনই স্ত্রীলোক হতে পারে। তাহলে তাদের বিভিন্নভাবে পরপর আসবার সম্ভাবনা হল ৪। এর ভেতর প্রথমটাই আমাদের মনোমত। তাহলে সম্ভাবনার সংখ্যা হল ১/৪। এই হল তোমার প্রশ্নের সমাধান।"

"এটা তো পরিষ্কার। কিন্তু তিনজন মানুষের প্রশ্নও তো আসতে পারে? যে তিনজন আমাদের জানালা দিয়ে প্রথম যাবে তারা সকলেই পুরুষ হবে তার সম্ভাবনা কতটা?"

"বেশ, তাও হিসেব করা যায়। সম্ভাবনার সংখ্যাটাকে প্রথমে সাজিয়ে হিসেবটা শুরু করা যাক। দু'জন পথিকের জন্য পরপর আসবার সংখ্যাটা হল ৪। এর সঙ্গে একজন তৃতীয় পথিক যোগ করলে বিভিন্ন বিন্যাসের সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে, কারণ দু'জন পথিকের এই চারটে দলের সঙ্গে একজন পুরুষ বা একজন স্ত্রীলোকও যোগ হতে পারে। তাহলে এক্ষেত্রে পরপর বিন্যাসের সংখ্যা হচ্ছে ৪ × ২ = ৮। তাহলে সম্ভাবনার সংখ্যাটা হচ্ছে ১/৮। কারণ এর ভেতর মাত্র একটা বিন্যাসকেই চাই আমরা। সম্ভাবনার সংখ্যা বের করার উপায় হিসেব করা খুবই সোজা। দু'জন পথিকের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা হল ১/২ × ১/২ = ১/৪, তিনজনের ক্ষেত্রে ১/২ × ১/২ × ১/২ = ১/৮, চারজনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার সংখ্যা হল ১/২-কে পরপর চারবার গুণ করলে যা হয়, তাই। তাহলেই দেখছ প্রত্যেক বারেই সম্ভাবনার সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে।"

"তাহলে ১০ জন পথিকের ক্ষেত্রে এটা কি হবে?"

"তুমি বলছ, প্রথম দশজন পথিকেরই পুরুষ হবার কতটা সম্ভাবনা? এর জন্য ১/২-কে দশবার গুণ করলে যা হয় সেটা বের করতে হবে। তা হবে ১/১০২৪। তার মানেই হল, তুমি যদি এক রুবল বাজি ধরে বল এটা ঘটবে, আমি তাহলে ১০০০ রুবল বাজি ধরে বলতে পারি এটা ঘটবে না।"

উপস্থিত সবার ভেতর একজন চিৎকার করে বলল, "বাজিটাতে লোভ লাগছে! এক রুবল বাজি রেখে হাজার রুবল জিততে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে আমার।"

"কিন্তু ভুলে যেও না, জেতবার সম্ভাবনাটা কিন্তু হাজারে একবার মাত্র।"

"কুছ্ পরোয়া নেই, আমি বরং হাজার রুবলের জন্য এক রুবল বাজি ধরতেই রাজি আছি এই বলে যে পথিকদের প্রথম একশো জনই হবে পুরুষ।"

"এক্ষেত্রে সম্ভাবনাটা যে কত কম তা বুঝতে পারছ?"

"এটা বোধহয় দশ লক্ষে একবারের মতন বা সেরকম কিছু হবে।"

"না এটা এত কম যে হিসেবও চলে না। ২০ জন পথিক হলে সম্ভাবনা হল দশ লক্ষে একবার, ১০০ জন হলে হবে... আচ্ছা একটু দাঁড়াও। একটা কাগজে হিসেবটা করে ফেলি। ১০০ জনে সম্ভাবনাটা হল... আরে বাব্বাঃ, ১ : ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০।"

"এই তো মোট?"

"খুব কম মনে হচ্ছে নাকি? সমুদ্রেও এত ফোঁটা জল নেই, এমনকি এর ১০০০ ভাগের এক ভাগও নয়।"

"হ্যাঁ, সংখ্যাটা খুবই বিরাট বটে! তা আমার রুবলের বদলে তুমি কত টাকা রাখছ?"

"হিঃ হিঃ!.. সবকিছু, আমার যাকিছু আছে।"

"সবকিছু, বড় বেশী হয়ে গেল। তোমার সাইকেলটাই রাখ। আমি ঠিকই জানি তোমার সে সাহস নেই।"

"আমার সাহস নেই? আচ্ছা, এস না! আমার সাইকেলই বাজি ধরলাম। এতে কোন ঝুঁকিই নেওয়া হচ্ছে না আমার!"

"আমিও না। একটা রুবল খুব বেশী কিছু নয়! তবুও আমি জিতলে পাব একটা সাইকেল, আর তুমি জিতলে যা পাবে তা প্রায় কিছুই না।"

"কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তুমি কখনই জিতবে না? সাইকেলটা তুমি কিছুতেই পাবে না, আর তোমার রুবলটা তো প্রায় আমার পকেটেই এসে গেছে।"

"এরকম কোরো না!" অংকনবীশের বন্ধুটি এবার যোগ দিল কথায়, "একটা রুবলের বদলে বাজি ধরছ একটা সাইকেল? পাগল নাকি?"

অংকনবীশ বন্ধুটিকে বলল, "তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে এক রুবল বাজি ধরাও বোকামি। একেবারে নিশ্চিত হার হবে। এ তো স্রেফ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।"

"তবু একটা সম্ভাবনা তো আছে!"

"হ্যাঁ, সারা সমুদ্রে এক বিন্দু জলের মতন—সত্যি বলতে দশটা

সমুদ্রে এক বিন্দুর মতন। কত বড় সুযোগ। একটা সম্ভাবনার জন্য দশটা সমুদ্রই বাজি রাখছি আমি। আমি জিতব একেবারে দুই আর দুইয়ে চার-এর মতোই নিশ্চয়।"

একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক মাঝখানে বলে উঠলেন, "তুমি যে একেবারে কল্পনায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছ!.."

"আচ্ছা প্রফেসর, আপনি কি সত্যিই মনে করেন ওর কোন সুযোগ আছে জেতবার?"

"তোমরা কি ভাবছ না যে সব ঘটনাই ঘটা সম্ভব নয়? সম্ভাবনার এই হিসেবটা কখন ঠিক হয়? যখন বিভিন্ন রকমই ঘটার সম্ভাবনা থাকে, তাই না? এই দেখ না... আচ্ছা যাক, শোন তো তোমরা। তোমাদের ভুলটা এবার বুঝতে পারবে বোধহয়। সৈন্যদের ব্যান্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?"

"তা পাচ্ছি... এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি...?" তরুণ অঙ্কনবীশটি বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওর মুখে একটা ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল, তাড়াতাড়ি সে ছুটে গেল জানালার দিকে।

"ঠিক," দুঃখের সঙ্গেই বলল সে, "বাজিটা আমিই হারলাম। গেল সাইকেলটা..."

এক মুহূর্ত পরেই আমরা দেখলাম আমাদের জানালার সামনে দিয়ে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য কুচকাওয়াজ করতে করতে যাচ্ছে।

৫৮. আমাদের চারপাশে আর দেহের ভেতরে দানবীয় সংখ্যাগুলো

দানবীয় সংখ্যাগুলোকে বের করতে হলে খুব দূরে যাবার দরকার নেই। সবই রয়েছে আমাদেরই চারপাশে, এমনকি আমাদের দেহের ভেতরেও। কি করে তাদের চিনতে হবে সেইটাই জানা দরকার। মাথার উপরের আকাশ, পায়ের নীচের বালুরাশি, চারপাশের বাতাস, আমাদের দেহের রক্ত — সবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দৈত্যের মতন সব সংখ্যা।

আকাশের বিরাট সংখ্যাগুলি বেশীর ভাগ লোকের কাছেই অজানা নয়। আকাশে তারার সংখ্যাই হোক, তাদের পরস্পরের ভেতরকার বা পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বই হোক বা তাদের আয়তন, ওজন বা বয়স যাই হোক — প্রত্যেক ক্ষেত্রের সংখ্যাগুলোই আমাদের কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেয়। মানুষ যে 'জ্যোতিষিক সংখ্যা' কথাটা বার করেছে তা তো আর শুধু শুধু নয়। কিন্তু কেউ কেউ হয়ত এটা ভাবতেও পারবে না যে, এই আকাশের যেসব জিনিসকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'ছোট' বলে আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে

যদি মানুষের অভ্যাসের দিক থেকে বিচার করা যায়, তাহলে সত্যি সত্যিই দৈত্যের মতো বিরাট হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সৌরজগতে কতকগুলো গ্রহ আছে যাদের ব্যাস মাত্র কয়েক কিলোমিটার। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সবসময় বিরাট বিরাট সংখ্যা নিয়ে কারবার করেন বলে এদের বলেছেন 'ছোট'। কিন্তু আকাশের বড় বড় জিনিসগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে তবেই তাদের 'ছোট' বলে মনে হবে। আমাদের দৃষ্টিতে তারা মোটেই 'ছোট' নয়। তিন কিলোমিটার ব্যাসের একটি 'ছোট' গ্রহের কথাই ধরা যাক। জ্যামিতির সাহায্যে এটা হিসেব করা মোটেই কঠিন নয় যে এর উপরিভাগের আয়তন ২৮ বর্গ কিলোমিটার বা ২,৮০,০০,০০০ বর্গ মিটারের সমান। এক বর্গ মিটার জায়গায় সাত জন লোক স্বচ্ছন্দে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ এই ছোট্ট গ্রহের ওপরেই ১৯,৬০,০০,০০০ জন লোক দাঁড়িয়ে থাকবার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে।

যে বালুরাশির ওপর দিয়ে আমরা হেঁটে যাই তাও দানবীয় সংখ্যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। 'সমুদ্রতীরের বালুরাশির মতোই অসংখ্য' কথাটি তো আর শুধু শুধু আসে নি! দেখা যাচ্ছে, পুরনো দিনের লোকেরা বালুকণার সংখ্যাকে ছোট করে দেখতেন। তাঁরা ভাবতেন আকাশে যত তারা আছে বালুকণার সংখ্যাও ঠিক তত। প্রাচীনকালে কোন টেলিস্কোপ ছিল না, তাই এক গোলার্ধে মানুষ খালি চোখে দেখতে পেত প্রায় ৩৫০০ তারা। সমুদ্রতীরের বালুরাশি খালি চোখে যত তারা দেখা যায় তার কোটি কোটি গুণ বেশী।

যে বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস নিই তার ভেতরও এমনি সংখ্যা লুকিয়ে আছে। এর প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে আছে ২,৭০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ 'অণু'।

সংখ্যাটা যে কত বড় তা কল্পনা করাও অসম্ভব। পৃথিবীতে এত মানুষ থাকলে তাদের উপযুক্ত জায়গাই পাওয়া যেত না। সত্যি সত্যিই ভূপৃষ্ঠে সমস্ত মহাদেশ আর সমুদ্র ধরে নিলে আছে ৫০ কোটি বর্গ কিলোমিটার। একে যদি বর্গ মিটারে ভাঙা যায়, তাহলে দাঁড়াবে

৫০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ বর্গ মিটার।

এবার ২,৭০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০-কে এই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাক। উত্তর হল ৫৪,০০০। আর এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে প্রত্যেক বর্গ মিটারের ভাগে ৫০,০০০-এরও বেশী লোক পড়ছে!

আমরা বলেছি যে প্রত্যেক মানুষই তার ভেতরে দৈত্যের মতো বিরাট সংখ্যা বহন করে চলেছে। সেটা হল রক্ত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে এক ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করলে আমরা এক বিরাট সংখ্যার লোহিত কণিকা দেখতে পাব। এরা হল চাকতির মতো, মাঝখানটা চাপা (৫৮ নং ছবি)। তাদের প্রত্যেকের আকৃতিই প্রায় সমান, ব্যাস ০·০০৭ মিলিমিটার, আর ০·০০২ মিলিমিটার পুরু। ১ ঘন মিলিমিটারের মতো ছোট এক ফোঁটা রক্তে অনেক অনেকগুলো কণিকা রয়েছে— তাদের সংখ্যা ৫০ লক্ষ। মানুষের শরীরে কত কণিকা আছে? একটা মানুষের শরীরের যত কিলোগ্রাম ওজন, শরীরে রক্তের পরিমাণ তার ১৪ ভাগের চেয়ে কিছু কম লিটার। ধরা যাক, লোকটির ওজন যদি হয় ৪০ কিলোগ্রাম, তাহলে তার শরীরে আছে প্রায় ৩ লিটার (বা ৩০ লক্ষ ঘন মিলিমিটার) রক্ত। খুব সহজ একটা হিসেব করলেই দেখা যাবে, তার শরীরে আছে ৫০,০০,০০০ × ৩০,০০,০০০ = ১,৫০,০০,০০,০০,০০,০০০ লোহিত কণিকা (৫৯ নং ছবি)।
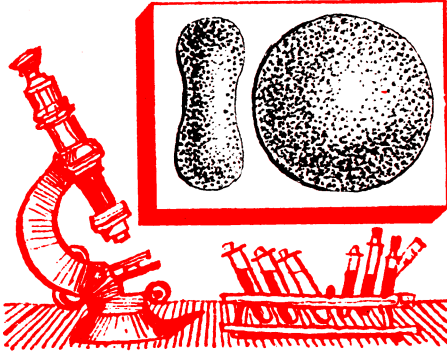
৫৮ নং ছবি। লোহিত কণিকা।

একবার ভাব তো! ১৫,০০,০০০ কোটি লোহিত কণিকা! এদের যদি সার বেঁধে রাখা যায় তাহলে কণিকার সুতোটা কত বড় হবে? সেটা হিসেব করা কঠিন নয় মোটেই: ১,০৫,০০০ কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবীর বিষুব রেখার চারদিকে কয়েক পাক জড়িয়ে রাখা যায়, এটা এমন লম্বা, এর ১,০০,০০০ : ৪০,০০০ = ২·৫ গুণ। যদি উপযুক্ত ওজনের কোনো মানুষের কথাই ধরা যায়, তাহলে লোহিত কণিকার এই শেকল দিয়ে ৩ বার পৃথিবীকে জড়ানো চলবে।

এই ছোট্ট লোহিত কণিকাগুলি আমাদের দেহের অতি প্রয়োজনীয় কাজ করে। তারা শরীরের সমস্ত অংশে অক্সিজেন পেঁছে দেয়। রক্ত যখন ফুসফুসের ভেতর দিয়ে যায় তখন তারা অক্সিজেন শুষে নেয়, তারপর রক্তস্রোত যখন তাদের পেঁছে দেয় আমাদের কোষকলার ভেতরে, তখন ফুসফুস থেকে বহু দূরের সেই অংশে তারা নিয়ে যায় সেই অক্সিজেন।
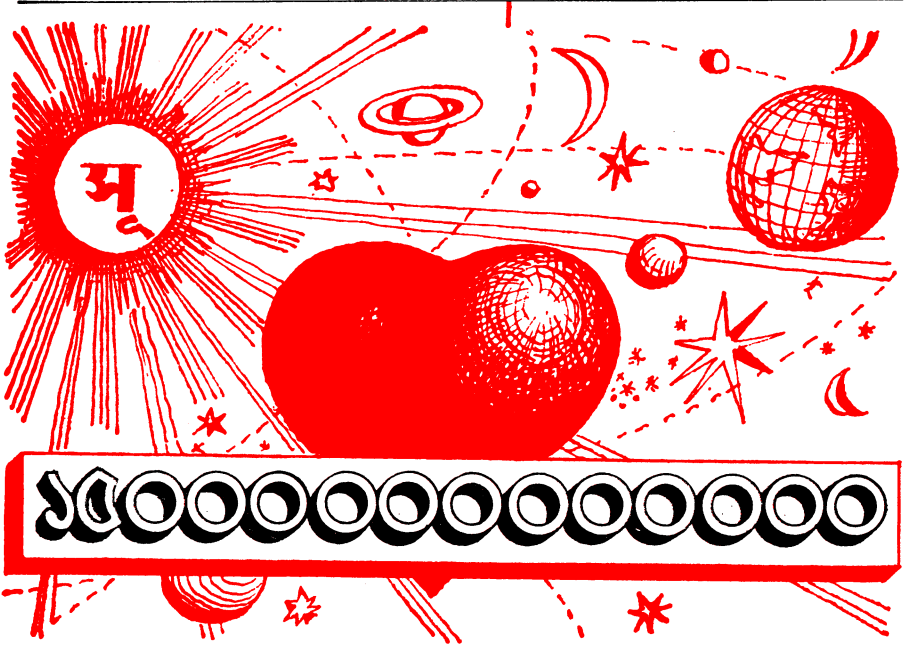
৫৯ নং ছবি। পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সার বাঁধা লোহিত কণিকার সুতো দিয়ে তিনবার পৃথিবীর চারদিকে পাক দেওয়া যায়।

কণিকাগুলি যত ছোট হবে আর সংখ্যায় যত বেশী হবে তাদের কাজও ততই ভালভাবে চলবে। কারণ তাহলে তাদের ত্বকের আয়তনটা বেশী হয় আর এই ত্বকের মধ্য দিয়েই তো তারা অক্সিজেন শুষে নিতে বা ছেড়ে দিতে পারে। হিসেব করলে দেখা যাবে এদের ত্বকের মোট আয়তন মানুষের বাইরের ত্বকের আয়তনের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। এটা ৪০ মিটার লম্বা আর ৩০ মিটার চওড়া, অর্থাৎ প্রায় ১২০০ বর্গ মিটারের সমান। এখন তাহলে বুঝতে পারছ জীবিত প্রাণীর দেহে যত বেশী সম্ভব লোহিত কণিকা থাকা কতটা দরকারী। এরা আমাদের শরীরের চেয়েও ১০০০ গুণ বেশী আয়তনের জায়গা দিয়ে অক্সিজেনকে শুষে নেয়, তারপর তা শরীরের অন্য অংশে নিয়ে যায়।

একজন মানুষ মোট যতটা পরিমাণ খাবার খায় তাও একটা দানবীয় সংখ্যা বৈকি (জীবনের দৈর্ঘ্য যদি গড়ে ৭০ বছর করে ধরা যায়)। একজন

মানুষ তার সারা জীবনে যত টন জল, রুটি, মাংস, পশুপাখি, মাছ, শাকসব্জি, ডিম, দুধ ইত্যাদি খায় তা চালান করতে রীতিমতো একটা ট্রেন লেগে যাবে। সত্যিই, এটা বিশ্বাস করতে বেগ পেতে হয় যে একবারে না হলেও একজন মানুষ একটা ট্রেন ভর্তি জিনিস তার পেটে চালান করতে পারে।

৭
যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াও
মাপা যায় কি করে?
ক
খ

৫৯. পদক্ষেপে দূরত্বের হিসেব

আমাদের কাছে তো আর সবসময়ই গজ-কাঠি থাকে না! কি করে মোটামুটিভাবে দূরত্ব হিসেব করা যায়, তা জানা থাকলে সুবিধাই হবে।

মনে কর, তুমি যখন পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছ, তখন দূরত্ব হিসেব করার সবচেয়ে সোজা উপায় হল পদক্ষেপ গোনা। এটা করতে তোমার পদক্ষেপের দূরত্ব জানা থাকা চাই। অবশ্য সবসময়ই যে সমান দূরে দূরে পা পড়বে তা নয়: তাছাড়া ইচ্ছেমতো ছোট ছোট বা লম্বা লম্বা পা ফেলা যায়। তবে মোটামুটিভাবে পা ফেলার দূরত্ব প্রায় সমান, আর তোমার যদি এটা জানা থাকে, তাহলে যেকোন দূরত্বই হিসেব করে ফেলতে পারবে।

প্রথমে তোমার পদক্ষেপের মোটামুটি দূরত্ব হিসেব করতে হবে। এটা অবশ্য মাপবার যন্ত্র ছাড়া করার উপায় নেই।

একটা ফিতে নিয়ে ২০ মিটার পর্যন্ত সেটাকে বিছাও। তারপর সেটাকে সরিয়ে নিয়ে ঐ দূরত্বটা পার হতে তোমার কতবার পা ফেলতে হয় তা দেখ। এমন হতে পারে যে, হিসেবটা হল পা আর কিছু ভগ্নাংশ। যদি ভগ্নাংশটা ১/২-এর কম হয়, তাহলে তা হিসেবের মধ্যে আনবার দরকার নেই। যদি ১/২-এর বেশী হয়, তাহলে সেটাকে পুরো একটা সংখ্যা হিসেবেই গোন। এরপর ২০ মিটারকে পদক্ষেপের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই মোটামুটি পদক্ষেপের মাপ পেয়ে যাবে। উত্তরটাকে মনে করে রাখো।

পদক্ষেপের হিসেব যাতে হারিয়ে না যায়, বিশেষত যখন বেশী দূরত্ব হিসেব করতে হয়, তখন সবচেয়ে ভাল উপায় হল ১০ পর্যন্ত গোনা, তারপর বাঁ হাতের একটা আঙ্গুল ভাঁজ করে রাখা। যখন সবগুলো আঙ্গুল ভাঁজ করা হয়ে যাবে, অর্থাৎ তুমি যখন ৫০ পা চলে গেছ, তখন ডান হাতের একটা আঙ্গুল ভাঁজ কর। এভাবে তুমি ২৫০ পর্যন্ত গুনতে পারবে। তারপর আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। শুধু এটা ভুললে চলবে না যে তোমার ডান হাতের আঙ্গুল তুমি মোট কতবার বাঁকিয়েছ। ধরা যাক, তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুল তুমি পুরোপুরি

দু'বার বাঁকিয়েছ, তারপর ডান হাতে বাঁকিয়েছ তিন আঙ্গুল আর বাঁ হাতে চার আঙ্গুল, তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, তুমি মোট গিয়েছ:

$$২ \times ২৫০ + (৩ \times ৫০) + (৪ \times ১০) = ৬৯০ \text{ পা।}$$

এর সঙ্গে অবশ্য শেষ আঙ্গুল ভাঁজ করার পর অল্প আরও কয়েক পা যদি তুমি গিয়ে থাক, তা যোগ দিতে হবে।

আচ্ছা এই দেখ, একটা পুরনো নিয়ম: একজন বয়স্ক লোকের মোটামুটি পদক্ষেপ হল তার চোখ থেকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল যতটা তার অর্ধেক।

হাঁটবার গতি সম্পর্কে আর একটা পুরনো নিয়ম: মানুষ তিন সেকেন্ডে যত পা যাবে, এক ঘণ্টায় যাবে ঠিক তত কিলোমিটার। কিন্তু পদক্ষেপের বিশেষ একটি মাপ থাকলেই এটা সত্যি হবে, আর পদক্ষেপটা বড় হলেই হিসেবটা খাটবে। যদি পদক্ষেপের বিস্তার হয় প মিটার, আর তিন সেকেন্ডে পদক্ষেপের সংখ্যা হয় ন, তাহলে তিন সেকেন্ডে মানুষ যাবে ন প মিটার, আর এক ঘণ্টায় (৩৬০০ সেকেন্ডে) যাবে ১২০০ ন প মিটার বা ১·২ ন প কিলোমিটার। এই দূরত্ব যদি তিন সেকেন্ডের পদক্ষেপের সংখ্যার সমান হয়, তাহলে এই সমীকরণটা আসছে: ১·২ ন প = ন বা ১·২ প = ১।
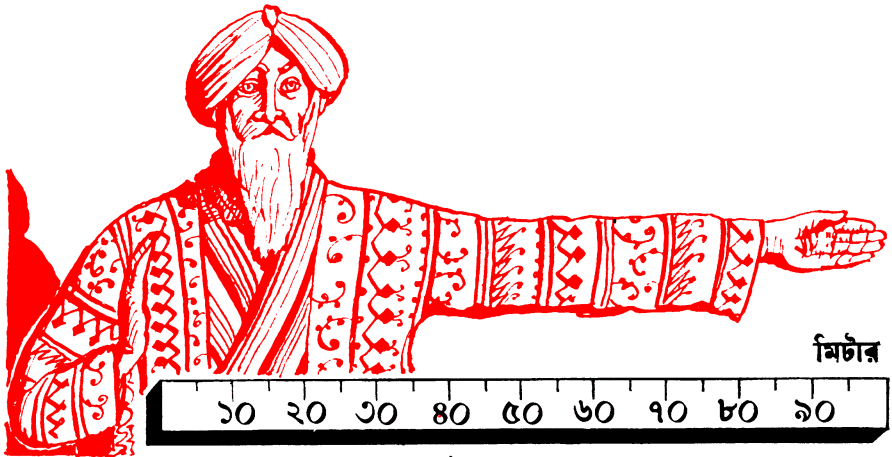
৬০ নং ছবি। এক হাত লম্বা করে দিয়ে হাতের আঙুল থেকে অন্য দিকের কাঁধ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হবে প্রায় এক মিটার।

অর্থাৎ:

প=০·৮৩ মিটার

মানুষের পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য যে তার উচ্চতার ওপর নির্ভর করে এ নিয়মটা ঠিক। দ্বিতীয় যে নিয়মটা আমরা এমনি করে দেখলাম, তা কেবল প্রমাণ মাপের মানুষের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে মানুষ প্রায় ১·৭৫ মিটার লম্বা, তার ক্ষেত্রেই সত্যি।

৬০. জীবন্ত মাপকাঠি

হাতের কাছাকাছি মাপ নেবার কোন যন্ত্রপাতি না থাকলে এই নিয়মটা দিয়ে প্রমাণ আকারের জিনিস মাপ করা চলে। এক হাত লম্বা করে দিয়ে হাতের আঙ্গুল থেকে অন্য দিকের কাঁধ পর্যন্ত একটা দড়ি বা কাঠি রাখ
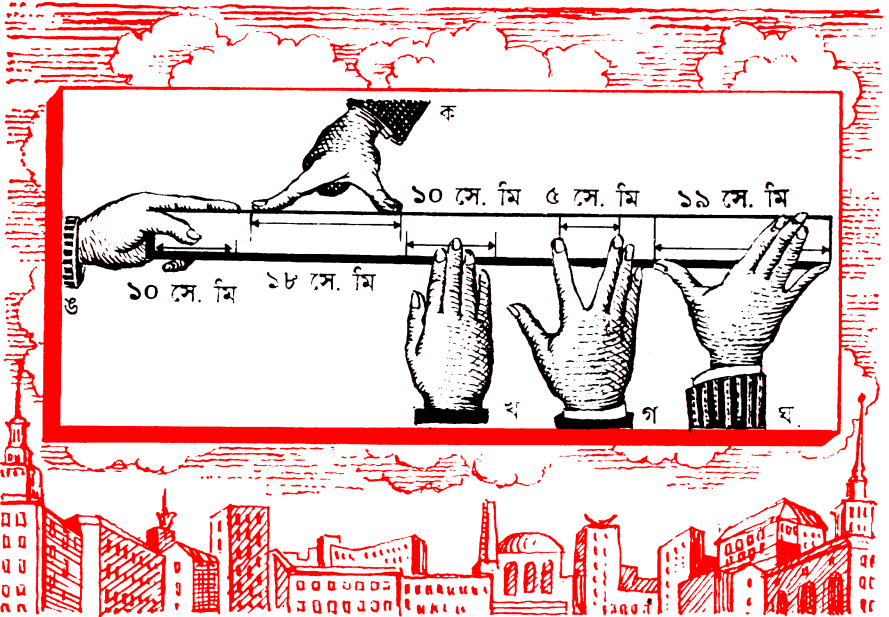
৬১ নং ছবি। মাপ নেবার ফিতে ব্যবহার না করে মাপার জন্য নিজের হাতের কি কি মাপ জানা দরকার।

(৬০ নং ছবি)। প্ূর্ণবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে এর দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১ মিটার। আঙ্গুল দিয়ে (মোটামুটিভাবে) মিটার মাপবার আরও একটা উপায় আছে। তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুল যতটা পারা যায় ফাঁক করলে তাদের দূরত্ব হয় প্রায় ১৮ সেন্টিমিটার, আর এইরকম ছয়বার হলেই প্রায় ১ মিটার হয়ে যাবে (৬১-ক নং ছবি)।

এগুলি থেকে 'খালি হাতে' মাপা শেখা যায়। এজন্য নিজের হাতের চেটোর মাপটা মনে রাখলেই চলবে।

প্রথমে হাতের চেটোর প্রস্থ জানতে হবে — ৬১-খ নং ছবিতে দেখান হয়েছে। বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে এটা সাধারণত ১০ সেন্টিমিটার। তোমারটা হয়ত এরচেয়ে বড় বা ছোট। কতটা তফাত তা তোমাকে জেনে রাখতে হবে। তারপর জানতে হবে তর্জনী আর মধ্যমাকে যতটা সম্ভব ফাঁক করলে তাদের দূরত্ব কত হয় (৬১-গ নং ছবি)। তর্জনী বুড়ো আঙ্গুলের গোড়া থেকে কতটা লম্বা (৬১-ঙ নং ছবি) তা জেনে রাখাও খুব কাজের হবে। সবশেষে মেপে রাখ, যতটা সম্ভব ফাঁক করলে বুড়ো আঙ্গুল আর কনিষ্ঠার দূরত্ব কত হয় (৬১-ঘ নং ছবি)।

এই 'জীবন্ত মাপকাঠি' ব্যবহার করে তোমরা ছোট ছোট জিনিসের মোটামুটি মাপ বের করতে পারবে।

৮

মাথা-ঘামানো জ্যামিতি
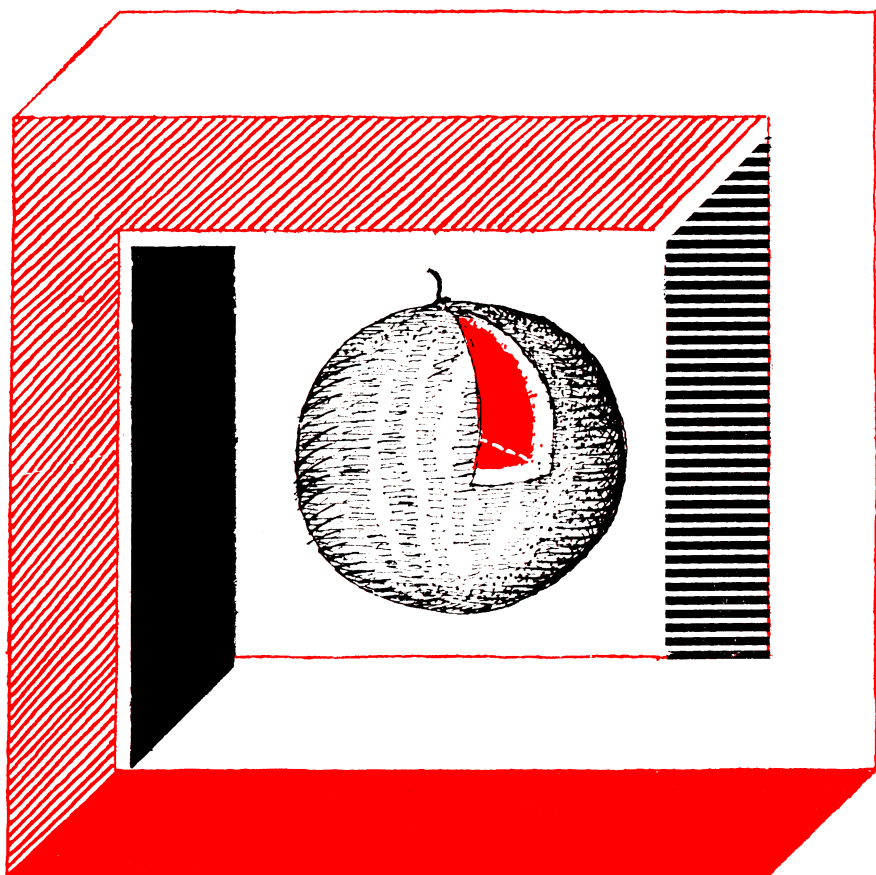
এই পরিচ্ছেদের প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে খুব ভাল জ্যামিতি জানবার দরকার নেই। গণিতের এই বিভাগটি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেই যেকেউ এগুলো করতে পারবে। এখানে যে এক সারি ধাঁধা দেওয়া হচ্ছে একজন তা দিয়েই বুঝতে পারবে সত্যিই জ্যামিতি তার কিছু জানা আছে কিনা। জ্যামিতিক আকৃতিগুলির বৈশিষ্ট্য জানাই আসল জ্ঞান নয় — জানতে হবে বাস্তব সমস্যায় সেটাকে কি করে কাজে লাগাতে হবে। যে লোক গুলি ছুঁড়তে জানে না, তার বন্দুক কোন কাজে লাগবে?

পাঠক, তোমরাই দেখ না, এই জ্যামিতিক চাঁদমারীতে কটা গুলিকে তোমরা ঠিক নিশানায় লাগাতে পার।

৬১. ঠেলাগাড়ি

গাড়ির সামনের ধুরোটা পেছনেরটার চাইতে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় কেন?

৬২ নং ছবি। ঠেলাগাড়ির সামনের ধুরোটা পেছনেরটার চাইতে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় কেন?

৬২. বিবর্ধক কাঁচের মধ্য দিয়ে

যে কাঁচ দিয়ে জিনিসকে চার গুণ বড় দেখায় তার ভেতর দিয়ে দেখলে ১·৫° কোণকে কত বড় দেখাবে (৬৩ নং ছবি)?

৬৩. ছুতোরের লেভেল

তোমরা বোধহয় ছুতোরদের লেভেল যন্তরটা দেখেছ। এতে থাকে একটা কাঁচের নল আর তার ভেতরে একটা বুদ্বুদ (৬৪ নং ছবি)! ঢালু জায়গায় বসালে এই বুদ্বুদটা কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যায়। জায়গাটা যত ঢালু হবে বুদ্বুদটাও মাঝের দাগ থেকে তত বেশী দূরে সরে যাবে। এটা যে নড়ে বেড়ায় তার কারণ হল নলের ভেতরকার তরল পদার্থের থেকে হাল্কা হওয়াতে এটা ওপরের দিকে চলে আসে। যদি টিউবটা সোজা হত, তাহলে বুদ্বুদটা নলের শেষ প্রান্তে চলে আসত, অর্থাৎ সেটাই হত সবচেয়ে উঁচু জায়গা। এই ধরনের 'লেভেল' হলে খুবই অসুবিধে হত তা তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এইজন্যই নলটা বাঁকানো থাকে এবং ৬৪ নং ছবিতে এটাই দেখানো হয়েছে। 'লেভেল' যদি সমতল ক্ষেত্রের ওপর থাকে, তাহলে বুদ্বুদটা নলের মাঝখানে, সবচেয়ে উঁচু অংশে চলে আসে। যদি লেভেলটা ঢালুর উপর থাকে, তখন এর সবচেয়ে উঁচুঅংশ আর কেন্দ্র না হয়ে একটু দূরে সরে যায় আর বুদ্বুদটাও কেন্দ্রের দাগ থেকে নলের অন্যপ্রান্তে চলে যায়।*
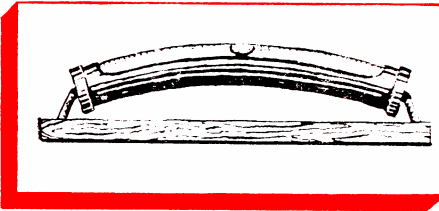
৬৩ নং ছবি। কোণকে কত বড় দেখাবে ?

৬৪ নং ছবি। ছুতোরের লেভেল।

প্রশ্নটা হল: যদি লেভেলটা ০·৫° ঢালুর ওপর থাকে, আর বাঁকা নলের ব্যাসার্ধ হয় ১ মিটার, তাহলে বুদ্বুদটা কেন্দ্রের দাগ থেকে কত মিলিমিটার সরে যাবে?

---

* 'দাগটা বুদ্বুদ থেকে সরে যায়' একথা বলা আরও সঠিক হবে, কারণ বুদ্বুদটা আসলে নিজের জায়গাতেই থাকে, আর নল ও দাগটাই সরে যায়।

৬৪. কতগুলো ধার?

প্রশ্নটা হয়ত খুবই বোকার মতো মনে হবে, আর নয়ত মনে হবে খুবই চালাকির প্রশ্ন:

ছয়-কোণওয়ালা একটা পেন্সিলের কটা ধার থাকে?

উত্তরটা দেখার আগে ভাল করে ভেব কিন্তু।

৬৫. অর্ধচন্দ্র

একটা অর্ধচন্দ্রের আকৃতিকে (৬৫ নং ছবি) মাত্র দুটো সরল রেখা টেনে ছয় ভাগে ভাগ করতে পার?
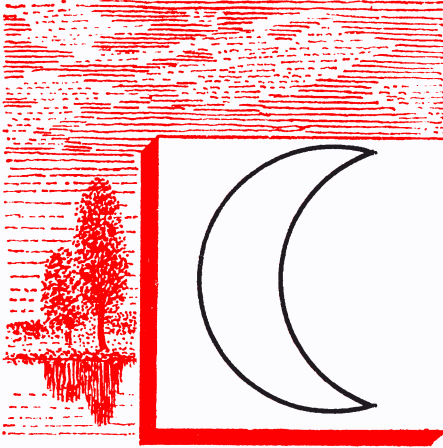
৬৫ নং ছবি। অর্ধচন্দ্র।

৬৬ নং ছবি। ১২টি দেশলাই কাঠির ক্রুশ।

৬৬. দেশলাই কাঠির খেলা

১২টা কাঠি দিয়ে তো তোমরা একটা ক্রুশের মতো করতে পারই (৬৬ নং ছবি)। দেশলাই কাঠি দিয়ে বর্গক্ষেত্র তৈরি করলে তার পাঁচটা ক্ষেত্রের সমান হবে এর আয়তন।

কাঠিগুলোকে কী এমন করে সাজাতে পার, যাতে এর পরিমাপ চারটে বর্গক্ষেত্রের পরিমাপের সমান হয়?

কোন মাপন-যন্ত্র ব্যবহার করা চলবে না কিন্তু।

৬৭. আরও একটা দেশলাই কাঠির খেলা

তোমরা আটটা দেশলাই কাঠি দিয়ে অনেক রকম ক্ষেত্র তৈরি করতে পার। ৬৭ নং ছবিতে তার কয়েকটা দেখানো হল। এদের প্রত্যেকটির মাপ আলাদা। এই আটটা দেশলাই কাঠি দিয়েই সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।
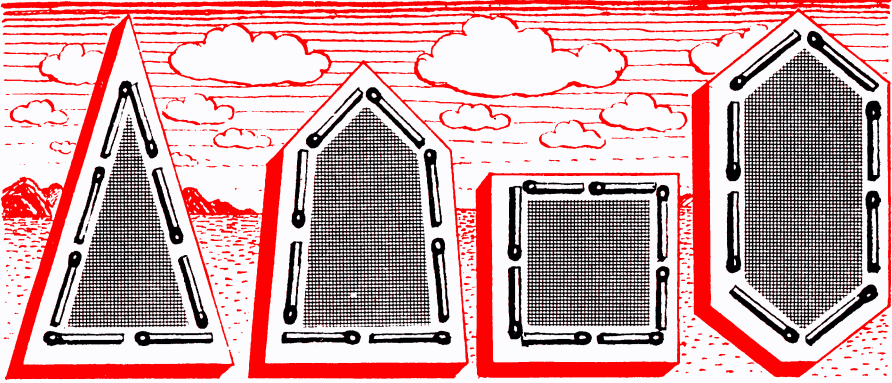
৬৭ নং ছবি। আটটি দেশলাই কাঠি দিয়ে সম্ভাব্য বৃহত্তম ক্ষেত্র তৈরি।

৬৮. মাছির রাস্তা

একটা বেলনাকার পাত্রের ভেতরের দেয়ালে, উপরের গোলাকার মাথা থেকে তিন সেন্টিমিটার নীচে এক ফোঁটা মধু আছে। এর ঠিক উল্টো দিকে, বাইরের দেয়ালে আছে একটা মাছি (৬৮ নং ছবি)।

মধুর কাছে পেঁছবার সবচেয়ে ছোট রাস্তাটা ঐ মাছিটাকে দেখাতে হবে।

পাত্রটির ব্যাস ১০ সেন্টিমিটার আর এর উচ্চতা ২০ সেন্টিমিটার।

মাছিটা নিজেই পথ খুঁজে নেবে এমন মনে করো না। তাহলে তো সমাধানটা

৬৮ নং ছবি। মাছিকে মধুর ফোঁটার পথ বলে দাও।

সোজাই হয়ে গেল। এটা করতে হলে জ্যামিতি ভাল করে জানতে হবে, আর সেটা তো একটা মাছির ক্ষমতার বাইরে।

৬৯. ছিপি দিতে পার একটা ?

তোমাকে একটা তক্তার টুকরো দেওয়া হল, তাতে আছে তিনটে ফুটো — একটা বর্গক্ষেত্রের মতো, একটা ত্রিকোণ আর একটা গোলাকার। এমন একটা ছিপি দিতে পার যা তিনটে ফুটোতেই লাগবে (৬৯ নং ছবি)?

৬৯ নং ছবি। তিনটে ফুটোতেই লাগার মতো একটা ছিপি খোঁজা।

৭০ নং ছবি। এই ফুটোগুলোর জন্য একটা ছিপি হতে পারে কি ?

৭১ নং ছবি। এই তিনটি ফুটোর জন্য একটা ছিপি বানানো যায় কি ?

৭০. দ্বিতীয় ছিপি

যদি আগের প্রশ্নটার সমাধান করে থাক, তবে ৭০ নং ছবিতে যে ফাঁকগুলো দেখানো আছে তার জন্য একটা ছিপি বের করতে চেষ্টা কর তো ?

৭১. তৃতীয় ছিপি

ঐ ধরনেরই আরও একটা প্রশ্ন: ৭১ নং ছবিতে দেখানো ফাঁকগুলোর জন্য একটা ছিপি হতে পারে কি?

৭২. মুদ্রার খেলা

দুটো মুদ্রা নাও: ৫ কোপেক আর ২ কোপেক (২৫ মিলিমিটার আর ১৮ মিলিমিটার ব্যাসের যেকোন দুটো মুদ্রা হলেই চলবে)। এরপর একটা কাগজে ২ কোপেক মুদ্রার পরিধির সমান গোল করে কেটে বাদ দাও।

৫ কোপেক মুদ্রাটা এই ফাঁকের মধ্য দিয়ে যেতে পারবে কি?

এ ধাঁধাটায় কোনই ফাঁকি নেই কিন্তু। এটা একেবারে জ্যামিতির প্রশ্ন।

৭৩. মিনারের উচ্চতা

তোমাদের শহরে একটা খুব বড় মিনার আছে, কিন্তু এর উচ্চতা তোমার জানা নেই। অবশ্য এর একটা ফোটো আছে তোমার কাছে। এর থেকে কি আসল উচ্চতাটা বের করা যায়?

৭৪. একই ধরনের ক্ষেত্র

৭২ নং ছবি। ভেতরের ও বাইরের ত্রিভুজ কি সদৃশ?

জ্যামিতিক সাদৃশ্য যারা বুঝতে পার এই ধাঁধাটা তাদেরই জন্য। এই দুটো প্রশ্নের উত্তর দাও:

(১) ৭২.নং ছবির দুটো ত্রিভুজ কি সদৃশ ত্রিভুজ?

(২) ৭৩ নং ছবির বাইরের আর ভেতরের চতুর্ভুজগুলি কি সদৃশ?

৭৫. তারের ছায়া

রোদের দিনে একটা ৪ মিলিমিটার মোটা টেলিগ্রাফ-তারের নিখুঁত ছায়া কত দূর পর্যন্ত দেখা যাবে?
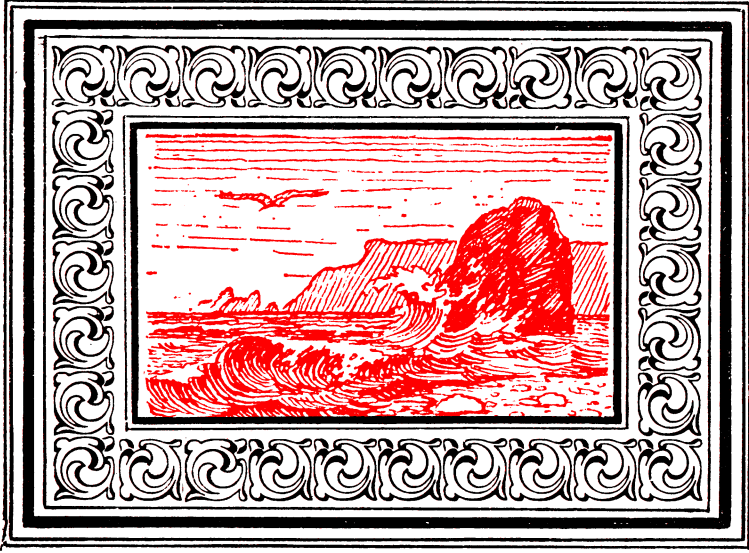
৭৩ নং ছবি। বাইরের ও ভেতরের চতুর্ভুজগুলি কি সদৃশ?

৭৬. একটা ইঁট

একটা ঠিক মাপের ইঁটের ওজন হল ৪ কিলোগ্রাম। এর চার ভাগের এক ভাগ আর একই জিনিস দিয়ে তৈরি একটা ছোট ইঁটের ওজন কত হবে?

৭৭. দৈত্য আর বামন

১ মিটার লম্বা একজন বেঁটে লোকের থেকে ২ মিটার লম্বা একজন লোকের ওজন প্রায় কত গুণ বেশী?

৭৮. দুটো তরমুজ

একজন লোক দুটো তরমুজ বিক্রি করছে। একটা আর একটা থেকে চার ভাগের এক ভাগ বড়, কিন্তু তার দাম দেড় গুণ বেশী। কোনটা কেনা লাভজনক (৭৪ নং ছবি)?
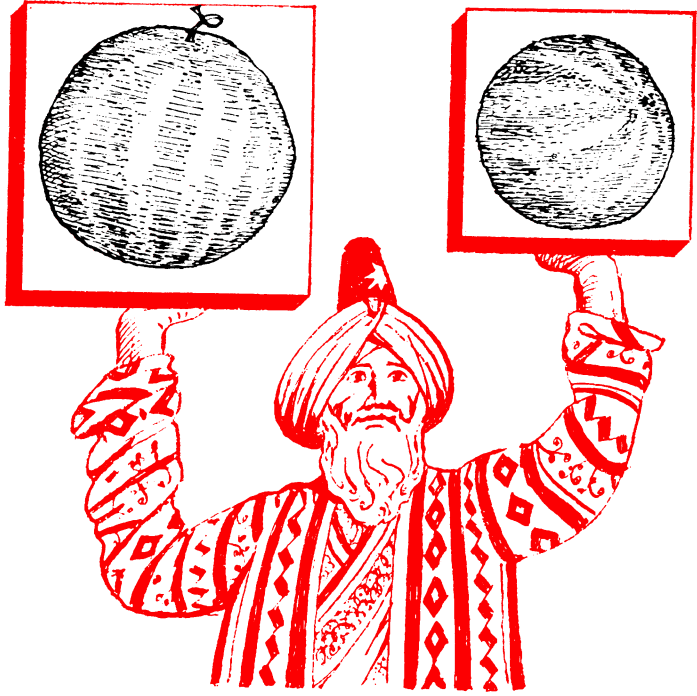
৭৪ নং ছবি। কোন তরমুজটা কেনা লাভজনক?

৭৯. দুটো ফুটি

একই ধরনের দুটো ফুটি বিক্রি হচ্ছে। একটার পরিধি ৬০ সেন্টিমিটার, অন্যটার ৫০। প্রথমটার দাম দেড় গুণ বেশী। এর ভেতর কোনটা কিনলে বেশী লাভ হবে?

৮০. একটা চেরী ফল

চেরী ফলের বীচির চারপাশের **শাঁস** বীচির মতোই পুরু। ধরে নেওয়া যাক, চেরী ফল আর বীচি দুটোই গোল। মনে মনে হিসেব করে বলতে পার চেরী ফলটায় বীচির চেয়ে শাঁস কত গুণ বেশী?

৮১. এইফেল টাওয়ার

প্যারিসের ৩০০ মিটার উঁচু এইফেল টাওয়ার ৮০ লক্ষ কিলোগ্রাম ইস্পাত দিয়ে তৈরি। আমি এরই একটা ১ কিলোগ্রাম ওজনের প্রতিকৃতি তৈরি করতে দেব ঠিক করেছি।

এটা কত উঁচু হবে? একটা জলের গ্লাস থেকে বড় না ছোট হবে?

৮২. দুটো কড়াই

দুটো কড়াই একইরকম দেখতে আর সমান পুরু। একটার চাইতে অন্যটায় আট গুণ বেশী জিনিস ধরে।

ছোটটা থেকে বড়টার ওজন কত বেশী?

৮৩. শীতকালে

এক ঠান্ডার দিনে একজন পূর্ণবয়স্ক লোক আর একটি বাচ্চা একইরকম পোশাক পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

কার বেশী শীত লাগছে?

৬১—৮৩ নম্বর ধাঁধার উত্তর

৬১. প্রথম নজরে ধাঁধাটায় কোন জ্যামিতির ব্যাপার আছে বলে মনেই হবে না। কিন্তু জ্যামিতি-জ্ঞানী সহজেই বুঝতে পারবে যে এর ভেতরে সমস্ত বিবরণের আড়ালে একটা জ্যামিতির সূত্র লুকিয়ে আছে। আসলে এটা একটা জ্যামিতির সমস্যা। জ্যামিতিকে বাদ দিয়ে এর কোন সমাধান সম্ভব নয়।

প্রশ্নটা হল: গাড়ির সামনের চাকার ধুরো (অক্ষদণ্ড) কেন পেছনের চাকার ধুরোর থেকে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়? সাধারণত দেখতে পাবে গাড়ির সামনের চাকাগুলো পেছনের চাকার চাইতে ছোট। জ্যামিতি থেকে পাচ্ছি যে একই দূরত্ব যেতে একটা ছোট পরিধির গোলককে একটা বড় পরিধির গোলকের চেয়ে বেশী ঘুরতে হবে। আর এ তো খুবই স্বাভাবিক যে সামনের চাকাটা যত বেশী ঘুরবে, তার ধুরোও তত তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যাবে।

৬২. তোমরা যদি মনে করে থাক যে বিবর্ধক কাঁচের জন্য কোণটা বেড়ে $১\frac{১}{২} \times ৪ = ৬^{\circ}$ হয়েছে তাহলে খুবই ভুল করছ। বিবর্ধক কাঁচ কোণের পরিমাপকে
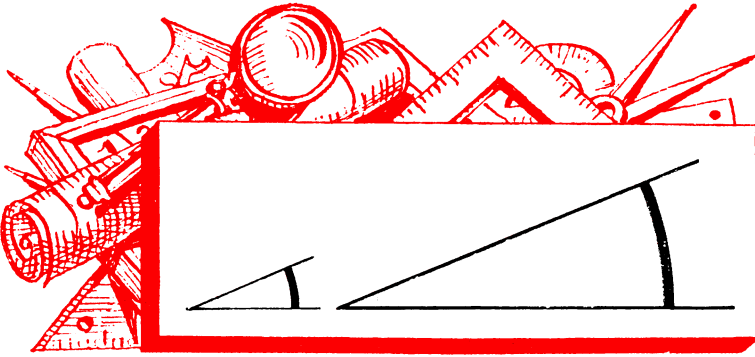
৭৫ নং ছবি

বাড়াবে না। এটা সত্যি যে কোণ-মাপক চাপের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এর ব্যাসার্ধও **সমান** অনুপাতে বাড়বে। ফলে কেন্দ্রীয় কোণের পরিমাপের কোন পরিবর্তন হবে না। ৭৫ নং ছবি থেকে এটা ভাল বোঝা যাবে।

৬৩. ৭৬ নং ছবিতে লেভেলের চাপের প্রাথমিক অবস্থা হল **চ ক ছ**। **চ´ খ ছ´** হল পরিবর্তিত অবস্থা। এদের জ্যা **চ´ ছ´** এবং **চ ছ** ১/২° কোণ তৈরি করেছে। বুদ্বুদটা প্রথমে ছিল **ক**-তে এবং এখনো ঠিক সেখানেই আছে। কিন্তু **চ ছ** চাপের মধ্যবিন্দু সরে গেছে **খ**-তে। আমাদের এখন **ক খ** চাপের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে। এর ব্যাসার্ধ হল ১ মিটার আর কোণের মাপ হল ১/২°। (এরকম হবার কারণ হচ্ছে, লম্ব বাহু দুটোর অন্তর্বর্তী সূক্ষ্ম কোণের হিসেব করছি আমরা।)

৭৬ নং ছবি

এখন হিসেব করতে আর কোন মুস্কিল নেই। ব্যাসার্ধ ১ মিটার (১০০০ মিলিমিটার) হলে পরিধি হবে

$$২ \times ৩\cdot১৪ \times ১০০০ = ৬২৮০$$

মিলিমিটার। একটি পুরো পরিধিতে আছে
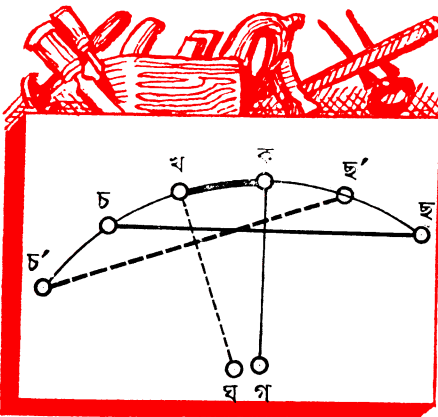
৩৬০° বা ৭২০টি অর্ধ ডিগ্রি, তাহলে এক্ষেত্রে ১/২°-তে পরিধির দৈর্ঘ্য হবে

৬২৮০ : ৭২০ = ৮ · ৭ মিলিমিটার

সুতরাং দাগ থেকে বুদ্বুদটি সরে যাবে (আসলে দাগটিই বুদ্বুদ থেকে সরে যাবে) প্রায় ৯ মিলিমিটার। এও বোঝা যাচ্ছে যে নলের বক্রতার ব্যাসার্ধ যত বাড়বে, লেভেলটিও ততই সূক্ষ্ম কাজের উপযুক্ত হবে।

৬৪. ধাঁধাটিতে চালাকির কিছু নেই: কথার ভুল মানে করার ভেতরেই আসল জিনিস রয়েছে। বেশীর ভাগ লোকেরই বোধহয় ধারণা এই যে ছয়-কোণা পেন্সিলের ছ'টি ধার। তা ঠিক নয়। যদি পেন্সিল না চোখা করা হয়ে থাকে তাহলে হবে আটটি ধার: ছ'টি ধার আর ছোট দুটি প্রান্ত। যদি সত্যিই এর মাত্র ছ'টি ধার থাকত, তাহলে পেন্সিলটির চেহারা হত একেবারে অন্যরকম — আয়তক্ষেত্রের মতো।
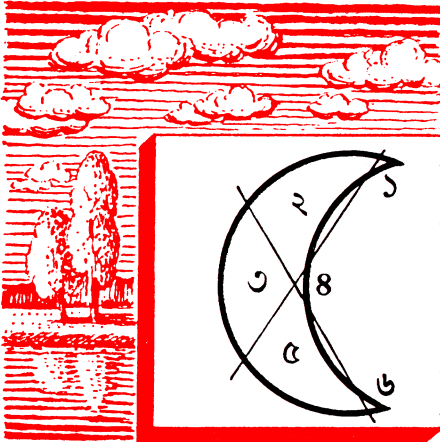
তাই পেন্সিলটাকে ছয় ধারওয়ালা না বলে ছয়কোণওয়ালা বলাই ঠিক।

৭৭ নং ছবি

৬৫. ৭৭ নং ছবির মতো করে করতে হবে এটাকে। মোট ছ'টি অংশ হবে। সুবিধের জন্য অংশগুলিতে নম্বর দেওয়া হল।

৬৬. ৭৮-ক নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে দেশলাইয়ের কাঠিগুলিকে সেভাবে সাজাতে হবে। এর আয়তন একটি দেশলাই কাঠির মাপের বর্গক্ষেত্রের চার গুণ। ব্যাপারটা সত্যিই তাই। মনে মনে আমাদের ছবিটিকে পুরো ত্রিভুজাকৃতি করা যাক। একটা সমকোণী ত্রিভুজ হল, যার ভূমি তিনটি দেশলাই কাঠির সমান, আর উচ্চতা হল চারটে কাঠির সমান।*

* পাঠকদের ভেতর যাদের পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সঙ্গে পরিচয় আছে তারা বুঝতে পারবে আমাদের ছবিটি যে সমকোণী ত্রিভুজ তাতে কোন সংশয় নেই: $৩^২+৪^২=৫^২$।
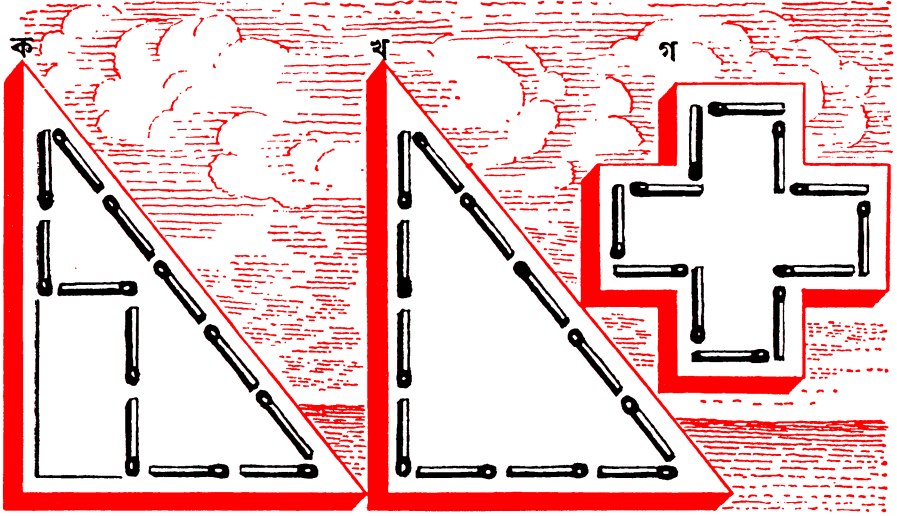
৭৮ নং ছবি

এর ক্ষেত্রফল হল ভূমির অর্ধেক আর উচ্চতার গুণফল: ১/২ × ৩ × ৪ =৬টি দেশলাই কাঠির মাপের বর্গক্ষেত্রের সমান (৭৮-খ নং ছবি)। কিন্তু আমাদের ছবির আয়তন, ত্রিভুজের আয়তন থেকে দেশলাই কাঠির মাপের দুই বর্গক্ষেত্রের মাপ কম হচ্ছে। সুতরাং, এর আয়তন ঐরকম চার বর্গক্ষেত্রের সমান।

৬৭. সীমাবদ্ধ সমস্ত সমতলক্ষেত্রের মধ্যে বৃত্তই হল সবচেয়ে বড়। অবশ্য দেশলাই কাঠি দিয়ে ঠিকঠাক বৃত্ত তৈরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু আটটি দেশলাই কাঠি দিয়ে প্রায় বৃত্তের মতোই একটি ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। এটি একটি সুষম অষ্টভুজ হবে (৭৯ নং ছবি)।

এই সুষম অষ্টভুজই আমাদের অভিষ্ট সেই ক্ষেত্রটি। কেননা এরই ক্ষেত্রফল সবচেয়ে বেশী।

৬৮. এই সমস্যার সমাধান করতে হলে পাত্রটি লম্বালম্বি ফেলে খুলে চ্যাপ্টা করে ফেলতে হবে। এটা তখন হবে একটা আয়তক্ষেত্র (৮০ নং ছবি)। এর প্রস্থ ২০ সেন্টিমিটার আর দৈর্ঘ্য হবে পরিধির সমান, অর্থাৎ ১০ × ৩ ১/৭ = = ৩১ · ৫ সেণ্টিমিটার (প্রায়)। এখন এই আয়তক্ষেত্রে মাছি আর মধুর
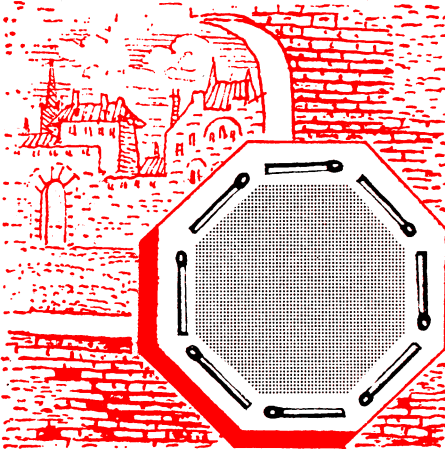
৭৯ নং ছবি
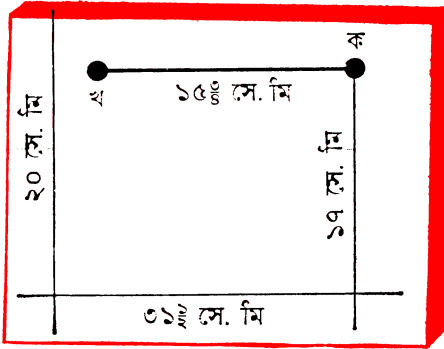
৮০ নং ছবি

ফোঁটার অবস্থান চিহ্ন দেওয়া যাক। মাছিটি আছে **ক** বিন্দুতে, ভূমি থেকে ১৭ সেন্টিমিটার দূরে। মধুর ফোঁটা আছে **খ** বিন্দুতে, ভূমি থেকে সমান উচ্চতায়, কিন্তু **ক** থেকে পাত্রের পরিধির অর্ধেকটা দূরে, অর্থাৎ ১৫½ সেন্টিমিটার দূরে।

পাত্রের ভেতর যে বিন্দু পর্যন্ত মাছিকে উঠে এসে ভেতরে নাবতে হবে তা এভাবে বের করতে হবে: **খ** বিন্দু থেকে (৮১ নং ছবি) উপরের কিনারার উপর একটি লম্বরেখা এঁকে সেই রেখাকে সমান দূরত্বে টেনে বাড়িয়ে গেলাম। এবার আমরা পেলাম **গ** বিন্দু। একটা সরল রেখা টেনে **ক** বিন্দুর সঙ্গে **গ**-র সংযোগ করা হল। তাহলে **ঘ** হবে সেই বিন্দু যেখান থেকে মাছিকে কিনারা পার হয়ে পাত্রের ভেতর ঢুকতে হবে। **ক ঘ খ** হল সবচেয়ে ছোট রাস্তা।

চ্যাপ্টা আয়তক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোট রাস্তাটি বের করে নেবার পর এটিকে আবার গোল করে পাত্রের মতন করে নিয়ে মধুর বিন্দুর কাছে পেঁছিতে মাছিটি কিভাবে এগিয়ে যায় তা দেখতে পারি (৮২ নং ছবি)।

এসব ক্ষেত্রে মাছিরা সত্যি সত্যিই এইরকম রাস্তায় যায় কিনা তা বলতে পারি না। ভাল নাক থাকায় মাছিদের পক্ষে সবচেয়ে ছোট রাস্তায় যাবার ক্ষমতা আছে। ক্ষমতার কথাই বলছি, সম্ভাবনার কথা নয়। জ্যামিতির জ্ঞান না থাকলে ভাল ঘ্রাণেন্দ্রিয় থাকাটাই যথেষ্ট নয়।

৬৯. ৮৩ নং ছবিতে এইরকম একটা ছিপি দেখানো হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ এটা সত্যিই চৌকোণা, তেকোণা এবং গোল, তিন-রকম ফুটোকেই বন্ধ করতে পারে।
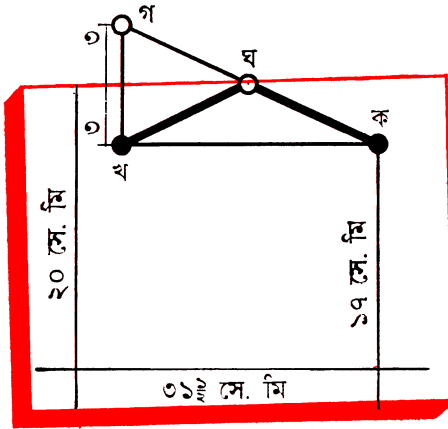
৮১ নং ছবি
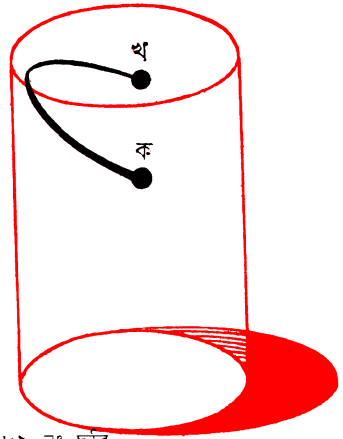
৮২ নং ছবি

৮৩ নং ছবি

৮৪ নং ছবি

৮৫ নং ছবি

৭০. ৮৪ নং ছবিতে গোল, চৌকোণা এবং ক্রুশ আকারের ফুটো বন্ধ করতে পারে এমন আরও একটি ছিপি আছে। এর তিনটে দিকই দেখানো হয়েছে।

৭১. হ্যাঁ, এরকম ছিপিও হয় — এর সবকটা অংশ ৮৫ নং ছবিতে দেখতে পাবে।

৭২. অদ্ভুত মনে হলেও ছোট্ট ফুটো দিয়ে একটা ৫ কোপেক মুদ্রা গলানো সম্ভব। কাগজটাকে ভাঁজ করে ফেলে গোল ছিদ্রটিকে টেনে লম্বা করে (৮৬ নং ছবি), তার ভেতর দিয়ে ৫ কোপেক মুদ্রা গলিয়ে আনা যায়।
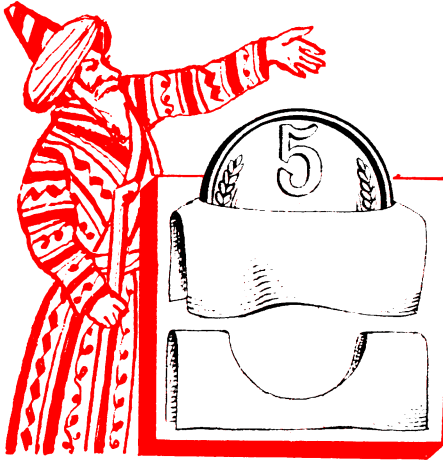
৮৬ নং ছবি

এই কৌশলের কাজটা জ্যামিতি দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ২ কোপেক মুদ্রার ব্যাস হল ১৮ মিলিমিটার। এর পরিধি বের করা কঠিন নয়: ৫৬ মিলিমিটারের অল্প একটু বেশী। সরু পথটার দৈর্ঘ্য এর অর্ধেক বা ২৮ মিলিমিটার। এখন ৫ কোপেক মুদ্রার ব্যাস হল ২৫ মিলিমিটার। এটা ১·৫ মিলিমিটার পুরু হলেও ২৮ মিলিমিটারের সরু পথ দিয়ে বেশ গলে যেতে পারবে।

৭৩. গম্বুজটির আসল উচ্চতা বের করতে হলে ফোটোর ভেতরে এর উচ্চতা ও ভিতের মাপ ঠিকঠাক নিতে হবে। ধরা যাক, মাপগুলি হল ৯৫ ও ১৯ মি.মি। এরপর আসল গম্বুজের ভিতের মাপটা নাও। ধরা যাক, ভিতের প্রস্থ হল ১৪ মিটার।

জ্যামিতি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে ফোটোর গম্বুজ আর আসল গম্বুজ একই জিনিসের ভিন্ন অনুপাত। অর্থাৎ ফোটোর গম্বুজের উচ্চতা আর ভিতের অনুপাত এবং আসল গম্বুজের উচ্চতা আর ভিতের অনুপাত সমান। প্রথম ক্ষেত্রে এটা হল ৯৫ : ১৯, অর্থাৎ ৫। তাহলে গম্বুজের উচ্চতা ভিতের চাইতে ৫ গুণ বেশী।

সুতরাং আসল গম্বুজের উচ্চতা হবে: ১৪ × ৫ = ৭০ মিটার।

অবশ্য, একটা 'কিন্তু' আছে। গম্বুজের উচ্চতা বের করতে হলে সত্যিকারের

ভাল ফোটো চাই। অনভিজ্ঞ সখের ফোটোগ্রাফারের হাতে সাধারণত যা ওঠে তেমন বিকৃত ছবি হলে চলবে না।

৭৪. প্রায়ই এই দুটো প্রশ্নের উত্তরে হাঁ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ত্রিভুজগুলোই সদৃশ। সাধারণভাবে বলতে গেলে ছবির ফ্রেমের বাইরের এবং ভেতরের দিকের আয়তক্ষেত্রগুলি সদৃশ নয়। সদৃশ ত্রিভুজ হতে হলে অনুরূপ কোণগুলি সমান হলেই যথেষ্ট। এখানে যেহেতু বাইরের ত্রিভুজের বাহুগুলির সঙ্গে ভেতরের ত্রিভুজের বাহুগুলি সমান্তরাল সুতরাং চিত্রদুটি সদৃশ। সদৃশ বহুভুজ হতে হলে কিন্তু তাদের কোণগুলো সমান হলেই (অথবা বাহুগুলো সমান্তরাল হলেই — অবশ্য ব্যাপারটা তাতে একই দাঁড়ায়) যথেষ্ট নয়। বহুভুজের বাহুগুলোকে সমানুপাতিক হতে হবে। ছবির ফ্রেমের বাইরের এবং ভেতরের আয়তক্ষেত্রগুলির মধ্যে একমাত্র বর্গক্ষেত্রের বেলায়ই (সাধারণত রম্বসের ক্ষেত্রে) সদৃশ হওয়া সম্ভব। এছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে বাইরের এবং ভেতরের আয়তক্ষেত্রের বাহুগুলি সমানুপাতিক নয়। সুতরাং চিত্রগুলি সদৃশ নয়। মোটা আয়তক্ষেত্রের মতো ফ্রেমগুলোতে এই

৮৭ নং ছবি

সাদৃশ্যের অভাব আরও বেশী পরিষ্কার (৮৭ নং ছবি)। বাঁদিকের ফ্রেমের বাইরের বাহুগুলি আছে ২ : ১ অনুপাতে আর ভেতরের বাহুগুলো আছে ৪ : ১ অনুপাতে। ডানদিকের ফ্রেমে আছে পর্যায়ক্রমে ৪ : ৩ এবং ২ : ১ অনুপাতে।

৭৫. অনেকেই একথা শুনে আশ্চর্য হবে যে এই ধাঁধার সমাধান করতে পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব ও সূর্যের ব্যাস ইত্যাদি জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান দরকার।

একটা তারের নিখুঁত ছায়ার দৈর্ঘ্য কতটা হবে তা ৮৮ নং ছবির জ্যামিতিক চিত্র দিয়ে বের করা যেতে পারে। এটা খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে সূর্যের ব্যাস (১৪ লক্ষ কিলোমিটার) থেকে পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব
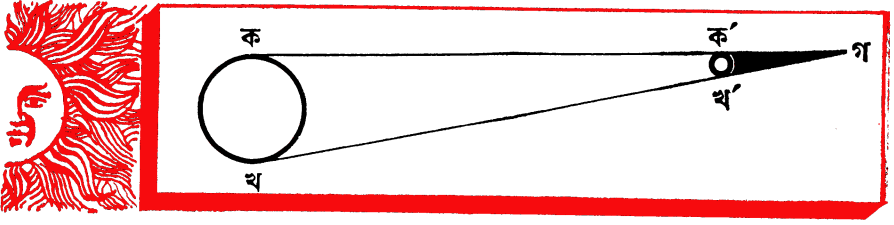
৮৮ নং ছবি

(১৫,00,00,000 কিলোমিটার) যতগুণ বেশী তারের ব্যাস থেকে তারের ছায়াও ততগুণ বড়। মোটামুটিভাবে, সূর্যের ব্যাস ও পৃথিবী এবং সূর্যের দূরত্বের অনুপাত প্রায় ১ : ১১৫। সুতরাং তারের নিখুঁত ছায়ার দৈর্ঘ্য হবে:

$$৪ \times ১১৫ = ৪৬০ \text{ মিলিমিটার} = ৪৬ \text{ সেন্টিমিটার}$$

নিখুঁত ছায়ার দৈর্ঘ্য এরকম নগণ্য মাপের হয় বলেই ছায়াটা মাটি বা দেওয়ালের উপর সবসময় দেখা যায় না। আবছা দাগ যা দেখা যায় তা ছায়া নয়, উপচ্ছায়া।

এই ধরনের সমস্যা সমাধানের আর একটি পদ্ধতি ৭ নম্বর ধাঁধায় দেখানো হয়েছে।

৭৬. খেলার ইঁটের ওজন হবে ১ কিলোগ্রাম অর্থাৎ চারভাগ কম — এরকম উত্তর দিলে তা একেবারে ভুল হবে। ছোট ইঁটটা আসল ইঁট থেকে কেবল দৈর্ঘ্যেই চারভাগ কম নয়, প্রস্থে এবং উচ্চতায়ও চারভাগ করে কম। সুতরাং এর ঘনফল এবং ওজনও ৪ × ৪ × ৪ = ৬৪ ভাগ কম। সুতরাং ঠিক উত্তর হবে: ৪000 : ৬৪ = ৬২ · ৫ গ্রাম।

৭৭. এই ধাঁধাটাও ঠিক উপরের ধাঁধার মতো। সুতরাং তোমাদের এটা ঠিকভাবে করা উচিত। মানুষের শরীর মোটামুটিভাবে সদৃশ। সুতরাং যদি কারও উচ্চতা দ্বিগুণ হয় তাহলে তার ওজন অন্যজনের ওজনের চাইতে দ্বিগুণ নয়, আট গুণ বেশী হবে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় যে মানুষটির কথা জানা যায় সে ছিল একজন অ্যালসেশিয়ান — ২ · ৭৫ মিটার লম্বা, অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক উচ্চতা থেকে প্রায় ১ মিটার বেশী লম্বা। সবচেয়ে ছোট মানুষটি ছিল একজন লিলিপুটীয়। সে ছিল ৪0 সেন্টিমিটারের চেয়েও বেঁটে। তাহলে

মোটামুটিভাবে বলা যায় ছোট মানুষটি অ্যালসেশিয়ানটির চাইতে ছিল সাত ভাগ খাটো। এদের মেপে সমান করতে হলে পাল্লার একদিকে চাপাতে হবে ৭ × ৭ × ৭ = ৩৪৩ জন বেঁটে মানুষ। অর্থাৎ বেঁটে মানুষদের দস্তুরমতো একটা দঙ্গল।

৭৮. বড় তরমুজটির আয়তন ছোটটির থেকে

$$১ ১/৪ \times ১ ১/৪ \times ১ ১/৪ = ১২৫/৬৪$$

গুণ বেশী, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং বড় তরমুজ কেনাই ভাল। এর দাম ছোটটির থেকে মাত্র দেড় গুণ বেশী, কিন্তু খোলটি দ্বিগুণেরও বেশী।

এখন তোমরা প্রশ্ন করতে পার ফলওয়ালারা কেন তাহলে দ্বিগুণ দাম না চেয়ে মাত্র দেড় গুণ দাম চায় ? কারণ খুবই সহজ। বেশীর ভাগ ফলওয়ালাই জ্যামিতিতে কাঁচা। কিন্তু এ ব্যাপারে ক্রেতারাও একইরকম। সেজন্যই তারা অনেক সময় এই লাভজনক প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে বসে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ছোট তরমুজ কেনার চাইতে বড় তরমুজ কেনাই ভাল, কেননা সেগুলোর দাম আসলে যা হওয়া উচিত তার থেকে সবসময়ই কম থাকে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্রেতা তা আন্দাজ করতেও পারে না।

একই কারণে ছোট ডিম কেনার চাইতে বড় ডিম কেনা অনেক লাভের, অবশ্য যদি তা ওজনদরে বিক্রি না হয়।

৭৯. একাধিক পরিধির ভেতরে যে অনুপাত থাকে তাদের ব্যাসও সেই একই অনুপাত অনুযায়ী হয়। যদি একটি ফুটির পরিধি হয় ৬০ সেন্টিমিটার ও অন্যটির হয় ৫০ সেন্টিমিটার, তাহলে তাদের ভেতর অনুপাত হবে ৬০ : ৫০ = ৬/৫ এবং তাদের আকৃতির অনুপাত হবে:

$$(৬/৫)^{\circ} = ২১৬/১২৫ \approx ১ \cdot ৭৩$$

বড় ফুটিটির দাম যদি আকৃতি (বা ওজন) অনুযায়ী ধরা হয় তাহলে তার দাম হওয়া উচিত ছোটটির চাইতে ১ · ৭৩ গুণ বা ৭৩ শতাংশ বেশী। কিন্তু বিক্রেতারা শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র বেশী দাম চেয়ে থাকে। তাহলে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে বড় ফুটি কেনা অনেক লাভের।

৮০. ধাঁধাটিতে দেওয়া আছে যে চেরী ফলের ব্যাস তার বীচির ব্যাসের তিন গুণ।

সুতরাং চেরী ফলের আয়তন বীচির চাইতে ৩ × ৩ × ৩ = ২৭ গুণ বেশী। তার অর্থ বীচিটা চেরী ফলের ১/২৭ ভাগ জুড়ে থাকে আর শাঁসটা থাকে বাকি ২৬/২৭ অংশে। তার মানে শাঁসটা বীচির চাইতে আয়তনে ২৬ গুণ বড়।

৮১. যদি আসল এইফেল টাওয়ার থেকে তার মডেলটা ৮ লক্ষ ভাগ ওজনের হয় এবং তারা একই ধাতু দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে মডেলের আয়তন আসল টাওয়ারের আয়তন থেকে ৮ লক্ষ ভাগ কম হওয়া উচিত। আমরা জানি একইরকম চেহারার জিনিসের অনুপাত আর তাদের উচ্চতার ঘনফলের অনুপাত অভিন্ন। সুতরাং মডেলটির মাপ আসল টাওয়ারের চাইতে ২০০ ভাগ কম হবে, কারণ

$$২০০ \times ২০০ \times ২০০ = ৮০,০০,০০০।$$

এইফেল টাওয়ারের উচ্চতা ৩০০ মিটার। সুতরাং মডেলের উচ্চতা হবে

$$৩০০ : ২০০ = ১\tfrac{১}{২} \text{মিটর।}$$

তাহলে মডেলটির উচ্চতা প্রায় একজন মানুষের সমান হবে।

৮২. দুটো কড়াই জ্যামিতিকভাবে সদৃশ। যদি বড় কড়াইয়ে আট গুণ বেশী জায়গা হয় তাহলে এর সমস্ত রৈখিক মাপ দ্বিগুণ বেশী হবে। এটা উচ্চতায় ও প্রস্থেও হবে দ্বিগুণ। তাই যদি হয় তাহলে এর পৃষ্ঠতল হবে ২ × ২ = ৪ গুণ বড়। কারণ অনুরূপ জিনিসের পৃষ্ঠতলের অনুপাত এবং তাদের রৈখিক মাপের বর্গফলের অনুপাত অভিন্ন। এদের দেওয়াল সমান পুরু। কড়াইয়ের ওজন নির্ভর করছে পৃষ্ঠতলের মাপের ওপর। সুতরাং উত্তর হবে: বড় কড়াইটা চার গুণ ভারী।

৮৩. প্রথম নজরে ধাঁধাটায় যে অঙ্কের কিছু আছে তা মনেই হবে না। কিন্তু আসলে আগেরটার মতো এটারও সমাধান হবে জ্যামিতির সাহায্যে।

এই ধাঁধাটা সমাধান করতে বসার আগে আর একটা ঐ ধরনেরই, কিন্তু সোজা ধাঁধা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

একটা ছোট আর একটা বড় — দুটো বয়লার। দুটো আকারে একইরকম এবং একই উপাদানে তৈরি। তাদের ভর্তি করা হল গরম জল দিয়ে। এদের ভেতর কোনটায় জল তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে?

জিনিস সাধারণত ঠাণ্ডা হয় উপরিভাগ থেকে। সুতরাং যে বয়লারে প্রতি একক ঘনত্বে বড় পৃষ্ঠতল থাকবে তা ঠাণ্ডা হবে তাড়াতাড়ি। যদি একটি বয়লার অন্যটির থেকে ন গুণ উঁচু, ন গুণ চওড়া হয় তাহলে এর পৃষ্ঠতল হবে $ন^২$ গুণ ও আয়তন $ন^৩$ গুণ বড়। বড় বয়লারটিতে প্রতিটি একক পৃষ্ঠতলের ভাগে আছে ন গুণ বেশী আয়তন। সুতরাং ছোট বয়লার ঠাণ্ডা হবে তাড়াতাড়ি।

একই কারণে শীতের দিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি শিশু ঠিক তারই মতো পোশাক-পরা কোন বয়স্ক লোকের চাইতে ঠাণ্ডা অনুভব করবে অনেক বেশী। দু'জনের ক্ষেত্রেই তাদের শরীরের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে উত্তাপের পরিমাণ প্রায় সমান। কিন্তু শিশুটির শরীরের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে বয়স্ক লোকটির চাইতে ঠাণ্ডা হবার মতো বহির্ভাগ রয়েছে বেশী।

এই কারণেই শরীরের অন্য অংশের চাইতে মানুষের আঙ্গুলে এবং নাকে বেশী ঠাণ্ডা লাগে ও এই জায়গাগুলো তুষারাহত হয়ে থাকে। কেননা শরীরের আয়তনের তুলনায় শরীরের অন্য অংশের বহির্ভাগ কোথাও এত বড় নয়।

সবশেষে আর একটা উদাহরণও একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: গাছের গুঁড়িতে আগুন ধরতে যে সময় লাগে, সেই গুঁড়ি থেকেই চেরা কাঠে আগুন ধরতে তার অনেক কম সময় লাগে।

উত্তাপ কোন জিনিসের গায়ের উপরিভাগ থেকে সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তাই কাঠের উপরিভাগ ও আয়তনের (ধরা যাক বর্গক্ষেত্রের মতো টুকরো) সঙ্গে সমান দৈর্ঘ্যের ও বর্গক্ষেত্রের মতো টুকরো চেহারার গাছের গুঁড়ির পৃষ্ঠতল ও আয়তনের তুলনা করে দু'ক্ষেত্রে প্রতি একক ঘন সেন্টিমিটার কাঠে কতটা পৃষ্ঠতল আছে তা বের করতে হবে। যদি গাছের গুঁড়ি চেরা কাঠ থেকে দশ গুণ মোটা হয় তাহলে গুঁড়ির বাইরের দিকের গা চেরা কাঠের গা থেকে দশ গুণ বেশী বড় হবে। আর আয়তন হবে ১০০ গুণ। প্রতি একক পৃষ্ঠতলে যতটা পরিমাণ কাঠ গাছের গুঁড়িতে আছে, চেরাই কাঠে আছে তার দশ ভাগের এক ভাগ। তাহলে একই পরিমাণের তাপ চেরাই কাঠে গরম করে তুলছে দশ ভাগের এক ভাগ উপাদানকে। সুতরাং একই উৎস থেকে উত্তাপ কাঠের গুঁড়ির চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি আগুন ধরায় চেরা কাঠে। (কাঠের তাপ পরিবহণ করার ক্ষমতা খুব কম। সুতরাং এই তুলনাকে মোটামুটি ঠিক ধরতে হবে। এটাই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্য এবং উপাদানের পরিমাণের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।)

৯

বৃষ্টি ও তুষারের জ্যামিতি
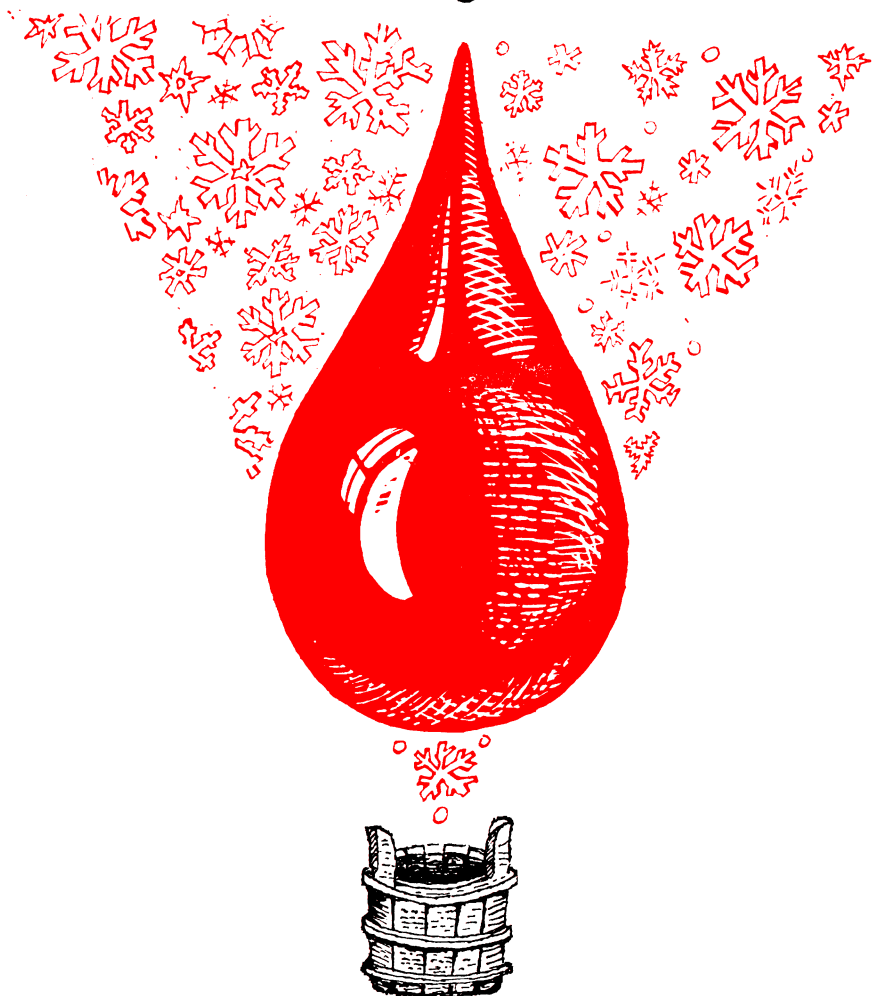
৮৪. বৃষ্টি মাপার যন্ত্র: প্লুভিওমিটার

সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনগ্রাদকে অতিবৃষ্টির শহর বলে মনে করা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, মস্কোর থেকেও এখানে অনেক বেশী বৃষ্টি হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা তা অস্বীকার করেন। তাঁরা দাবি করেন যে বৃষ্টি লেনিনগ্রাদের থেকে অনেক বেশী জল দেয় মস্কোতে। তাঁরা কিভাবে জানলেন এটা? সত্যিই কি বৃষ্টির জল মাপার কোনও যন্ত্র আছে?

কাজটা কঠিন বলেই মনে হবে। কিন্তু এটা কী করে করতে হয় তা তোমরা নিজেরাই শিখতে পার। যত জল মাটির উপর নেমে আসে তার সবটাকেই জমাতে হবে এমন ভেব না কিন্তু। যদি বৃষ্টির জল ছড়িয়ে না পড়ত বা মাটি জল শুষে না নিত, তাহলে শুধু জলের গভীরতা মেপে নিলেই হত। সে কাজটা কিছু কঠিনও হত না। যখন বৃষ্টি হয় তখন তা সব জায়গাতেই সমানভাবে পড়ে। বাগানের একটা ফুলের বেডে বেশী জল পড়ল বা পাশেরটায় কম পড়ল এমন কোন ঘটনা ঘটে না। সুতরাং কোন এক জায়গায় জলের গভীরতা মেপে নিলেই সমস্ত জায়গাটায় জলের গভীরতা জানার পক্ষে যথেষ্ট হত।

এতক্ষণে বোধহয় তোমরা আন্দাজ করেছ, বৃষ্টির জল মাপতে হলে তোমাদের কী করতে হবে। তোমাদের যা করতে হবে তা হল: একটা ছোট পাত্র নিতে হবে যার থেকে জল ছড়িয়ে পড়বে না বা মাটিতে শুষে যাবে না। যেকোন মুখখোলা পাত্র, যেমন ধর একটা বালতিতেই কাজ চলে যাবে। যদি তোমাদের কাছে কোন খাড়া দেওয়ালওয়ালা পাত্র থাকে (যার চেহারা হবে খাড়া দেওয়ালওয়ালা গোল সিলিন্ডারের মতো) তবে বৃষ্টির সময় সেটা বাইরে রেখে দিও।* বৃষ্টি থামলে পাত্রের ভেতর জলের গভীরতা মেপে নাও। তাহলেই তোমার দরকার যা তা পেয়ে গেলে।

---

* পাত্রটাকে যথাসম্ভব উঁচুতে রাখতে হবে যাতে যে ফোঁটাগুলো মাটিতে পড়বে তা ছিটকে উঠে পাত্রের ভেতর না ঢোকে।

দেখা যাক, আমাদের ঘরে তৈরি বৃষ্টিমাপক যন্ত্র — প্লুভিওমিটার — কেমন কাজ করে। বালতির ভেতরে জলের গভীরতা মাপা হবে কী করে? একটা রুলার দিয়ে? এ উপায়টা মন্দ নয়, যদি ভেতরে জল যথেষ্ট থাকে। কিন্তু সাধারণত মাত্র ২ কি ৩ সেন্টিমিটার জল জমে বালতিতে, আবার কখনও জমে মাত্র অল্প কয়েক মিলিমিটার। সেসব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে মাপা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের কাজে প্রতিটি মিলিমিটার, এমনকি তার প্রতিটি ভগ্নাংশও খুব মূল্যবান। তাহলে কী করা যায়?

সবচেয়ে ভাল হবে জলটাকে বালতি থেকে খুব সরু কোনও কাঁচের পাত্রে ভরে নেওয়া। তাহলে জলটা বেশ উঁচু হয়ে থাকবে। আর স্বচ্ছ দেওয়ালের ভেতর দিয়ে জল কতটা উঁচু হয়ে জমেছে তা দেখাও সহজ হবে। অবশ্য সরু পাত্রে জমা জলের গভীরতা বালতির জলের মাপ হবে না। কিন্তু এভাবে একটা মাপকে আর একটা মাপে পরিবর্তন করে নেওয়া যায়। যদি সরু পাত্রের ব্যাস আমাদের প্লুভিওমিটার, অর্থাৎ বালতির দশ ভাগের এক ভাগ হয়, তাহলে এর ভিতের আয়তন বালতির ভিতের আয়তনের ১০ × ১০ = ১০০ ভাগ ছোট হবে। অর্থাৎ সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, কাঁচের পাত্রে জলের লেভেলটা থাকবে বালতিতে যেখানে ছিল তার ১০০ গুণ উপরে। যদি বালতিতে বৃষ্টির জল থাকে ২ মিলিমিটার উচ্চতায়, তাহলে কাঁচের পাত্রে থাকবে ২০০ মিলিমিটার বা ২০ সেন্টিমিটার উচ্চতায়।

এই হিসেব থেকে দেখা যাবে যে বালতি (প্লুভিওমিটার) থেকে পাত্রটা খুব বেশী সরু হওয়া উচিত নয়। কেননা তাহলে বৃষ্টির জলের গভীরতা মাপার জন্য আমাদের খুব বেশী লম্বা পাত্র দরকার হবে। এটা পাঁচ ভাগের এক ভাগ সরু হলেই যথেষ্ট। তাহলে এর ভিতের আয়তন বালতির ভিতের আয়তন থেকে ২৫ ভাগ ছোট হবে। আর জলের লেভেল উঠবে ২৫ গুণ উপরে। বালতির প্রতি মিলিমিটার জল কাঁচের পাত্রের ২৫ মিলিমিটার জলের সমান হবে। কাজের সুবিধার জন্য কাঁচের গ্লাসের বাইরের দিকে একটুকরো কাগজ সেঁটে দাও। একে প্রতিটি এক মিলিটিমার করে ২৫টা ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগে ১, ২, ৩ ইত্যাদি লিখে দাও। কাঁচের পাত্রে জলের উচ্চতা দেখে সোজাসুজিই প্লুভিওমিটারের বালতিতে কতটা জল জমেছে তা জানতে পারবে, কোন পরিবর্তনের হিসেবে করতে হবে না। যদি কাঁচের পাত্রের ব্যাস বালতির ব্যাসের থেকে পাঁচ ভাগ কম না হয়ে চার ভাগ হয় তাহলে কাগজের টুকরোর ওপরের ভাগগুলো ১৬ মিলিমিটার ফাঁক হবে।

একটা বালতি থেকে সরু কাঁচের পাত্রে জল ঢালা খুবই অসুবিধের ব্যাপার। এর একটা সুবিধেজনক সমাধান হবে বালতির দেওয়ালের গায়ে ফুটো করে নিয়ে একটা কাঁচের টিউব দিয়ে জলটা বের করে নেওয়া।

তাহলে এবার বৃষ্টির জলের গভীরতা মাপার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হল। একটা বালতি আর বাড়িতে তৈরি বৃষ্টি মাপার পাত্র কিন্তু আবহাওয়া অফিসের আসল প্লুভিওমিটার বা দাগ-কাটা কাঁচের গ্লাসের মতো হবে না। তবু এই সাধারণ এবং সস্তা যন্ত্র দিয়ে তুমি অনেক শিক্ষাপ্রদ হিসেব করে ফেলতে পারবে। এখানে আর কয়েকটা সমস্যা দেওয়া হল।

৮৫. কতটা বৃষ্টি হল?

তোমাদের সব্‌জিবাগানটি ৪০ মিটার লম্বা ও ২৪ মিটার চওড়া। সবে বৃষ্টি থেমেছে। এই বাগানে কতটা বৃষ্টি হয়েছে তুমি জানতে চাও। এখন মাপটা কী করে হবে?

বৃষ্টির জলের গভীরতা বের করা থেকে শুরু করতে হবে। এটা না জানলে কিছু করা যাবে না। ধরা যাক, তোমার বাড়িতে তৈরি বৃষ্টিমাপক যন্ত্র প্লুভিওমিটারে ৪ মিলিমিটার জল জমেছে। যদি মাটি শুষে না নিয়ে থাকে তাহলে সব্‌জিবাগানে প্রতি বর্গ মিটারে কত ঘন সেন্টিমিটার করে জল পড়েছে, তা হিসেব করা যাক। এক বর্গ মিটারের অর্থ ১০০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১০০ সেন্টিমিটার চওড়া ক্ষেত্র। এটা ঢাকা পড়েছে ৪ মিলিমিটার অর্থাৎ ০·৪ সেন্টিমিটার জলে। তাহলে এই জলের স্তরের আয়তন হবে: ১০০ × ১০০ × ০·৪ = ৪০০০ ঘন সেন্টিমিটার।

তোমরা জান যে ১ ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজন হল ১ গ্রাম। সুতরাং, সব্‌জিবাগানের প্রতি বর্গ মিটারে ৪০০০ গ্রাম বা ৪ কিলোগ্রাম করে জল হয়েছে। তোমাদের বাগানের ক্ষেত্রফল হল: ৪০ × ২৪ = ৯৬০ বর্গ মিটার। অর্থাৎ তোমাদের সব্‌জিবাগানে যতটা বৃষ্টি হয়েছে তার ওজন হল ৪ × ৯৬০ = ৩৮৪০ কিলোগ্রাম অথবা ৪ টন থেকে কিছু কম।

একটা মজা করা যাক। হিসেব কর তো বৃষ্টিতে তোমার বাগানে যতটা জল হয়েছে বালতি করে তা আনতে গেলে কতগুলো বালতি লাগবে? একটা সাধারণ বালতিতে প্রায় ১২ কিলোগ্রাম জল ধরে। তাহলে, বৃষ্টিতে মোট ৩৮৪০ : ১২ = ৩২০ বালতি জল হয়েছে তোমার বাগানে।

তাহলে মিনিট পনেরোর মধ্যে তোমার বাগানে যে বৃষ্টি হয়েছে সেই পরিমাণ জলের জন্য তোমাকে ৩০০-রও বেশী বালতি জল এনে ঢালতে হত।

এক পশলা বৃষ্টি বা ঝিরঝিরে বৃষ্টিকে কি অংক দিয়ে হিসেব করা যায়? তার জন্য আবার প্রতি মিনিটে কত মিলিমিটার করে বৃষ্টি হচ্ছে তা বের করতে হবে। যদি এমন বৃষ্টি হয় যে প্রতি মিনিটে ২ মিলিমিটার করে জল পড়ে তাহলে এটা হবে অস্বাভাবিক বর্ষণ। শরৎকালের ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ১ মিলিমিটার জল জমতে প্রায় একঘণ্টা বা তার বেশী সময় লাগে।

তাহলে দেখছ বৃষ্টির জলের গভীরতা মাপা শুধু যে সম্ভব তাই নয়, উপায়টা খুব সহজও। যদি চাও তাহলে বৃষ্টির ফোঁটার সংখ্যাও গুনতে পার, অবশ্য মোটামুটিভাবে।* আসলে সাধারণ বৃষ্টিতে প্রতি গ্রামে গড়ে প্রায় ১২টা করে ফোঁটা হয়। তাহলে উপরের যে বৃষ্টির কথা বলছিলাম তাতে ছিল বর্গ মিটার প্রতি ৪০০০ × ১২ = ৪৮,০০০ ফোঁটা। সারা সব্জিবাগানে মোট কত ফোঁটা জল পড়েছিল তা বের করা কঠিন নয়। কিন্তু হিসেবটা খুব উৎসাহজনক হলেও তা কোন কাজে আসবে না। একটিমাত্র কারণে কথাটি উল্লেখ করলাম আমরা, খুব অবিশ্বাস্য রকমের হিসেব এটা, শুধু কি করে হিসেব করতে হবে তা যদি জানা থাকে।

৮৬. কতটা তুষার?

বৃষ্টির জলের গভীরতা কী করে মাপতে হয় তা আমরা শিখেছি। শিলাবৃষ্টি হলে জলের গভীরতা মাপব কী করে? ব্যাপারটা একই। শিলাবৃষ্টির শিলের টুকরোগুলো বৃষ্টি মাপার যন্ত্রের ভেতরে পড়ে গলে যাবে। তারপর গভীরতা মেপে নাও।

কিন্তু তুষারবৃষ্টির সময় এর তফাত হবে। এক্ষেত্রে প্লুভিওমিটারে সঠিক হিসেব পাওয়া যাবে না। কারণ বাতাসের জন্য কিছুটা তুষার বালতির বাইরে পড়বে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে তুষারজলের গভীরতা প্লুভিওমিটার ছাড়াই মাপা সম্ভব। কোনও উঠান বা মাঠের ভেতর তুষারের গভীরতা একটা কাঠের লাঠির সাহায্যেই মাপা যেতে পারে। বরফ গলে যাবার পর জলের গভীরতা কতটা হবে তা বের করার জন্য একটা পরীক্ষা করতে হবে। সমান ভঙ্গুর বরফ দিয়ে একটা বালতি বোঝাই কর। বরফটা গলতে দাও, তারপর গভীরতা মেপে নাও। তাহলেই এক সেন্টিমিটার বরফে কতটা জল পাবে তা বের করে ফেলবে। এটা জানা হলে বরফের গভীরতাকে জলের গভীরতায় পরিণত করতে কোন অসুবিধে নেই।

---

* বৃষ্টি সবসময়েই ফোঁটা ফোঁটা পড়ে, যখন আমরা ভাবি হুড় হুড় করে জল পড়ছে তখনও।

গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন বৃষ্টির জল মেপে নিয়ে তার সঙ্গে শীতকালে প্রতিদিন বরফ থেকে কতটা করে জল পাবে তা যোগ করতে ভুলো না। এতে বছরে তোমাদের জেলায় কতটা জল জমে তা জানতে পারবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, কারণ এ থেকে ঐ স্থানের বারিপাত জানা যায়। 'বারিপাত' বলতে আমরা বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি বা তুষারবৃষ্টি সবরকমের জল জমার কথা বুঝি।

নীচে সোভিয়েত ইউনিয়নের কতকগুলো শহরে গড়পড়তা বার্ষিক বারিপাতের হিসেব দেওয়া হল:

লেনিনগ্রাদ	৪৭	সে.মি	আস্ত্রাখান	১৪	সে.মি
ভোলোগ্দা	৪৫	,,	কুতাইসি	১৭৯	,,
আর্খাঙ্গেলস্ক	৪১	,,	বাকু	২৪	,,
মস্কো	৫৫	,,	স্ভের্দ্লোভ্স্ক . . .	৩৬	,,
কস্ত্রমা	৪৯	,,	তবোল্স্ক	৪৩	,,
কাজান	৪৪	,,	সেমিপালাতিন্স্ক . . .	২১	,,
কুইবিশেভ	৩৯	,,	আল্মা-আতা	৫১	,,
চ্কালভ	৪৩	,,	তাশখন্দ .	৩১	,,
ওদেসা	৪০	,,	ইয়েনিসেইস্ক	৩৯	,,
			ইর্কুত্স্ক . .	৪৪	,,

এদের ভেতর সবচেয়ে বেশী বারিপাত হয় কুতাইসিতে (১৭৯ সেন্টিমিটার) আর আস্ত্রাখানে হয় সবচেয়ে কম (১৪ সেন্টিমিটার), কুতাইসির চেয়ে ১৩ ভাগ কম। কিন্তু কুতাইসির চাইতেও অনেক বেশী বারিপাত হয় এমন একাধিক জায়গা পৃথিবীতে আছে। উদাহরণ দিচ্ছি: ভারতবর্ষে এমন একটি জেলা যা প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে যায়; এখানে বছরে বৃষ্টি হয় ১২৬০ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ ১২ · ৫ মিটারেরও বেশী! একবার তো দিনে ১০০ সেন্টিমিটারেরও বেশী বৃষ্টি হয়েছিল। আবার আস্ত্রাখানের চেয়েও অনেক কম বৃষ্টি হয় এমন জায়গাও আছে, যেমন চিলিতে একটি অঞ্চলে বছরে বৃষ্টিপাতের অঙ্ক ১ সেন্টিমিটারেরও কম।

যেসব এলাকায় বছরে ২৫ সেন্টিমিটারের কম বৃষ্টি হয় সেগুলি অনাবৃষ্টির অঞ্চল। সেখানে কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা ছাড়া চাষবাস অসম্ভব।

এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ, পৃথিবীর নানা জায়গায় বাৎসরিক বারিপাতের পরিমাণ মেপে ফেলতে পারলে সারা পৃথিবীতে বাৎসরিক বৃষ্টির গড়পড়তা হিসেব করা সম্ভব। স্থলভাগে গড়পড়তা বাৎসরিক বৃষ্টি

হয় ৭৮ সেন্টিমিটার। শোনা যায়, স্থলভাগে যতটা বৃষ্টি হয়, জলভাগের ঠিক ততটা পরিমাণ অঞ্চলে প্রায় একই পরিমাণ বৃষ্টি হয়। এটা জানা থাকলে সারা পৃথিবীতে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি বা তুষারপাত ইত্যাদিতে কতটা জল জমে তা হিসেব করা কঠিন নয়। সেজন্য সারা পৃথিবীর উপরিভাগের আয়তন কত তা জানা দরকার। যদি তা না জানা থাকে তাহলে এভাবে হিসেব করে নাও।

এক মিটার হল পৃথিবীর পরিধির ঠিক ৪ কোটি ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধি ৪ কোটি মিটার বা ৪০,০০০ কিলোমিটার। পৃথিবীর ব্যাস হল পরিধির প্রায় ৩ ১/৭ ভাগ ছোট। তাহলে পৃথিবীর ব্যাস সহজেই হিসেব করা যেতে পারে:

৪০,০০০ : ৩ ১/৭ ≈ ১২,৭০০ কিলোমিটার।

কোনও গোল বস্তুর বাইরের দিকের আয়তন বের করার নিয়ম হল ব্যাসকে তারই সঙ্গে গুণ করে আবার ৩ ১/৭ দিয়ে গুণ করা:

১২.৭০০ × ১২,৭০০ × ৩ ১/৭ = ৫০,৯০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

(উত্তরে চতুর্থ রাশি থেকে শুধু শূন্য লেখা হল, কেননা মাত্র প্রথম তিনটে রাশিই নির্ভরযোগ্য।)

তাহলে, ভূপৃষ্ঠের আয়তন ৫০৯০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

এখন আমাদের প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। প্রথমে হিসেব করছি পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতটা করে বৃষ্টি হয়। ১ বর্গ মিটার বা ১০,০০০ বর্গ সেন্টিমিটারে হয়:

৭৮ × ১০,০০০ = ৭,৮০,০০০ ঘন সেন্টিমিটার।

প্রতি বর্গ কিলোমিটারে আছে ১০০০ × ১০০০ = ১০,০০০০০ বর্গ মিটার। তাহলে প্রতি বর্গ কিলোৰিটারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ:

৭,৮০,০০,০০,০০,০০০ ঘন সেন্টিমিটার, অথবা ৭,৮০,০০০ ঘন মিটার এবং সমস্ত পৃথিবীপৃষ্ঠে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ:

৭,৮০,০০০ × ৫০,৯০,০০,০০০ = ৩৯৭০,০০,০০,০০,০০,০০০ ঘন মিটার

একে ঘন কিলোমিটারে পরিবর্তন করতে হলে ১০০০ × ১০০০ × ১০০০,

অর্থাৎ ১০000 লক্ষ দিয়ে ভাগ করতে হবে। উত্তর হবে ৩,৯৭,000 ঘন কিলোমিটার।

তাহলে আবহমণ্ডল থেকে আমাদের পৃথিবীতে বৎসরে গড়পড়তা বৃষ্টি হয় ৪ লক্ষ ঘন কিলোমিটার (মোটামুটি)।

বৃষ্টি ও তুষারের জ্যামিতি সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনার এখানেই ইতি। আবহবিদ্যার বইতে আরও বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

১০

গণিত ও মহাপ্লাবন

৮৭. মহাপ্লাবন

বাইবেলে আছে, পৃথিবীতে একসময় বৃষ্টির জলে এমন প্লাবন হয়েছিল যা সবচেয়ে উঁচু পর্বতকেও ছাপিয়ে উঠেছিল। এই কাহিনীতে আছে "পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করে ঈশ্বরের পরে খুব অনুতাপ হয়েছিল।"

ঈশ্বর বললেন, "যে মানুষকে সৃষ্টি করেছি তাকে বিনষ্ট করে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলে দেব আমি, মানুষ, পশু, লতাপাতা বা আকাশের পাখি, সবকিছু!"

একমাত্র ন্যায়পরায়ণ নোয়া-কেই বাঁচাতে চেয়েছিলেন ঈশ্বর। তিনি তাঁকে পৃথিবীর আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে একটা জলযান বানাতে বললেন, যা হবে ৩০০ হাত লম্বা, ৫০ হাত চওড়া এবং ৩০ হাত উঁচু। জাহাজটা ছিল তেতলা। শুধুমাত্র নোয়া এবং তাঁর পরিবারবর্গ বা তাঁর উপযুক্ত সন্তানদের আত্মীয়-পরিজনই নয়, পৃথিবীর সমস্ত জীবিত প্রাণীর বংশরক্ষা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। দীর্ঘ সময়ের পক্ষে পর্যাপ্ত খাবার ও একজোড়া করে প্রতিটি জীবিত প্রাণী এই জাহাজে নেবার জন্য নোয়াকে নির্দেশ দিলেন ঈশ্বর।

পৃথিবীর সমস্ত জীবিত প্রাণীকে ধ্বংস করার উপায় হিসেবে ঈশ্বর বেছে নিলেন এই মহাপ্লাবনকে। সমস্ত মানুষ আর পশুকে বিনাশ করার হাতিয়ার হল জল। তারপর নোয়া এবং যে সমস্ত প্রাণীকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হল তারাই সৃষ্টি করবে নূতন মানববংশ ও জীবজগৎ।

বাইবেলের বর্ণনা: "সাতদিন গত হলে প্লাবনের জল এল মাটির বুকে... চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত বৃষ্টি ঝরে পড়ল পৃথিবীতে... জল বেড়ে ওঠে ভাসিয়ে তুলল সেই জাহাজকে... অন্তহীন জলরাশি জমল পৃথিবীর উপর। আকাশের নীচে উঁচু হয়ে ছিল যত পাহাড়পর্বত সব ডুবে গেল জলের নীচে। পনেরো হাত উঁচু হয়ে জমে রইল জল... পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী হল বিনষ্ট। শুধুমাত্র বেঁচে রইলেন নোয়া আর জাহাজে যারা ছিল তাঁর সঙ্গে।" বাইবেলের বর্ণনামতো আরও ১১০ দিন সেই জল জমে রইল পৃথিবীর উপর, তারপর কমে গেল। তখন যে সমস্ত জীবজন্তুকে তিনি রক্ষা করেছিলেন তাদের সঙ্গে জাহাজ থেকে বের হয়ে এসে নোয়া নতুন বসবাসের জন্য পৃথিবীতে নামলেন।

মহাপ্লাবনের কাহিনী থেকে দুটো প্রশ্ন ওঠে:

(১) উচ্চতম পর্বতগুলিকেও ডুবিয়ে দেওয়ার মতো বৃষ্টি কি সম্ভব?

(২) নোয়ার জাহাজে কি সত্যিই পৃথিবীর বংশধরদের জায়গা হওয়া সম্ভব ছিল?

৮৮. মহাপ্লাবন হওয়া কি সম্ভব?

দুটো প্রশ্নেরই সমাধান অংকের সাহায্যে করা যেতে পারে। মহাপ্লাবনের এই জল এল কোথা থেকে? আকাশ থেকে নিশ্চয়ই। তারপর সে জল গেল কোথায়? সারা পৃথিবীর জল মাটিতে শুষে নেওয়া সম্ভব নয়, অন্য কোন উপায়ে উবে যাওয়াও সম্ভব নয়। একমাত্র যে জায়গায় এই জল যেতে পারে তা হল বায়ুমণ্ডলে; অর্থাৎ এই জল বাষ্প হয়ে যেতে পারে। তাহলে বায়ু-মণ্ডলেই এখন জলটা আছে। এখন যদি আকাশের সমস্ত বাষ্প জমে জলবিন্দুতে পরিণত হয় ও পৃথিবীতে ঝরে পড়ে তাহলে আবার আর একটি মহাপ্লাবন হয়ে সর্বোচ্চ পর্বতগুলিকেও ডুবিয়ে দেবে। দেখাই যাক ব্যাপারটা সম্ভব কিনা।

বায়ুমণ্ডলে কতটা আর্দ্রতা আছে আবহবিদ্যার বইতে তা পাওয়া যাবে। তাতে আছে, প্রতি বর্গ মিটার জায়গার উপরিভাগে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তাতে গড়পড়তা ১৬ কিলোগ্রাম বাষ্প থাকে এবং ২৫ কিলোগ্রামের বেশী কখনই থাকতে পারে না। যদি এই সমস্ত বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে তাহলে সেই জলের গভীরতা কত হতে পারে মাপা যাক। পঁচিশ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ ২৫,০০০ গ্রাম জলের আয়তন হবে ২৫,০০০ ঘন সেন্টিমিটারের সমান। এই আয়তন হবে প্রতি ১ বর্গ মিটার, অর্থাৎ ১০০ × ১০০ = ১০,০০০ বর্গ সেন্টিমিটার জায়গার উপরের স্তরে। জলের আয়তনকে ভূমির ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলে জলস্তরের গভীরতা পাওয়া যাবে:

২৫,০০০ : ১০,০০০ = ২·৫ সেন্টিমিটার

প্লাবনের জল ২·৫ সেন্টিমিটারের বেশী উঠতে পারে না, কারণ বায়ুমণ্ডলে তার চেয়ে বেশী জল থাকাই সম্ভব নয়।* আবার এটুকু উচ্চতায়

* বহু জায়গায় বৃষ্টিপাত অনেক সময় ২·৫ সেন্টিমিটারকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে জল বায়ুমণ্ডল থেকে সোজাসুজি শুধু সে জায়গায় পড়ে না, পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বাতাস জল বয়ে আনে। বাইবেলের মতে মহাপ্লাবন একই সঙ্গে সারা পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছিল জলের নীচে, সুতরাং এক অঞ্চলে অন্য অঞ্চল থেকে জল আসা সম্ভব ছিল না।

জল জমা সম্ভব হতে পারে একমাত্র যদি মাটি এই বৃষ্টির জল শুষে না নেয়।

আমাদের হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে মহাপ্লাবন যদি হয়েও থাকে তাহলেও জল ২·৫ সেন্টিমিটারের বেশী উঠতে পারে নি। এভারেস্ট পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ হচ্ছে ৯ কিলোমিটার উঁচু, অর্থাৎ এই জল থেকে অনেক অনেক উঁচু। বাইবেলে জলের গভীরতাকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে, মাত্র ৩,৬০,০০০ গুণ বাড়ানো হয়েছে!

আবার যদি বৃষ্টি হয়ে 'প্লাবন' হয়েও থাকে, তাহলে ঠিক যাকে বৃষ্টি বলে তা হয় নি, একটা ঝিরঝিরে বর্ষণ হয়েছে মাত্র। কেননা ৪০ দিন ধরে বিরামহীন বৃষ্টির ফলে যদি মাত্র ২৫ মিলিমিটার জল জমে, তাহলে দৈনিক বৃষ্টি হতে হবে ০·৫ মিলিমিটারেরও কম। শরৎকালে যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে থাকে তাতেও এর ২০ গুণ জল হয়।

৮৯. ঐরকম একটা জাহাজ ছিল কি?

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা ধরা যাক: নোয়া যে সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করেছিলেন ঐ জাহাজে তাদের সকলের জায়গা হওয়া কি সম্ভব ছিল?

দেখা যাক, মোট জায়গা ছিল কতটা। বাইবেলে আছে জাহাজটা ছিল তিনতলা। প্রতি তলা ৩০০ হাত লম্বা আর ৫০ হাত চওড়া। প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ার লোকদের ভেতর 'এক হাত' বলতে যে মাপ বোঝানো হত তাকে দশমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করলে দাঁড়ায় প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার বা ০·৪৫ মিটার। তাহলে প্রতি তলা ছিল ৩০০ × ০·৪৫ = ১৩৫ মিটার লম্বা, আর ৫০ × ০·৪৫ = ২২·৫ মিটার চওড়া।

তাহলে প্রতিটি মেঝের মাপ ছিল ১৩৫ × ২২·৫ ≈ ৩০৪০ বর্গ মিটার।

সুতরাং, তিনটে তলা মিলিয়ে প্রাণীদের জন্য মোট জায়গা ছিল:

৩০৪০ × ৩ = ৯১২০ বর্গ মিটার।

এখন ধরা যাক, কেবল স্তন্যপায়ীদের জন্যই এ জায়গা যথেষ্ট কিনা? স্থলে স্তন্যপায়ী আছে প্রায় ৩৫০০ জাতের। আর নোয়াকে স্তন্যপায়ীদের জন্যই কেবল জায়গার ব্যবস্থা করতে হয় নি; যে ১৫০ দিন্ ধরে জল পুরোপুরি কমে যায় নি ততদিন চলার মতো যথেষ্ট খাবারের জায়গাও দিতে হয়েছিল। তারপর আবার একথা ভুললে চলবে না যে শিকারী প্রাণীদের নিজেদের জন্যই শুধু জায়গা হলে হবে না। তাদের শিকারের জন্যও জায়গা দরকার। আবার

এই শিকারের খাদ্যের জন্যও জায়গা দরকার। জাহাজের প্রতিজোড়া স্তন্যপায়ীর জন্য জায়গা ছিল:

৯১২০ : ৩৫০০ = ২ · ৬ বর্গ মিটার।

নিঃসন্দেহে এই জায়গা পর্যাপ্ত নয়। বিশেষত আরও একটা জিনিস ধরতে হবে। নোয়া ও তাঁর বিরাট পরিবারবর্গের জন্যও কিছু থাকবার জায়গা দরকার হয়েছিল, এবং প্রাণীদের খাঁচাগুলোকে ফাঁক ফাঁক করে রাখতে হয়েছিল।

স্তন্যপায়ী ছাড়া নোয়াকে আরও অনেক প্রাণী নিতে হয়েছিল। হয়ত তারা স্তন্যপায়ীদের মতো অত বড় নয়। কিন্তু তাদের ভেতর আছে অনেক বেশী জাতি ও প্রকার ভেদ। তাদের সংখ্যা প্রায় এইরকম দাঁড়াবে:

পাখি	১৩,০০০
সরীসৃপ	৩,৫০০
উভচর	১,৪০০
অঙ্গুরীমাল	১৬,০০০
পতঙ্গ	৩,৬০,০০০

কেবল স্তন্যপায়ীদেরই যদি ঐ জাহাজে গাদাগাদি করে থাকতে হয়, তাহলে অন্যান্য প্রাণীর জন্য ওখানে তিল ধারণের জায়গাও ছিল না। পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত প্রাণীর জন্য জায়গা দিতে হলে জাহাজকে তার আসল মাপের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড় হতে হয়। তাহলে বাইবেলের কথামতো এটা ছিল একটা বিরাট জাহাজ। নাবিকদের ভাষায় বলতে গেলে জাহাজটার আকৃতি ছিল ২০,০০০ টন জল স্থানচ্যুত করার মতো। সেই পুরনো যুগে যখন জাহাজ নির্মাণ শিল্পের শৈশব অবস্থা তখনকার লোকদের পক্ষে এই বিরাট মাপের জাহাজ তৈরির কায়দাকানুন জানার কথা সম্পূর্ণ অবাস্তব। জাহাজটা বড় হতে পারে, কিন্তু যে বিরাট কাজের বর্ণনা বাইবেলে দেওয়া আছে, তা পালন করার মতো বড় ছিল না। প্রশ্নটা আসলে পাঁচ মাসের উপযুক্ত খাবারদাবার সহ একটা পুরো চিড়িয়াখানা নিয়ে যাওয়ার মতোই।

মোদ্দাকথা, বাইবেলে প্লাবনের গল্পকে মিথ্যে করে দিচ্ছে অঙ্কের হিসেব। আসলে ওরকম কিছু ঘটাই অসম্ভব। যদি কিছু হয়েও থাকে তো মনে হয় কোন স্থানীয় বন্যা হতে পারে। বাকি গল্পটা কল্পনা।

১১

পাঁচমিশালী ধাঁধা
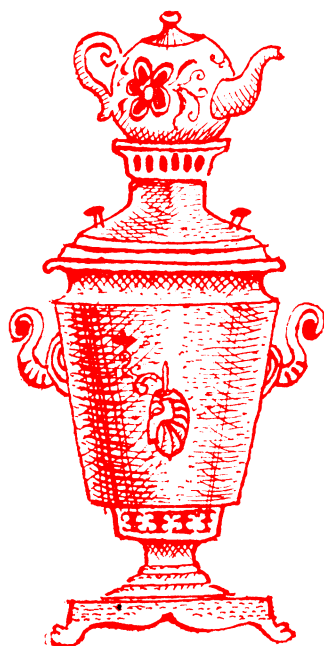
পাঠকদের কাছে বইটা খুবই কাজের হয়েছে বলেই আশা করছি আমি। আরও আশা করছি যে, বইটা শুধু আনন্দই দেয় নি, বুদ্ধি আর উদ্ভাবনী শক্তি বাড়াতে, জ্ঞানকে আরও ভালভাবে ব্যবহার করতেও সাহায্য করেছে। বইটা পড়ে নিশ্চয়ই বুদ্ধিটা একটু বাজিয়ে নিতে চাইবে তোমরা। তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে এই শেষ পরিচ্ছেদে নানা রকমের কিছু ধাঁধা দেওয়া হয়েছে।

৯০. শেকল

প্রতিভাগে তিনটি করে আংটা লাগানো একটা শেকলের সমান পাঁচটা ভাঙা অংশ কামারকে দেওয়া হল জোড়া দেবার জন্য।

কাজে হাত লাগাবার আগে কামার তো ভাবতে শুরু করল কটা আংটা

৮৯ নং ছবি
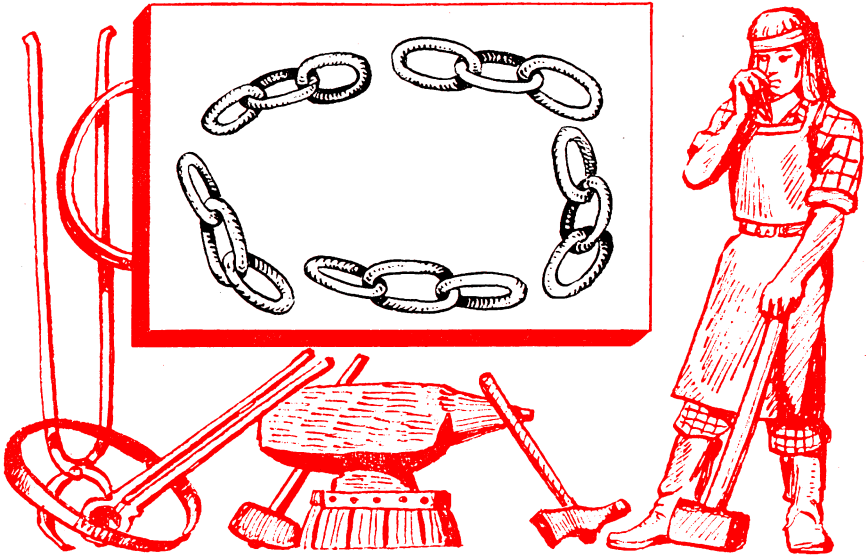
খুলে ফেলে তবে জোড়া দেওয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত সে চারটে খুলবে বলে ঠিক করল।

আরও কম আংটা খুলে ফেলে, তারপর জুড়ে দিয়ে কি কাজটা হতে পারে না?

৯১. মাকড়শা আর গুবরেপোকা

৮টা মাকড়শা আর গুবরেপোকা ধরে একটি ছেলে একটা ছোট বাক্সে রেখেছিল। তাদের পাগুলো গুনতি করে সে দেখল মোট ৫৪টা হচ্ছে। তাহলে কটা মাকড়শা আর কটা গুবরেপোকা সে জোগাড় করেছিল?

৯২. বর্ষাতি, টুপি আর গ্যালোস

কোন লোক একটা বর্ষাতি, একটা টুপি আর একজোড়া গ্যালোস* কেনে। সবকটার দাম ছিল ২০ রুবল। বর্ষাতির দাম টুপির চেয়ে ৯ রুবল বেশী,
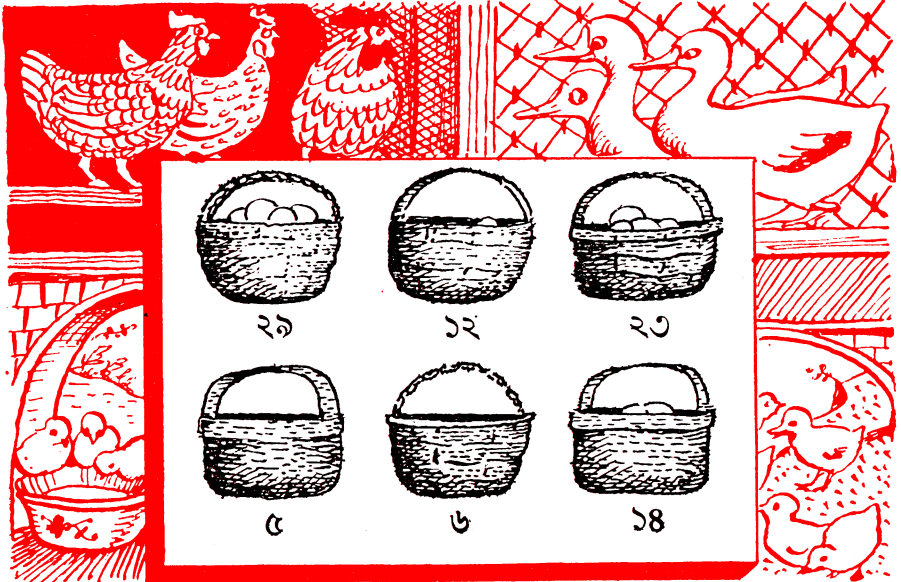
৯০ নং ছবি। বেপারী কোন ঝুড়িটা বিক্রির কথা ভেবেছিল?

* গ্যালোস হল শীতের দেশের জন্য তৈরি একরকম জুতো।

আবার বর্ষাতি আর টুপির দাম একসঙ্গে মিলিয়ে গ্যালোসের চাইতে ১৬ রুবল বেশী। তাহলে প্রত্যেকটার দাম সে কত করে দিয়েছিল?

প্রশ্নটা কিন্তু মনে মনে সমাধান করতে হবে। সমীকরণে কষা চলবে না।

৯৩. মুরগী আর পাতিহাঁসের ডিম

ঝুড়িগুলোতে মুরগী আর পাতিহাঁসের ডিম আছে। কয়েকটায় মুরগীর ডিম আর কয়েকটায় আছে পাতিহাঁসের ডিম। কোন ঝুড়িতে কটা করে ডিম আছে তা ঝুড়ির গায়ে লেখা আছে — ৫, ৬, ১২, ১৪, ২৩ আর ২৯। ব্যাপারী বলল, "যদি আমি এই ঝুড়িটা বিক্রি করি তাহলে পাতিহাঁসের ডিম যা পড়ে থাকবে, মুরগীর ডিম থাকবে তার চেয়ে দ্বিগুণ।"

কোন ঝুড়িটার কথা সে মনে ভেবেছিল (৯০ নং ছবি)?

৯৪. আকাশভ্রমণ

ক থেকে খ-তে পেঁছতে একটা উড়োজাহাজের লাগে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট, আর ফিরে আসতে লাগে মাত্র ৮০ মিনিট। এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

৯৫. উপহারের টাকা

দু'জন ছেলেকে তাদের বাবারা কিছু টাকা দিয়েছিলেন। একজন তাঁর ছেলেকে দিলেন ১৫০ রুবল, অন্যজন দিলেন ১০০ রুবল। ছেলে দু'জন তাদের টাকা-কড়ি গুনে দেখল একত্রে মিলিয়ে ওদের টাকা বেড়েছে মাত্র ১৫০ রুবল। এটা কিভাবে হল বল তো?

৯৬. দুটো ড্র্যাফটের ঘুঁটি

দুটো বিভিন্ন রঙের ঘুঁটিকে ছকের ৬৪টি ঘরের যেকোন জায়গায় রাখ। কতভাবে তাদের রাখা যেতে পারে বল তো?

৯৭. দুটো অংক

দুটো অংককে ব্যবহার করে সবচেয়ে ছোট পূর্ণসংখ্যা লেখা যায়?

৯৮. এক

দশটা অংককেই ব্যবহার করে ১ লিখতে পার?

৯৯. পাঁচটা ৯

পাঁচটা ৯ দিয়ে ১০ লেখ। অন্তত দু'ভাবে কর এটা।

১০০. দশটা অংক

দশটা অংকের সবকটাকেই ব্যবহার করে ১০০ লেখ। এটা কতভাবে করা যায়? আমরা কিন্তু অন্তত পক্ষে চারটে নিয়ম জানি।

১০১. চারটে উপায়

পাঁচবার একই অংককে ব্যবহার করে ১০০ লেখবার চারটে ভিন্ন ভিন্ন উপায় দেখাও তো!

১০২. চারটে ১

চারটে ১ দিয়ে সবচেয়ে বড় কোন সংখ্যাটা লেখা যায়?

১০৩. মজার ভাগ

নীচের ভাগটায় ৪ ছাড়া সব সংখ্যাগুলোর বদলে লেখা হয়েছে*। অজানা সংখ্যাগুলোকে পূরণ কর তো?

```
***)  ******৪  (*৪**
    — ***
      ------
      **৪*
    — ****
      -------
       ****
    —   *৪*
       -------
        ****
    —   ****
        ------
```

এই ধাঁধাটাকে অনেকভাবেই সমাধান করা যায়।

১০৪. আর একটা ভাগ অঙ্ক

এই ধরনের আর একটা ভাগ অঙ্ক দেওয়া হল এখানে, তোমাকে শুধু সাতটা ৭ দিয়ে হিসেব শুরু করতে হবে:

```
****৭*) **৭******* (**৭**
        ******
        -------
        *****৭*
        *******
        ---------
          *৭****
          *৭****
        ---------
          *******
          ****৭**
        ----------
           ******
           ******
           --------
```

১০৫. কতটা পাওয়া যাবে?

এক বর্গ মিটারে যতগুলি বর্গ মিলিমিটার আছে তা পাশাপাশি সাজালে কতটা লম্বা হবে? মনে মনে হিসেব কর তো?

১০৬. ঐ ধরনেরই আর একটা

এক ঘন মিটারে যত ঘন মিলিমিটার আছে তা একটার উপরে আর একটা সাজালে খুঁটিটা কত উঁচু হবে — মনে মনে বের কর তো?

১০৭. একটা উড়োজাহাজ

১২ মিটার ডানার বিস্তৃতিযুক্ত একটা উড়োজাহাজ যখন ঠিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখন তার ফোটো নেওয়া হল। ক্যামেরাটির গভীরতা ১২ সেন্টিমিটার। ফোটোতে উড়োজাহাজের বিস্তার উঠল ৮ মিলিমিটার।

যখন ছবিটা নেওয়া হল তখন উড়োজাহাজটা কত উঁচুতে ছিল?

১০৮. দশ লাখ জিনিস

একটা জিনিসের ওজন ৮৯·৪ গ্রাম। ঐরকম দশ লাখ জিনিসের ওজন কত মনে মনে হিসেব কর তো!

১০৯. পথের সংখ্যা

৯১ নং ছবিটা একটা গ্রীষ্মাবাসের নক্সা, কতকগ্‌লো রাস্তার ফলে বর্গক্ষেত্রে ভাগ হয়েছে। **ক** বিন্দ্‌ থেকে **খ** বিন্দ্‌তে যেতে একজন লোক যে
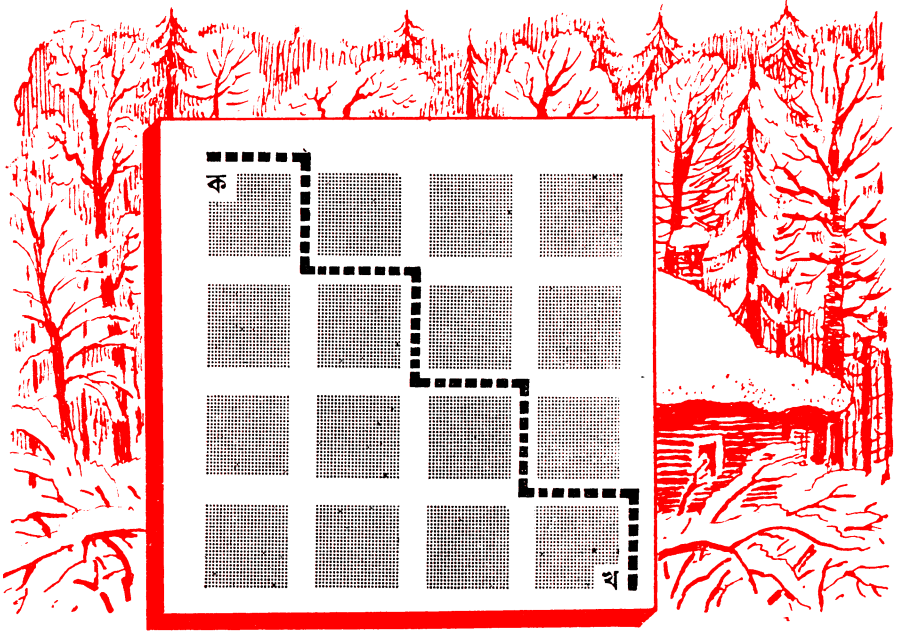
৯১ নং ছবি। রাস্তা দিয়ে ভাগ করা গ্রীষ্মাবাসের নক্সা।

রাস্তাটা ব্যবহার করেছিল ফুটকি-দেওয়া রেখা দিয়ে তাই বোঝানো হয়েছে। **ক** ও **খ**-র ভেতরে এটাই একমাত্র রাস্তা নয়। একই দৈর্ঘ্যের আর কতগ্‌লো পথ হতে পারে?

১১০.ঘড়ির মুখ

একটা ঘড়ির মুখকে (৯২ নং ছবি) যেকোন ধরনের ছ'টা ভাগে ভাগ করতে হবে। কিন্তু প্রত্যেকটা ভাগের সংখ্যার যোগফল সমান হওয়া চাই।

এ ধাঁধাটা দিয়ে তোমাদের জ্ঞান আর উদ্ভাবনীশক্তির পরীক্ষা হবে।

৯২ নং ছবি। এই ঘড়ির মুখকে ছ'টা ভাগে ভাগ করতে হবে।

১১১.আট-মাথা তারা

৯৩ নং ছবিতে রেখাগুলোর সংযোগের জায়গায় যে ছোট ছোট বৃত্ত
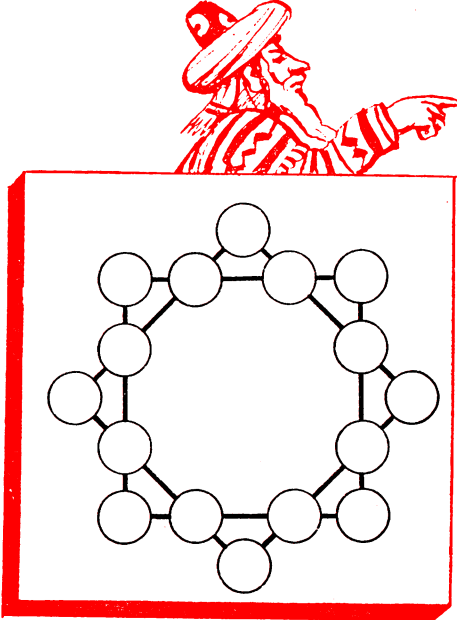
৯৩ নং ছবি। আট-মাথা তারা। ৯৪ নং ছবি। সংখ্যা চক্র।
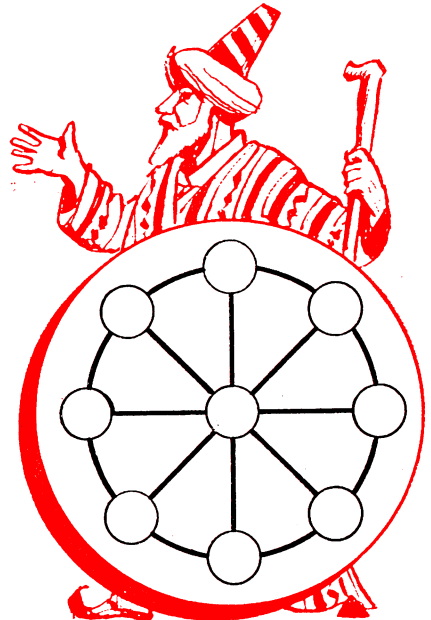
আছে সেগুলো ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে এমনভাবে পূর্ণ কর যাতে বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুতে লিখিত সংখ্যার যোগফল, আর শীর্ষবিন্দুগুলিতে লিখিত সংখ্যার যোগফল দুটোই হয় ৩৪।

১১২.সংখ্যা চক্র

৯৪ নং ছবিতে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা এমনভাবে সাজাও যাতে কেন্দ্রে একটা সংখ্যা আর ব্যাসের দু'মাথায় অন্য সংখ্যাগুলো সাজালে প্রত্যেক ব্যাসের তিনটে করে সংখ্যার যোগফল হবে ১৫।

১১৩.তেপায়া

তেপায়ার তিনটে পায়ের দৈর্ঘ্য ভিন্ন রকম হলেও তাকে নাকি ভালভাবেই বসানো যায়। এটা কি সত্যি?

১১৪.কোণ

৯৫ নং ছবিতে ঘড়ির কাঁটায় কত ডিগ্রি কোণ তৈরি হয়েছে এটা মনে মনে সমাধান করতে হবে, কোণ মাপবার চাঁদা যন্ত্র ব্যবহার করা চলবে না।
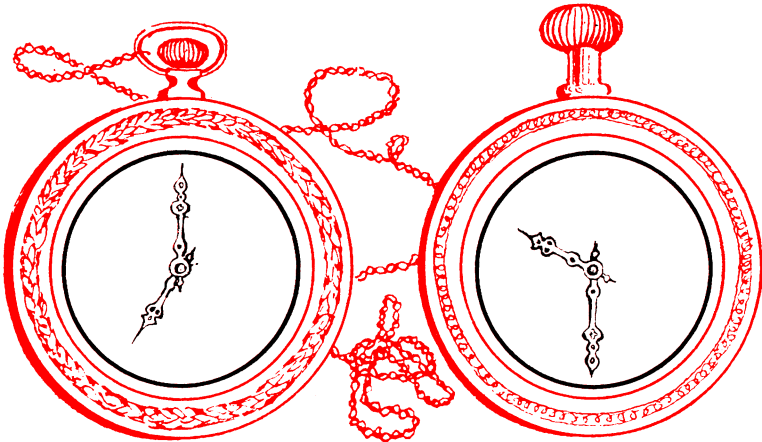
৯৫ নং ছবি। ঘড়ির কাঁটায় কত ডিগ্রি কোণ তৈরি হয়েছে?

১১৫. বিষুবরেখার উপর

বিষুবরেখা বরাবর আমরা যদি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসি তাহলে আমাদের মাথা যে বৃত্তরেখায় ঘুরবে, তার পরিধি আমাদের পায়ের বৃত্তরেখার পরিধির চেয়ে বড় হবে। কিন্তু তফাত কতখানি হবে?

১১৬. ছ'টা সারি

ন'টা ঘোড়াকে কী করে দশটা আস্তাবলে রাখা হয়েছিল সেই মজার কথাটা তোমরা বোধহয় শুনে থাকবে? এখানে আর একটা ধাঁধা দিচ্ছি যা প্রায় একইরকম মনে হবে। তফাতটা এই যে এটাকে সত্যিই সমাধান করা যাবে। ধাঁধাটা হচ্ছে:

২৪ জন লোককে এমনভাবে ৬টা সারিতে দাঁড় করাও যাতে প্রত্যেক সারিতে থাকবে ৫ জন করে।

১১৭. ভাগটা করবে কী করে?
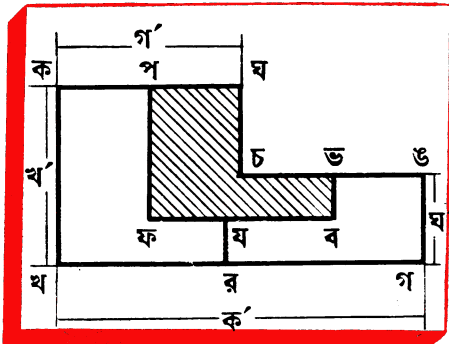
ধাঁধাটা অনেকেরই জানা আছে: ৯৬ নং ছবিটাতে একটা আয়তক্ষেত্র থেকে তার সিকি ভাগ বাদ দেওয়া আছে — এটাকে কী করে সমান চার ভাগে ভাগ করা যাবে? এটাকে তিনটে সমান ভাগে ভাগ করতে হবে, পারবে কি?

৯৬ নং ছবি। এই ক্ষেত্রটাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করা যাবে কি করে?

১১৮. ক্রুশ আর চাঁদের ফালি

৯৭ নং ছবিতে একটা চাঁদের ফালির মতো চেহারা দেখতে পাচ্ছ। প্রশ্নটা হল, এই চাঁদের ফালির সমান করে কিভাবে একটা লাল ক্রুশ আঁকা যাবে।

৯০—১১৮ নম্বর ধাঁধার উত্তর

৯০. মাত্র তিনটে আংটা খুলেই কাজটা করা যেতে পারে। একটা ভাগের সবকটা আংটা খুলে নিয়ে তাতে অন্য চারটা ভাগ যোগ করলেই হয়ে যাবে।

৯৭ নং ছবি। চাঁদের ফালিকে কিভাবে ক্রুশে 'পরিণত' করা যায়।

৯১. প্রশ্নটা সমাধান করার আগে তোমাদের জানতে হবে মাকড়শা আর গুবরেপোকার কটা করে পা থাকে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের কথা মনে থাকলে নিশ্চয়ই জান যে মাকড়শার থাকে ৮টা করে পা আর গুবরেপোকার ৬টা। ধরা যাক, বাক্সটাতে কেবল ৮টা গুবরেপোকাই ছিল। তার মানে এক্ষেত্রে থাকা উচিত ৬ × ৮ = ৪৮টা পা। ধাঁধাতে যে পায়ের সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল তা থেকে ৬ কম হল এতে। যদি একটা গুবরেপোকার জায়গায় একটা করে মাকড়শা বদল করা যায়, তাহলে পায়ের সংখ্যাও ২ করে বেড়ে যাবে, কারণ মাকড়শার পা ৬টা নয়, ৮টা।

যদি তিনটে গুবরেপোকার বদলে তিনটে মাকড়শা ধরা হয় তাহলে বাক্সের মধ্যে পায়ের সেই ৫৪টা সংখ্যা পূর্ণ হবে — এটা তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাহলে ৮টা গুবরেপোকার জায়গায় হবে ৫টা, বাকিটা হবে মাকড়শা। ছেলেটি ৫টা গুবরেপোকা আর ৩টে মাকড়শা সংগ্রহ করেছিল।

হিসেবটা মিলিয়ে দেখা যাক: ৫টা গুবরেপোকার ৩০টা পা আর ৩টা মাকড়শার ২৪টা পা। তাহলে ৩০ + ২৪ = ৫৪।

ধাঁধাটা সমাধানের আরও একটা উপায় আছে। ধরে নেওয়া যাক, বাক্সের ভেতর সবকটাই, অর্থাৎ ৮টাই ছিল মাকড়শা। তাহলে আমাদের থাকা উচিত ৮ × ৮ = ৬৪টা পা। অর্থাৎ ধাঁধাতে যা আছে তার থেকে ১০টা বেশী। একটা মাকড়শার বদলে একটা গুবরেপোকা নিলে পায়ের সংখ্যা ২ কমে যাবে। সবশুদ্ধ এভাবে আমাদের ৫ বার বদল করতে হবে, তাহলেই পায়ের সংখ্যা আমাদের দরকারমতো ৫৪-তে এসে নামবে। তার মানে হল, ৮টা মাকড়শার

ভেতরে ৩টাকে আমরা বাক্সেই রেখে দেব, বাকিগুলোর জায়গায় রাখব গুবরেপোকা।

৯২. যদি একটা বর্ষাতি, একটা টুপি আর গ্যালোস জোড়ার বদলে তাকে শুধু দুই জোড়া গ্যালোস কিনতে হত তাহলে দাম দিতে হত ২০ রুবল নয়, দিতে হত গ্যালোস দু'জোড়ার দাম, বর্ষাতি আর টুপির চেয়ে যত কম ততটা কম, অর্থাৎ ১৬ রুবল কম দিতে হত। তাহলে দু'জোড়া গ্যালোসের দাম দাঁড়াচ্ছে ২০ − ১৬ = ৪ রুবল। তাহলে এক জোড়ার দাম ২ রুবল।

এখন আমরা জানি যে বর্ষাতি আর টুপির দাম একত্রে ২০ − ২ = ১৮ রুবল। একথা জানি যে টুপির চাইতে বর্ষাতির দাম ৯ রুবল বেশী। এখন আগের মতো যুক্তি দিয়েই অংকটা করা যাক। একটা বর্ষাতি আর একটা টুপির বদলে দুটো টুপি কেনা যাক। সেক্ষেত্রে আমাদের ১৮ রুবল দিতে হবে না, দিতে হবে ৯ রুবল কম। তাহলে দুটো টুপির দাম ১৮ − ৯ = ৯ রুবল, অর্থাৎ একটা টুপির দাম — ৪ রুবল ৫০ কোপেক।

তাহলে, প্রত্যেকটা জিনিসের দাম কত তা পাওয়া যাচ্ছে: গ্যালোস — ২ রুবল, টুপি — ৪ রুবল ৫০ কোপেক আর বর্ষাতি — ১৩ রুবল ৫০ কোপেক।

৯৩. ডিমের ব্যাপারী ২৯টা ডিমওয়ালা ঝুড়িটার কথাই ভেবেছিল। ২৩, ১২ আর ৫ লেখা ঝুড়িতে ছিল মুরগীর ডিম, আর ১৪ আর ৬ লেখা ঝুড়িতে ছিল হাঁসের ডিম।

উত্তরটা মিলিয়ে দেখা যাক। বিক্রির পর থাকবে

$$২৩ + ১২ + ৫ = ৪০\text{টা মুরগীর ডিম}$$

আর

$$১৪ + ৬ = ২০\text{টা হাঁসের ডিম।}$$

তাহলে ধাঁধা অনুযায়ী হাঁসের ডিমের চাইতে মুরগীর ডিম থাকবে দ্বিগুণ।

৯৪. এখানে বুঝিয়ে বলার মতো কিছুই নেই। উড়োজাহাজটা উড়ে যায়: আবার সেটা ফিরে আসে একই সময়ে। কারণ ৮০ মিনিট আর ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট একই জিনিস।

ধাঁধাটা অন্যমনস্ক পাঠকের জন্য দেওয়া হয়েছে। সে হয়ত ভাবতে পারে যে ৮০ মিনিট আর ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটে কিছু তফাত আছে।

৯৫. এটায় চালাকি হল এই যে, এর মধ্যে একজন বাবা, অন্যজন বাবার ছেলে। ধাঁধাটায় আছে ৪ জন নয়, মাত্র তিনজন লোক — ঠাকুর্দা, বাবা আর ছেলে। ঠাকুর্দা তাঁর ছেলেকে দিলেন ১৫০ রুবল, সে আবার নাতিটিকে তা থেকে দিল ১০০ রুবল (অর্থাৎ তার ছেলেকে)। তাহলে তার নিজের টাকা থাকল মাত্র ৫০ রুবল।

৯৬. একটা ঘুঁটিকে ৬৪টা ঘরের যেকোনটাতেই রাখা যেতে পারে, অর্থাৎ এটাকে রাখবার ৬৪টা উপায় আছে। এটা যখন রাখা হয়ে গেল তখন দ্বিতীয়টাকে রাখবার মতো আর আছে মাত্র ৬৩টা ঘর। তার মানেই হল, প্রথম ঘুঁটির ৬৪টা অবস্থার যেকোনটার সঙ্গে দ্বিতীয় ঘুঁটিটার ৬৩টা অবস্থা যোগ করা যেতে পারে। তাহলেই ড্র্যাফটের ছকে দুটো ঘুঁটি রাখবার মতো ৬৪ × ৬৩ = ৪০৩২টা বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে।

৯৭. দুটো সংখ্যা দিয়ে যে ক্ষুদ্রতম পূর্ণসংখ্যা লেখা যায় তা কিন্তু ১০ নয়। কেউ কেউ হয়ত তাই ভেবেছ। কিন্তু এটা হবে ১, আর তা হবে এইভাবে:

১/১, ২/২, ৩/৩, ৪/৪ ইত্যাদি ৯/৯ পর্যন্ত

যাদের বীজগণিতের সঙ্গে পরিচয় আছে তারা অন্য ধরনের অংকও দেখাতে পারবে:

১°, ২°, ৩°, ৪° ইত্যাদি ৯° পর্যন্ত,

কারণ যেকোন সংখ্যা শূন্য শক্তিতে ওঠালে তা ১-এর সমান হয়।

৯৮. ১-কে দুটো ভগ্নাংশের যোগফল হিসেবে দেখাতে হবে:

১৪৮/২৯৬ + ৩৫/৭০ = ১

যারা বীজগণিত জানো তারা অন্য উত্তরও করতে পার, যেমন:

১২৩৪৫৬৭৮৯°; ২৩৪৫৬৭^৯-৮-১ ইত্যাদি।

৯৯. দুটো উপায় হল এইরকম:

৯ + ৯৯/৯৯ = ১০ এবং ৯৯/৯ − ৯/৯ = ১০

বীজগণিত জানা থাকলে, তোমরা বোধহয় আরও কয়েকটা উত্তর যোগ করবে এর সঙ্গে। **যেমন**:

$$(৯\ ৯/৯)^{৯/৯}=১০;\quad ৯+৯৯^{৯-৯}=১০।$$

১০০. এর চারটে **সমাধান**:

৭০ + ২৪ ৯/১৮ + ৫ ৩/৬ = ১০০
৮০ ২৭/৫৪ + ১৯৩/৬ = ১০০
৮৭ + ৯ ৪/৫ + ৩ ১২/৬০ = ১০০
৫০ ১/২ + ৪৯ ৩৮/৭৬ = ১০০

১০১. ১, ৩ বা ৫-কে পাঁচবার ব্যবহার করে ১০০ লেখা তো সোজা। এখানে চারটে নিয়ম দেখা যাচ্ছে:

১১১ − ১১ = ১০০
৩৩ × ৩ + ৩/৩ = ১০০
৫ × ৫ × ৫ − ৫ × ৫ = ১০০
(৫ + ৫ + ৫ + ৫) × ৫ = ১০০

১০২. লোকে সাধারণত বলে সংখ্যাটা হল ১১১১। কিন্তু এরচেয়েও অনেক অনেক বড় সংখ্যা লেখা সম্ভব, **যেমন** $১১^{১১}$, অর্থাৎ ১১-র ১১-ক্রম পর্যন্ত শক্তি ওঠালে যা হয়। যদি এটা শেষ পর্যন্ত হিসেব করার ধৈর্য তোমাদের থাকে (লগারিদ্‌মের সাহায্যে অনেক সহজেই তা করা যায়) তাহলে দেখতে পাবে এর উত্তর ২,৮০,০০,০০,০০,০০০-কেও ছাড়িয়ে যাবে। তাহলে সংখ্যাটা ১১১১ থেকে ২৫ কোটি গুণ বেশী।

১০৩. ধাঁধাটা চারটে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সমাধান করা যায়, যেমন:

১৩,৩৭,১৭৪ : ৯৪৩ = ১৪১৮
১৩,৪৩,৭৮৪ : ৯৪৯ = ১৪১৬
১২,০০,৪৭৪ : ৮৪৬ = ১৪১৯
১২,০২,৪৬৪ : ৮৪৮ = ১৪১৮

১০৪. ধাঁধাটার একটি মাত্র সমাধান আছে:

৭,৩৭,৫৪,২৮,৪১৩ : ১,২৫,৪৭৩ = ৫৮,৭৮১*

শেষের বেশ কঠিন এই ধাঁধাদুটো প্রথমে আমেরিকায় 'শিক্ষা জগতে' (১৯০৬) ও 'গণিত পত্রিকা' সাময়িকীতে (১৯২০) প্রকাশিত হয়েছিল।
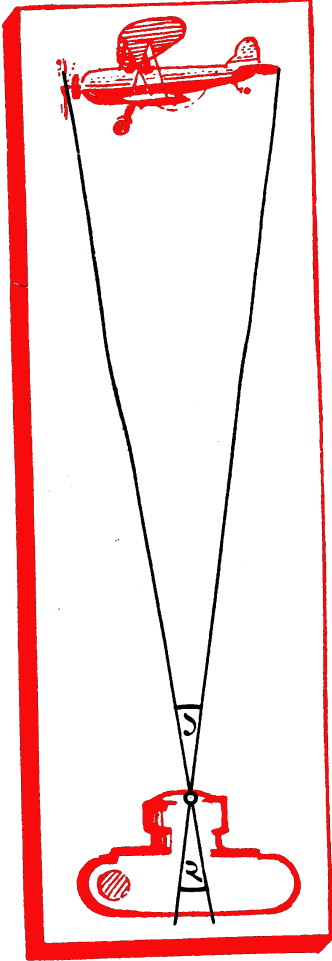
৯৮ নং ছবি

১০৫. এক বর্গ মিটার ১০০০ হাজার বর্গ মিলিমিটারের সমান। এক হাজার বর্গ মিলিমিটারকে পাশাপাশি রাখলে তা ১ মিটার জায়গা জুড়ে থাকবে; ১০০০ হাজার বর্গ তাহলে জুড়ে থাকবে ১০০০ মিটার লম্বা জায়গা, তাহলে দাঁড়াচ্ছে ১ কিলোমিটার লম্বা।

১০৬. উত্তরটা হতবাক করে দেবে। খুঁটিটা হবে ১০০০ কিলোমিটার উঁচু!

এটা মনে মনে হিসেব করা যাক। এক ঘন মিটার ১০০০ ঘন মিলিমিটার × ১০০০ × ১০০০-এর সমান। এক হাজার মিলিমিটারের ঘনক্ষেত্র একটার পর একটা সাজালে ১ মিটার উঁচু একটা খুঁটি হবে। এখন আমাদের আছে ১০০০ × ১০০০ গুণ ঘন। তাহলেই আমাদের খুঁটিটা হবে ১০০০ কিলোমিটার লম্বা।

১০৭. ৯৮ নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে (যেহেতু ১ নং আর ২ নং কোণ সমান) যে দৃষ্টবস্তুর রেখাগত মাপ আর ছবির ভেতর সেই অনুপাত রয়েছে, যা আছে লেন্স থেকে দৃষ্টবস্তু আর ক্যামেরার গভীরতার দূরত্বের ভেতরে। এক্ষেত্রে **ক**-কে

* পরে এর আরও তিনটে সমাধান বের হয়েছে।

উড়োজাহাজের উচ্চতা ধরলে (মিটারের হিসেবে) আমরা যে অনুপাতটা পাই তা হল:

১২,০০০ : ৮ = **ক** : ০ · ১২

তাহলেই **ক = ১৮০ মিটার।**

১০৮. হিসেবটা কী করে মনে মনে করা যায় তা দেওয়া হল। ৮৯ · ৪ গ্রামকে গুণ করতে হবে দশ লক্ষ দিয়ে, অর্থাৎ ১০০০ হাজার দিয়ে।

এটা দুটো ভাগে করা যাক: ৮৯ · ৪গ্রাম × ১০০০ = ৮৯ · ৪ কিলোগ্রাম, কারণ এক কিলোগ্রাম এক গ্রামের ১০০০ গুণ বেশী তাহলে ৮৯ · ৪ কিলোগ্রাম × ১০০০ = ৮৯ · ৪ টন, কারণ এক টন হল এক কিলোগ্রামের ১০০০ গুণ।

তাহলেই আমাদের ওজনের হিসেবটা হবে ৮৯ · ৪ টন।

৯৯ নং ছবি

১০৯. ক থেকে **খ**-তে যাবার মোটমাট ৭০টা পথ আছে। (এই ধাঁধাটার নিয়মমাফিক সমাধান বীজগণিতের প্যাসক্যাল-এর ত্রিভুজের সাহায্যে করা যেতে পারে।)

১১০. ঘড়ির উপর সংখ্যাগুলোর মোট যোগফল ৭৮, তাহলে ছ'টা ভাগে মোট সংখ্যা থাকবে ৭৮ : ৬ = ১৩। এটাই প্রশ্নটাকে সমাধান করতে সাহায্য করবে (৯৯ নং ছবিতে এটা দেখানো হয়েছে)।

১১১-১১২. এদের সমাধান ১০০ আর ১০১ নং ছবিতে দেওয়া হয়েছে।

১১৩. তেপায়ার তিনটে পা সবসময়ই মেঝের উপর ঠিক হয়ে বসে, কারণ যেকোন জায়গার তিনটে বিন্দু দিয়ে একটিমাত্র 'তল' তৈরি হতে পারে। এজন্যই তেপায়া বেশ শক্ত হয়েই বসে। দেখতে পাচ্ছ, এর কারণ মোটেই দৈহিক নয়, পুরোপুরি জ্যামিতিক। এর জন্যই জমি জরিপের কাজে আর ফোটো
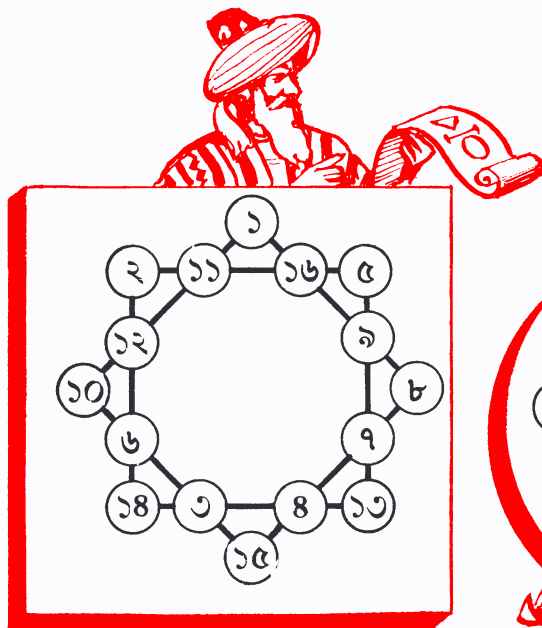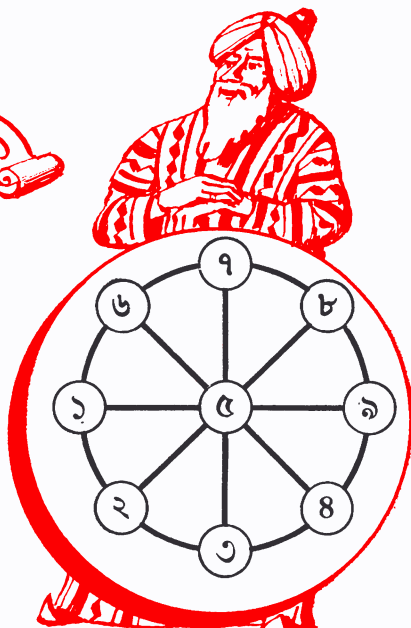
১০০ নং ছবি   ১০১ নং ছবি

তোলার ক্যামেরা রাখতে তেপায়াটা খুবই সাহায্য করে। চতুর্থ পা একে মোটেই শক্ত করবে না, বরং তাতে ঝামেলাই বাড়বে।

১১৪. ধাঁধাটার উত্তর সহজেই দেওয়া যায়, বিশেষত কটা বেজেছে সেটা যদি একবার দেখ। ৯৫ নং ছবির বাঁদিকের ঘড়িটার কাঁটার দিকে তাকালেই দেখতে পাবে ৭টা বেজেছে। এর অর্থ হল দুটো সংখ্যার ভেতরে বৃত্তচাপ পরিধির ৫/১২। ডিগ্রিতে দাঁড় করালে হয়:

$$৩৬০^\circ \times ৫/১২ = ১৫০^\circ$$

ডানদিকের ঘড়িটার কাঁটাতে দেখা যাচ্ছে ৯ · ৩০টা বেজেছে। এখানে বৃত্তচাপ ৩ ১/২ × ১/১২ বা পরিধির ৭/২৪- এর সমান।

ডিগ্রিতে দাঁড় করালে এটা হয়:

$$৩৬০^\circ \times ৭/২৪ = ১০৫^\circ$$
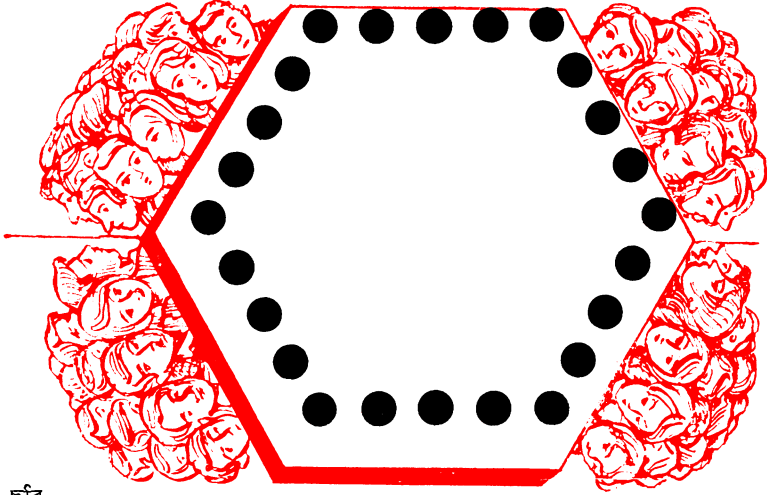
১০২ নং ছবি

১১৫. যদি আমরা ধরে নিই যে মানুষের গড়পড়তা উচ্চতা ১৭৫ সেন্টিমিটার, আর **ক**-কে ধরি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, তাহলে ২ × ৩ · ১৪ × (**ক** + ১৭৫) – (২ × ৩ · ১৪ × **ক**) = ২ × ৩ · ১৪ × ১৭৫ = ১১০০ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ ১১ মিটার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই যে উত্তরটা কোনভাবেই পৃথিবীর ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং এটা সূর্যের মতো একটা বিরাট গ্রহের উপরই হোক বা ছোট বলের উপরই হোক উত্তরটা একই হবে।

১১৬. লোকগুলোকে একটা ষড়ভুজের আকারে দাঁড় করালে, ধাঁধাটার সমাধান করা সোজা হয়ে যাবে। ১০২ নং ছবিতে এটা দেখানো হয়েছে।

১১৭. এই সমস্যাটার প্রধান আকর্ষণ হল এই যে এটা **ক´ খ´ গ´ ঘ´** বা ঙ´ ধরে সমাধান করা চলবে না, নির্দিষ্ট উপায়েই এর সমাধান হবে। আসলে ৯৬ নং ছবিতে কালো জায়গাটাকে আমরা প্রত্যেকটা সাদা জায়গার সমান করতে চাই। বেশ দেখাই যাচ্ছে **ফ ব** রেখা **খ গ** রেখার থেকে ছোট। তাহলেই এটাকে **ক খ**-র সমান হতে হবে। অন্যদিকে, **ফ ব**-কে **র গ**-র সমান হতে হবে; তাহলে **ফ ব** = **র গ** = খ´, সুতরাং **খ র** = **ক´** – **খ´**, কিন্তু **খ র, প ফ** এবং **গ** ঙ-এর

সমান হওয়া উচিত। তার অর্থ হল: **খ র** = **প ফ** = **গ ঙ**, অর্থাৎ **ক´** − **খ´** = **ঘ´** আর **প ফ** = **ঘ´**।

তাহলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি **ক´**, **খ´** আর **ঘ´**-কে খেয়ালখুশী মাফিক ধরলেই হবে না। **ঘ´** বাহুকে **ক´** এবং **খ´** বাহুর বিয়োগফলের সমান হতে হবে। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের দেখতে হবে সমস্ত বাহুগুলোই যাতে **ক´ বাহুর** নির্দিষ্ট অংশ হয়।

তাহলেই দাঁড়াচ্ছে: **য র** + **প ফ** = **ক খ** বা **য র** + (**ক´** − **খ´**) = **খ´**, অর্থাৎ **য র** = ২ **খ´** − **ক´**। কালো অংশের বাহুগুলির সঙ্গে ডানদিকের সাদা অংশের অনুরূপ বাহুগুলোকে তুলনা করলে দাঁড়াচ্ছে: **য র** = **ব ভ**, অর্থাৎ **য র** = **ঘ**২, সুতরাং **ঘ**২ = ২**খ´** — **ক´**। এই সমীকরণটা **ক´** − **খ´** = **ঘ´** সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা পাচ্ছি **খ´** = ৩/৫ **ক´** আর **ঘ´** = ২/৫ **ক´**। কালো অংশের সঙ্গে বাঁদিকে সাদা অংশের তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে **ক প** = **ব ভ**, অর্থাৎ **ক প** = **য র** = **ঘ**২ = ১/৫ **ক´**। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে **প ঘ** = **য র** = ১/৫ **ক´**, সুতরাং **ক ঘ** = ২/৫ **ক´**।

তাহলেই আমাদের ক্ষেত্রটার বাহুগুলো খেয়ালখুশী মাফিক হলে চলবে না, **ক´** বাহুর নির্দিষ্ট অংশ (৩/৫, ২/৫ ও ২/৫) হতে হবে। একমাত্র এইভাবেই এর সমাধান সম্ভব।

১১৮. পাঠকদের মধ্যে যারা শুনেছ যে বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রের সমান করা অসম্ভব, তারা হয়ত ভেবেছ জ্যামিতি দিয়েও এর সমাধান সম্ভব নয়। অনেকের মনে হবে,

১০৩ নং ছবি   ১০৪ নং ছবি
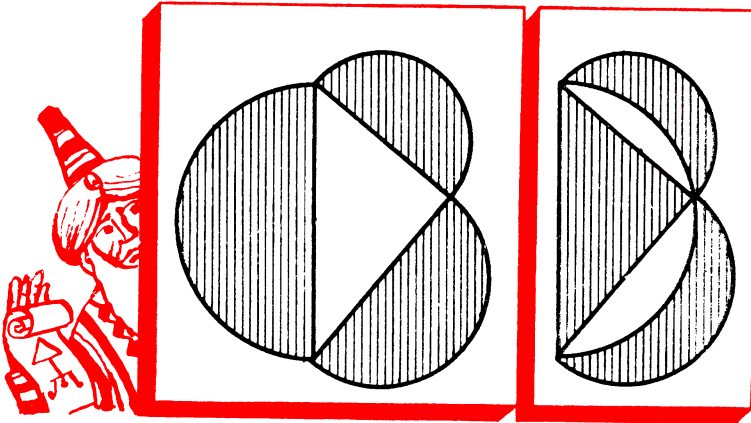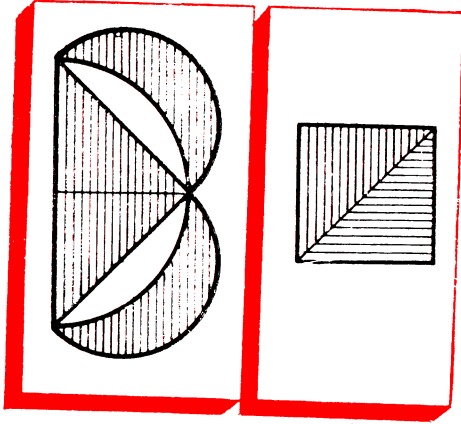
১০৫ নং ছবি ১০৬ নং ছবি

একটা বৃত্তকেই যদি বর্গক্ষেত্রতে পরিণত না করা যায়, তাহলে দুটো চাপ দিয়ে তৈরি একটা অর্ধচন্দ্রকে কিভাবে আয়তক্ষেত্রে পরিণত করা যাবে?

কিন্তু জ্যামিতিক অংকনের সাহায্যে সমস্যাটাকে ঠিকই সমাধান করা যায়। এজন্য দরকার হয় বিখ্যাত পিথাগোরাসের উপপাদ্যের একটা মজার অনুসিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার। সেটা হল: অতিভুজের ওপর যে বৃত্তাংশ তৈরি করা যাবে, তা অন্য দুটো বাহুর উপরের বৃত্তাংশের যোগফলের সমান (১০৩ নং ছবি)। বড় বৃত্তাংশটাকে যদি উল্টোদিকে ঘুরিয়ে ফেলা যায় (১০৪ নং ছবি), তাহলে দেখা যাবে দুটো কালো অর্ধচন্দ্রকে একত্র করলে তা ত্রিভুজটির সমান হয়।* যদি কোন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ নেওয়া যায়, তাহলে এই দুটো অর্ধচন্দ্রের প্রত্যেকটা এই ত্রিভুজের অর্ধেক হবে (১০৫ নং ছবি)। তাহলে জ্যামিতির সাহায্যে আমরা একটা সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তৈরি করতে পারি, যার ক্ষেত্রফল একটা অর্ধচন্দ্রের সমান হবে।
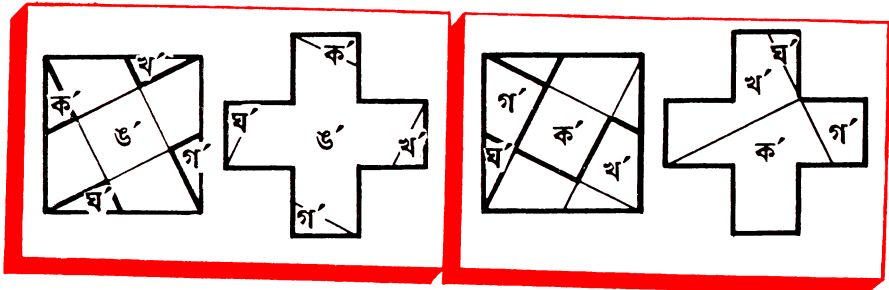
১০৭ নং ছবি ১০৮ নং ছবি

---

* জ্যামিতিতে এই সম্পর্কটাকে বলে 'হিপোক্রাটিসের ল্যুনিস'।

এখন যেহেতু একটা সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজকে সহজেই বর্গক্ষেত্রে পরিণত করা যায় (১০৬ নং ছবি), সুতরাং জ্যামিতির সাহায্যে অর্ধচন্দ্রটার বদলে একটা বর্গক্ষেত্রও তৈরি করা যাবে।
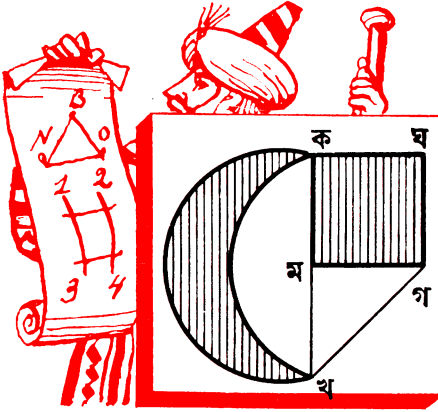
এখন যে কাজটা বাকি থাকল তা হল এই বর্গক্ষেত্রটাকে একটা অনুরূপ ক্রুশে পরিণত করা (এটা তৈরি হবে ৫টা সমান মাপের বর্গক্ষেত্র দিয়ে)। এটা করার অনেক উপায় আছে: এর ভেতর দুটো দেখানো হয়েছে ১০৭ আর ১০৮ নং ছবিতে। দুটোতেই বর্গক্ষেত্রের শীর্ষবিন্দুগুলিকে উল্টো দিকের বাহুর মধ্যবিন্দুর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে।

১০৯ নং ছবি

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কোন অর্ধচন্দ্রকে এই মাপের ক্রুশে পরিণত করতে হলে পরিধির দুটো বৃত্তচাপ দিয়ে তা তৈরি হতে হবে। বাইরের বৃত্তচাপ বা বৃত্তাংশ আর ভেতরের বৃত্তচাপ হবে এর চেয়ে বড় ব্যাসার্ধের পরিধির এক-চতুর্থাংশ।*

কি করে একটা অর্ধচন্দ্রের সমান করে ক্রুশ তৈরি করতে হয় তা দেখিয়েছি তোমাদের। অর্ধচন্দ্রের দুটো মাথা (১০৯ নং ছবি) একটা সরল রেখা দিয়ে যোগ করা হয়েছে। এই সরল রেখার কেন্দ্র **ম**-তে একটা লম্ব খাড়া করে **ম গ**-কে = **ম ক** করা হল। **ম ক গ** সমদ্বিবাহু ত্রিভুজকে সম্পূর্ণ করা **ম ক ঘ গ** বর্গক্ষেত্র তৈরি করা হল। এটাকে আবার ১০৭ বা ১০৮ নং ছবির যেকোন একটি অনুসারে ক্রুশে পরিণত করা হল।

---

* আকাশে আমরা যে অর্ধচন্দ্র দেখি তার চেহারায় একটু তফাত আছে। এর বাইরের চাপটা বৃত্তাংশ আর ভেতরেরটা উপবৃত্তের অংশ। শিল্পীরা অনেক সময় ভুল করে একে বৃত্তাংশ দিয়ে তৈরি করে থাকেন।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union